ছোটগল্প সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

প্রমথনাথ বিশী

সম্পাদনা

অশোককুমার কুণ্ডু

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদকীয়

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের যে অজস্র সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলিকে পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করে তোলাই 'ছোটগল্প সংগ্রহ' গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কাজ সহজসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে যে ধারার সুরু হয়েছে আজও তা অজস্রধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই আমরা ক্রমান্বয়ে সেইসব সাহিত্যিকদের ছোটগল্পগুলি প্রকাশ করব, যাঁদের রচনা গ্রন্থ আকারে বা গ্রন্থাবলী আকারে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এক-একজন লেখকের সমস্ত গল্পগুলিই এক বা একাধিক খণ্ডে পর পর প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল বাংলাসাহিত্যে প্র. না. বি. নামে খ্যাত, রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিক বিদগ্ধ মননশীল লেখক প্রমথনাথ বিশীর গল্প দিয়ে। এঁর সমস্ত গল্পগুলি প্রকাশ করতে আরো দু'টি খণ্ডের প্রয়োজন হবে। তারপর আমরা অন্য লেখকের গল্প সুরু করব। প্রতি খণ্ডের শেষে কিছু আলোচনা থাকবে। প্রতি তিনমাস অন্তর চারশত পৃষ্ঠার এক-একটি খণ্ড প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য উৎসাহী পাঠকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। স্থায়ী গ্রাহকদের প্রতিখণ্ড পনের টাকায় দেওয়া হবে। এর জন্য অগ্রিম টাকা জমা রাখতে হবে না, কিন্তু বই প্রকাশের একমাসের মধ্যে বই সংগ্রহ করে নিতে হবে।

বাংলা ছোটগল্পে নাকি ইদানিং ভাঁটা পড়েছে, এরকম মন্তব্য কেউ কেউ করে থাকেন। কিন্তু নূতন নূতন ছোটগল্প যে এখনো সৃষ্টি হচ্ছে তা বিভিন্ন সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে। বর্তমানের এই *সৃষ্টির পাশাপাশি আমাদের ছোটগল্পের পুরাতন সম্পদগুলিকে যদি আমরা স্থায়ীভাবে পাঠকদের কাছে ধরে দিতে পারি, তাহলে বাংলা ছোটগল্পের পুনরুজ্জীবনে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।* এ ব্যাপারে আমরা বাংলা ছোটগল্প প্রেমীদের সহযোগিতা কামনা করি।

অশোককুমার কুণ্ডু

ঃ সূচীপত্র ঃ

প্রমথনাথ বিশী

আমি নীরব।

—কন্টী বদল ?

—কি যে বল !

সে বলিল—বলি কি আর সাধে ? বিয়ে করনি তো শাড়ী কেন ?

ঠিক বটে রাজলক্ষ্মীর শাড়ী ঝুলিতেছে—চাকরে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া ইন্দ্রনাথকে বুঝাইব যে শাড়ী কেন ? কেমন করিয়া বুঝাইব যে, এ শাড়ী আমার জীবনে অপ্রাসঙ্গিকও নয়, প্রক্ষিপ্তও নয় ! সে পুনরায় খোঁচা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হে উত্তর দিচ্ছ না যে ?

আমি বলিলাম—শ্রীঘৃতের নাম শুনেছ ?

—হাঁ, দেয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে।

—তবে জেনে রাখো ওই শাড়ীর তত্ত্ব শ্রীঘৃতের মধ্যে আছে।

সে বলিল—ভাই শ্রীকান্ত, আমি সাহিত্যিক নই, সন্ন্যাসী, কাজেই আর একটু স্পষ্ট করে বল।

বাস্তবিক ও কেমন করিয়া এ সব ইন্টেলেক্‌চুয়াল কথা বুঝিবে ! ও বালিগঞ্জের বদলে বিন্ধ্যাচলে জীবন কাটাইয়াছে। সোমবার উপবাস করে বটে সোমবাসরে একবারও যায় নাই। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—ভাই ইন্দ্রনাথ, শ্রীঘৃতের বৈশিষ্ট্য এই যে ওতে ভেজাল নেই। বাজারের অন্য ঘিতে আছে। বাঙলা দেশে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত তা ভেজালে পূর্ণ; মন্ত্রের ভেজাল, আচারের ভেজাল, প্রথার ভেজাল, এক কথায় মন্ত্রের দ্বারা মন সেখানে বাধাগ্রস্থ; প্রেমের পরীক্ষা তাতে হয় না—। আমি গ্রহণ করেছি তাকে বিনা মন্ত্রে, বিনা আচারে, বিনা আহ্বানে, বিনা যৌতুকে, এমন কি কাউকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিনি। সে সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—এ প্রথা কি বাঙলা দেশে চলছে ? আমি বলিলাম—কেবল এই প্রথাই বাঙলা দেশে চলেছে। সে হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল—ভাই শ্রীকান্ত আমি কিছুদিন বাঙলা দেশ ছাড়া ছিলাম ফিরে এসে দেখছি ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে। কেবল দুঃখ যে আমার যৌবনটা চলে গেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—দুঃখ করনা ভাই, যৌবন; তোমার যায়নি। সে নিজের সম্বন্ধে এত বড় আশ্বাস বাক্য শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। আমি বলিয়া চলিলাম—

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে, রাত্রি অনেক হইলে দেখিলাম ভিড় সরিয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী একা। কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, ভাল করিয়া দেখিয়া আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না; সেই আজানুলম্বিত হাত; বয়স হওয়াতে একটু বেশী লোমশ ও শীর্ণ হইয়াছে মাত্র।

আমি আবেগ ভরে ডাকিলাম—ইন্দ্রনাথ! সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—আরে শ্রীকান্ত যে!

আমি কম্পিত স্বরে বলিলাম,—তোমাকে এখানে এভাবে এতদিন পরে দেখব ভাবি নাই ইন্দ্রনাথ!

সে ওষ্ঠে আঙুল দিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—ও নাম ধরে ডেকো না শ্রীকান্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? সে মৃদু স্বরে বলিল—দাগী শ্রীকান্ত। আমিও মৃদুতর স্বরে বলিলাম, তুমিও আমাকে ও নামে ডেকো না—

—কেন? দাগী নাকি?

আমি বলিলাম—না সাহিত্যিক। কিন্তু তার দাগী শব্দের অর্থ কি ভাল করিয়া তা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দাগী! ব্যাপার কি?

সে বলিল—মাছ, ছাগল, পেঁয়াজ, কুমড়ো, স্যুটকেশ, লোটাকম্বল, গাঁজা—আমি বুঝতে না পারিয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। সে সূত্রের ব্যাখ্যার মত বলিয়া চলিল—

—ওইযে দুজনে ডিঙি করে মাছ চুরি করতাম ওই হ'ল কাল। প্রথমবার রায়পুরের বাবুদের পুকুরে মাছ চুরি ক'রতে গিয়ে হ'ল ছয় মাস! বেরিয়ে এসে মাছ ছেড়ে ধ'রলাম মাংস মানে চুরি করা,হ'ল আবার দেড় বছর। বেরিয়ে এসে বুঝলাম সন্ন্যাসীর পক্ষে আমিষটা নিরাপদ নয়. ধরলাম পেঁয়াজ। কিন্তু ওটা আমিষের বাবা। হ'ল তিন বছর! তার পরের বার কুমড়ো—ফল চার বছর! শেষে নিরামিষও ছাড়লাম! তখন সবে স্যুটকেস্ বাজারে উঠেছে! করলাম চুরি, হ'ল পাঁচ বছর—বুঝলে কান্ত গোড়ায় কাঁচা হে! শেষে বেরিয়ে ভাবলাম দূর ছাই সন্ন্যাসীর আবার ওসবে কি হবে। কিন্তু সন্ন্যাসেরও তো সাজ সরঞ্জাম চাই! সৎ উদ্দেশ্যে অসৎ কাজ করায় ক্ষতিটা কি! লোটা-কম্বল চুরি ক'রতে গিয়ে ধরা পড়লাম। শেষ বার হ'ল এক

ছিলিম গাঁজা চুরি ক'রতে গিযে! দেশের কি আইন হে! মৌতাত চুরিতে নাকি সাজা হয়! ছোঃ! বদলে ফেলো, বদলে ফেলো অমন আইন। তার পরে তোমার খবর কিহে! সাজ সজ্জা তো ভালই দেখছি! লিখ্‌তে শিখেছ! কি লিখ্‌ছ? তুমি আবার কি লিখবে?

এই বলিয়া সে সেই বহুদিন বিস্মৃত হাসি হাসিল।

—আচ্ছা বল, বল। এই বলিয়া সে একটা বিড়ি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চলে? আমি সম্মতি জানাইলাম!

বেশ বেশ।

এবার একটা ছোট কল্কে দেখাইযা বলিল—এটা বোধ হয় চলে না?

আমি বলিলাম—চলে বই কি?

সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বটে! বটে! কান্ত তোমার উন্নতি হয়েছে, এ না হ'লে আর সাহিত্যিক! আচ্ছা নাও! এই বলিয়া সে খানিকটা তামাক পাতা ছিঁড়িয়া বাঁ হাতের তেলোয় ফেলিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঘসিতে লাগিল। ঘসা শেষ হইলে আমাকে খানিকটা দিয়া বাকিটা নিজের মুখে ফেলিয়া দন্ত ও অধরের মাঝে রাখিয়া দিয়া বলিল, তারপর তোমার খবর কি? আচ্ছা সত্যি করে বলতো, কোনটা আগে শিখলে, নেশা না লেখা!

আমি বলিলাম—নেশাটাই তো আগে শিখেছি! অট্টহাস্যে বলিল—বুঝেছি, ওদুটোর মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে হে।

আমি বললাম—এখানে বসে গল্প জম্‌বে না, চল বাড়ীতে যাওয়া যাক্‌।

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—বাড়ী? বাড়ীও আছে নাকি? অবাক ক'রলে শ্রীকান্ত? কিন্তু ক'রলে কি করে? জুয়ো টুয়ো খেল! না? কোকেনের চোরাই ব্যবসা? না? ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম—তুমি যে, আবার সাহিত্যিক! আমি তো পালাবার আগে শুনেছিলাম তোমার পিশেমশায় তোমাকে পাটের ব্যবসায়ে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন। শেষে বুঝি সাহিত্যই বেশী লাভের দেখলে।

আমি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলাম—ইন্দ্রনাথ তুমি এসব বুঝবে না; এতে আর্ট আছে, জনগণের ব্যথা আছে, পতিতার প্রতি দরদ আছে—

এইরূপে অনেক রাত ধরিয়া ইন্দ্রনাথকে পতিতাতত্ব, দরদ, অন্নব্রহ্ম, প্রেম (স্বাধীন ও পরাধীন) প্রভৃতি মদীয় আবিষ্কৃত সূত্রগুলি বুঝাইলাম। তাহাকে একটু গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে—ইতিমধ্যে সে যদি বর্ণ জ্ঞান ভুলিয়া না থাকে তবে চাইকি তাহাকে সাহিত্যিক বলিয়া চালাইয়া দিতেও পারিব।

সব কথার মধ্যে আমার প্রেমের ডেফিনেশনটাই যেন তাহার কিছু বেশি মনে লাগিল—সে বারংবার সেটা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল!

আমি বলিলাম—তুমি ঘুমোও, আমি আসি।

সে বলিল—আচ্ছা বিদায়!

আমি বলিলাম—বিদায় কি হে! কাল সকালেই আবার দেখা হবে!

সে হাসিয়া বলিল—ওই হোল।

৪

ভোর বেলা উঠিয়া ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখি ঘর খালি। কোথায় গেল? প্রাতভ্র্মণে নাকি? রাজলক্ষ্মীর সন্ধান লইতে গিয়া দেখি সেও নাই, গেল কোথায়? ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখি তাহার ঝুলিটিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঘরে একটা টেবিল ছিল তাহার উপরে একখানা চিঠি; চিঠিখানি ইন্দ্রনাথের গাঁজার কল্কে দিয়ে চাপা-দেওয়া; উঠাইয়া দেখি ইন্দ্রনাথ লিখিতেছে—

ভাই শ্রীকান্ত, তোমার প্রেম ও যৌবনের ডেফিনেশন্ যেমন সান্ত্বনা-দায়ক তেমনই চিত্তাকর্ষক। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাজলক্ষ্মীকে লইয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই কল্কেটি রাখিয়া গেলাম। আর কোন কাজে না লাগে কাগজচাপার কাজে লাগিবে।

ইতি

তোমার ইন্দ্রনাথ

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব

১

একদিন যার বন্ধুত্বের ছিন্নসূত্র খুটিয়া এই ছন্নছাড়া জীবনের ইতিহাস লিখিতে স্নুরু করিয়াছিলাম, তখন কে জানিত আর একদিন তারই ইতিহাস দিয়া এ দীর্ঘ জীবনের ভ্রমণ-কাহিনী শেষ করিতে হইবে। সে দিন ভাবিয়াছিলাম সে বুঝি চির দিনের জন্য আমার প্রণয়ের গুটি ভেদ করিয়া প্রজাপতির মত উড়িয়া গেল। কি আশ্চর্য্য এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার দেখা মিলিবে তখন কে জানিত!

এ কাহিনী প্রথমবার যখন লিখি তখন বলিয়াছিলাম পা দুটা থাকিলেই ভ্রমণ করা চলে, কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই তো লেখা চলে না। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি একবার লিখিয়া অভ্যাস হইয়া গেলে হাত দুটাকে আর থামাইয়া রাখা অসম্ভব। অনেক অভিজ্ঞতার পরে দেখিলাম চলিয়া চলিয়া পা দুটা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু লিখিয়া হাত দুটা ক্লান্ত হয় না।

বৃদ্ধ বয়সে যখন ভাবিয়াছিলাম হাত দুটার আর ব্যবহার করিব না, এমন সময়েই এমন অসম্ভব রূপে সে-ই আমাকে লিখিতে বাধ্য করিল। আজ সেই কথাই বলিব।

হ্যারিসন রোড দিয়া চলিতেছিলাম পথের পাশে এক জায়গায় ভিড় জমিয়াছে; ভাবিলাম বোধ হয় কাবুলিওয়ালা সস্তায় কম্বল বেচিতেছে। লোটা-কম্বলের উপর আমার ছোট বেলা হইতেই লোভ, কাজেই আগাইয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিছুই দেখা যায় না। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত পা বদ্‌লাইতে লাগিলাম; শেষে আর না পারিয়া বসিয়া পড়িয়া বিড়ি টানিতে স্নুরু করিলাম। সেই বিড়ির আলোয় অতিদূর অতীতের একখানি কোমল মুখ মনে পড়িল। সেদিন সেই মুখ ছিল কচি ডাবের মত নিটোল ও নরম; আজ তাহা হইয়াছে ঝুনো নারিকেলের মত শুষ্ক ও শীর্ণ। কিন্তু সেই একই মুখ।

সৃষ্টি করবার শক্তির নাম যৌবন আর সৃষ্টি করবার ইচ্ছার নাম প্রেম।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিলাম! যখন সে ও ইন্দ্রনাথ কথাবার্তা বলিতেছে আমি অনেক দিন পরে একবার ভাল করিয়া তাহার দিকে তাকাইলাম—কি মোটা ইস্, নথপরা, মাথার সিঁথির বরাবর দুই ইঞ্চি প্রশস্ত একটি টাক্, মুখে একগাল পান আর দাঁতে—দাঁতই নাই! সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! যে দিন বৈঁচি বনে দাঁড়াইয়া সে একা কাঁদিতেছিল—সে দিন সে বেশী সুন্দর ছিল না আজ! ঐ রূপের সঙ্গে বার্দ্ধক্য ষড়যন্ত্র করিয়া কি এক গজকচ্ছপী ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু বিবাহে একাধিক বিবাহ করা যায়! খৃষ্টানি বিবাহে বন্ধন ছেদ করা যায়। কিন্তু এই ধরণের অকৃত্রিম প্রাণের মিলনে কোন বন্ধন না থাকায় ছেদন করিবারও কিছু নাই। এক জাতীয় গিরগিটী আছে দুটায় লড়াই বাধিলে একটা না মরা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই অকৃত্রিম মিলনেও সেই দশা—একজনের না মরা পর্য্যন্ত আর একজন ছাড়িবে না। ইহাকে প্রাণান্ত বিবাহ বলিতে কি আপত্তি আছে পাঠক?

৩

রাত্রে আহারের পরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তামাকু টানিতে টানিতে বলিল—কান্ত এবার আসল কথা বল দেখি কেমন করে বই লিখে এত সহজে বাঙালী হৃদয়ে প্রবেশ করলে?

আমি বলিলাম—ভাই ইন্দ্রনাথ বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশের এক সোজা পথ আবিষ্কার করে ফেলেছি!

—সোজা পথ!—ইন্দ্রনাথ নড়িয়া চড়িয়া উঠিল!

শোন তবে! আমি বলিতে লাগিলাম,—উদরের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয়ে প্রবেশের পথ আবিষ্কারেব গৌরব আমার!

—বল কি হে! বাঙালীর হৃদয় আর উদর তবে কি বড় কাছাকাছি।

শুধু কাছাকাছি নয়! বাঙালীর উদরই হৃদয়!

ইন্দ্রনাথের দুই চোখ আমার দিকে তারিফ বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি উৎসাহিত হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম—বুঝলে ইন্দ্রনাথ বর্মা মুল্লুক থেকে ফিরে বুঝতে পারলাম যে এ জাতিটা আজ দেড়শ বছর থেকে অনাহারে আছে। ফলে হয়েছে এই যে তার হৃদয় নামতে নামতে উদরে এসে ঠেকেছে! তখনি বুঝতে পারলাম যে এদের মনে প্রবেশ করতে হ'লে উদর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে! কাল তোমাকে আমার গ্রন্থাবলী এক সেট দেবো—পড়লেই কথাটা বুঝতে পারবে! বুঝবে ইন্দ্রনাথ এই নিরন্ন জাতের কাছে খাদ্যের চেয়ে বড় কিছু নেই—এদের কাছে অন্নই ব্রহ্ম।

আমার অভয়া দেখো ঘোর অনাটনের মধ্যেও প্রেমিককে লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছে! 'পরিণীতা'র মধ্যে একটা গরীবের মেয়ে আছে সে 'দাদা' 'দাদা' বলতে বলতে বড় লোকের ছেলে শেখরের টাকার আলমারির চাবি হাতে করে ফেলেছে!

রমাকে দিয়ে রমেশকে খাওয়াবার সুযোগ পাইনি বলে দুজনকে সেই তারকেশ্বর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে!

নরেন ডাক্তার মেসে পেটভরে খেতে পায় না এই কথাটা বিজয়াকে কেঁদে কঁকিয়ে জানিয়ে দিয়ে বাজি মাৎ করে দিয়েছে! এ জাতের উদরেই প্রেম।

—তার চেয়ে বল ঔদরিক প্রেম। এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

আমি বলিলাম—হাসির কথা নয় ইন্দ্রনাথ।

সে বলিল—নয়ই-তো! আচ্ছা কান্ত এদের হৃদয়ের অধোগতি তো শুনলাম, মস্তিষ্কের অবস্থা কি!

—সে-ও ওই একই নিয়ম অনুসরণ করছে। অর্থাৎ কিনা মস্তিষ্ক নামতে নামতে হৃদয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের বুদ্ধিতে আপীল করতে হলে হৃদয়ে ঘা দিতে হয়। আমার সাবিত্রী, কিরণময়ী, কমলা, কমললতা, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে এজাতের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে! কাল দেবো পড়ে দেখো! কি ইন্দ্রনাথ ঘুম পাচ্ছে নাকি!

এ সব কথা শুনলে মরা মানুষ জাগে আর আমার ঘুম পাবে! সে কি!—ইন্দ্রনাথ বলিল!

—পতিতাও আছে! বাঃ বাঃ—খাসা! আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল! একটু পরে আবার বলিল—সেই যে পশ্চিমে থাকতে গোয়াল ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে হরিদাসের গুপ্ত কথা পড়েছিলে, সেটা একেবারে মাঠে মারা যায়নি তাহ'লে!

ইন্দ্রনাথ ঠিক ধরিয়াছে। সেই গ্রন্থের নূতন সংস্করণের নাম যে 'সেবাদাসী' একথা লজ্জায় চাপিয়া গেলাম।

সে বলিল, নাও কোথায় তোমার ডেরা চল যাওয়া যাক্। এই বলিয়া সে ঝুলি কাঁধে উঠিয়া দাঁড়াইল! একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া দুইজনে বাড়ী রওনা হইলাম।

২

আমার বাড়ী দেখিয়া ইন্দ্রনাথ অবাক হইয়া গেল; যে ইন্দ্রনাথকে কখনও অপ্রতিভ হইতে দেখি নাই সেও আজ কিঞ্চিত হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁ কান্ত, এ সব কি সত্যই সাহিত্য করে হয়েছে না সঙ্গে আর কিছু ব্যবসা ছিল!

আমি উচ্চাঙ্গের একটা হাসি হাসিয়া বলিলাম—কি যে বল ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্রনাথ দুঃখের স্বরে বলিল—আর কি সুযোগটাই ফস্কে গেল। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে না গিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করলেই হ'ত।

ইতিমধ্যে সে আমার লিখবার টেবিলের উপর দুইখানা পা তুলিয়া দিয়া গদি আঁটা চেয়ারে আরামে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছে। বলিল—শ্রীকান্ত সাহিত্যিক হ'লে কি আর ভদ্রতা করতে নেই···

আমি শ্রীকান্তের ইঙ্গিত বুঝিয়া ডাক দিলাম—এই রতন তামাক দিয়ে যা।

তামাক খাইতে খাইতে ইন্দ্রনাথ এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল; হঠাৎ চোখে একটা সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—বলি বিয়ে করলে কবে হে?—

—বিয়ে, বিয়ে তো করিনি!

—তবে কি মালা চন্দন?

ইহাদের প্রশংসা পত্রের জোর বড় অল্প নয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম হইতে ভাণ্ডারকর পর্য্যন্ত অনেকের সার্টিফিকেট ভরিয়া দিয়াছে। সে মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে, কেবল 'ইতি গজের' ইতিহাসটী চাপিয়া গিয়াছে। স্বর্গে গিয়া যুধিষ্ঠিরের কিছু বুদ্ধি হইয়াছে মনে হয়; ভীষ্ম লিখিয়াছে বেচারী সারা জীবন কষ্ট পাইয়াছে, এখন একটি চাকুরী পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বুদ্ধ ত্রিপিটক হইতে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। অশোক, বিম্বিসার, রীজডেভিড্স্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, এমনটি আর পাইবে না।

যীশুখৃষ্টের প্রশংসা পত্রই সব চেয়ে চমকপ্রদ। কারণ ও বিদ্যায় ইউরোপীয়েরা শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং পণ্টিয়াস পাইলেট লিখিয়াছে, আমি ভুল করিয়া লোকটাকে বিচার ছলে খুন করিয়াছি। সেজন্য এখন অনুতপ্ত। বার্ণাডশ বলিয়াছে—যীশুই প্রথম সোসালিষ্ট, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। চেষ্টারটন লিখিয়াছে যীশুই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী, যদিও তাহা অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। যীশু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া একখানি পকেট সংস্করণের বাইবেল দরখাস্তের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

এক দিন স্বর্গের অধিবাসীরা দেখিল ন-ন-লৌ-ব-লিঃর তিন জন নব নিযুক্ত দৌবারিক কোম্পানীর উর্দ্দি পোষাক ও টুপি পরিয়া ষ্টেশনের তিন দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, দুর্বৃত্তগণ চিন্তিত হইল; স্বর্গের পুরুষেরা গ্রন্থি ও মেয়েরা নীবী সম্বন্ধে স্বস্তি অনুভব করিল।

সেদিন সকালে নন্দন-নরক মেলা যথা সময়ে নন্দন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রীরা পৃথিবীর অভ্যাস ভুলিতে পারে নাই। সকলের মুখেই একটা গেল গেল ভাব; যাহাদের স্বর্গে প্রবেশের টিকিট ছিল তাহারা নিজের নিজের বোঝা (পুণ্যের বোঝা) লইয়া সগৌরবে দ্বার অতিক্রম করিল। কেবল একটি লোক সন্দেহজনক ভাবে আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল। লোকটীর হাঁটুলম্বী পাঞ্জাবী, পরণে লুঙি, দুই পায়ে দুই ধরণের নাগরাই জুতা, আর কানে গোঁজা অর্দ্ধদগ্ধ একটী বিড়ি। যাত্রীরা চলিয়া গেল, ছকু খানসামা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল—টিকিট? ছকু ট্যাকে (যুধিষ্ঠিরের নয় নিজের) হাত দিয়া একটি সিকি

"ন-ন-লৌ-ব-লিঃ"

স্বর্গের নন্দন বনে পারিজাত বৃক্ষতলে আজ বড় ভিড়। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকল বয়সের দেবতা সমবেত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম স্বর্গে কেহ বৃদ্ধ হয় না; বুঝিলাম স্বর্গ সম্বন্ধে যে সব গুজব শোনা যায়, তার সবগুলি সত্য নয়। কিসের জন্য এ জনতা? দেবতারা কি পরাজিত পুষ্প চয়নের জন্য আসিয়াছেন? না স্বর্গীয় মধুচক্র ভাঙিবার জন্য কোন দুরন্ত দেবশিশু বৃক্ষে উঠিয়াছে সকলে তাহাকে দেখিতেছে? কিংবা ও সব কিছুই নহে, পারিজাতের ডালে একখণ্ড কাগজে এক খানা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। সেই বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য এই ভীষণ দৈব জনতা।

তবে কি স্বর্গেও বেকার সমস্যা দেখাদিল নাকি? অসম্ভব নয়! স্বর্গের সনাতন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটি বাড়িয়া তেতাল্লিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে; তারপরে মন্দাকিনীতে তো বন্যা লাগিয়াই আছে। বিশেষ দেবদৈত্যের সেই মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বর্গের পরমার্থিক অবস্থা (স্বর্গের অর্থকে পরমার্থ বলে) দিন দিন খারাপ হইয়া চলিয়াছে; স্বর্গের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।

বিজ্ঞাপনখানার কাছে যাইবার জন্য বড়ই ঠেলাঠেলি পড়িয়া গিয়াছে; ব্যবহারের বেলায় দেখিলাম দেবতারা মানুষেরই মত; হুড়াহুড়িতে কাহারো উত্তরীয় ছিঁড়িল; কাহারো চুল ছিঁড়িল; এক ব্যক্তি মরিবার সময় 'নেক-টাইয়ের' মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই 'নেকটাই' ধরিয়া অন্য সকলে তাহাকে সরাইয়া দিল; একজন বৃদ্ধের ট্যাঁক হইতে অমৃতের ডিবা খোয়া গিয়াছে বলিয়া সে বড়ই হৈ চৈ করিতে লাগিল; সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন সিনেমায় চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট করিবার দৃশ্য। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনখণ্ডও সমীরণে মৃদু মন্দ দুলিতেছে; সেখানা এই রকমের:—

কর্ম্মখালি

আবশ্যক—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-এর জন্য তিন জন সাধু, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী কর্ম্মী চাই। সত্বর হাতে লিখিয়া সার্টিফিকেটের নকলসহ কত বয়স, কোন জেলায় বাড়ী, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতাসহ দরখাস্ত করুন। মাসিক বেতন গুণানুসারে।

বিঃ দ্রঃ—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে ; কোনরূপ ব্যক্তিগত ক্যানভাস চলিবে না।

অস্পষ্ট স্বাক্ষর—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ প্রধান কর্ম্ম সচিব।

বিজ্ঞাপনখানা একটু বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করা উচিত। ন-ন-লৌ-ব-লিঃ আর কিছুই নহে—নন্দন নরক লৌহবর্ত্ম লিমিটেডের সংক্ষিপ্তরূপ। সকলেই জানেন, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দূরত্ব অনেক, যাতায়াতের পথ ঘাট ভাল নয়। কিছুকাল হইল স্বর্গে ডিমোক্রেসির প্রভাবে এই দুই স্থানের মধ্যে যোগ করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ হাজার জোড়া কিন্তু কান মাত্র দুটী! তিনি কোন আবেদন নিবেদন কানেই তোলেন না; দেবগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ে একদিন মর্ত্তের সর্ব্বাধিক প্রচারিত একখানি দৈনিক পত্র সেখানে গিয়া পড়িল। উহা পাঠ করিয়া দেবগণ আবার কোমর কসিয়া লাগিয়া গেল। ফলে স্বর্গের অমৃতের দোকানে পিকেটিং হইল; উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি মহিলাগণ সভাগৃহের চেয়ার টেবিল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গের কয়েকটী শিশুদেবতা ঢিল ছুঁড়িয়া স্বয়ং ইন্দ্রের খাস কামরার কাঁচ ভাঙ্গিয়া দিল। আর সকলকে ছাপাইয়া স্বর্গের বিখ্যাত কবি (ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ট্রেঞ্চ খনন করিয়াছিলেন) নানা ভাষায় খিচুড়ি করিয়া এমনি সিংহনাদ করিলেন যে সপারিষদ ইন্দ্রের টনক নড়িল। নন্দন নরকের মধ্যে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইল।

নন্দন নরকের যোগস্থাপনের পর হইতে স্বর্গের দ্বারপালের কাজ বাড়িয়া গেল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক নরক হইতে আসিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল; স্বর্গে চুরি, খুন, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দৈনিকের সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিলেন। ফলে কয়েকজন অতিরিক্ত দৌবারিক নিযুক্ত হইল; কিন্তু তাহারা ঘুষের বশ, সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। তখন ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-র কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন এমন সব ব্যক্তিকে দ্বারবান করিতে হইবে যাহারা ঘুষের বশবর্ত্তী নয়, অর্থাৎ সাধু, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী...ইত্যাদি এইরূপ কয়েকজন লোক চাহিয়া ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

আপনার সব গুণই আছে; আপনাকে আটকাই এমন কি সাধ্য? কিন্তু হাতের কাকাতুয়াটীকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। বাবাজী রাগিয়া উঠিল কে তুমি বেল্লিক? কি নাম বট হে? খৃষ্ট বিনীত ভাবে উত্তর দিল—খৃষ্ট! বাবাজী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, রামঃ ছিঃ ছিঃ কি সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড কারখানা! শেষে এ বেটা খ্রীষ্টানকে এরা দরজায় দাঁড় করাইয়াছে? এমন জানিলে শেষে কে স্বর্গে আসিত! ইহার চেয়ে আমার সনাতনপুরে আখড়া ছিল ভাল! আমার কমলমণি সেবাদাসীর বয়স কেবল হইয়াছিল ষোল। হায়! হায়!

বাবাজী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবার কাকাতুয়া চিৎকার করিয়া উঠিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'। বাবাজী হঠাৎ সেবাদাসীর শোক ভুলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—দেখিলে তো বাপু আমার কাকাতুয়াটী কেমন আধ্যাত্মিক পাখী। তার পর গলার স্বর একটু নামাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—উর্ব্বশীকে দেখিতে কেমন? বলি বয়স কত? খৃষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল আপনি পাখীকে আধ্যাত্মিক বলিলেন বটে, কিন্তু পশু পাখীর তো আত্মা নেই। মানুষের আত্মা পুণ্যের বলে স্বর্গে আসে; পশু পাখীর আত্মা না থাকায় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া?

গোলমাল শুনিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী সকলের পরিচয় লইল! তখন চার জনে মহা বিতর্ক বাধিল, মনুষ্যেতর প্রাণীর আত্মা আছে কিনা?

বাবাজী যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই:—মানুষের আত্মা যদি থাকে, অসভ্য ও বর্ব্বর কোল্ ভীল, সাঁওতালদের আত্মা আছে কিনা? তা যদি থাকে, তাদের নিম্নে যারা আছে বানর শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বন-মানুষ তাদের আত্মা আছে কিনা? আর যদি বানর জাতির আত্মা না থাকে তবে তাদের উপরে অবস্থিত অসভ্য ও বর্ব্বরদের কেন থাকিবে? (বাবাজী ডারউইন জানে) খৃষ্টরা তিন জন নীরব। তখন বাবাজী বলিল, বাপু তুমিতো বলিয়াছ যে উষ্ট্রও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু ধনীরা পারে না; তবে? তারপর দেখ ইন্দ্রের হাতী আছে, ঘোড়া আছে, তারা কি পশু নয়? বিষ্ণুর গরুড় আছে সে পাখী নয়? আর আর বৈশ্বানরের

আর এক টুকরা কাগজে রাজলক্ষ্মী লিখিতেছে—সেদিন বৈঁচির মালা দিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছিলাম আজও তাহাকে পাই নাই। এখন দেখিব সে মালা বিনাসূতায় গাঁথা কি তার মধ্যে বন্ধন আছে? তুমি রোহিণীকে হত্যা করিবার জন্য গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পার নাই—দেখিব নিজে কি কর। মনে রাখিও মহৎ প্রেমের প্রাণ ব্যর্থতায়! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। ইতি

হতভাগিনী রাজলক্ষ্মী

পুঃ—তোমার বালিশের তলে সিন্দুকের চাবি রহিল। আর ভাঁড়ার ঘরের পশ্চিমের আলমারীর উপরের থাকে বাঁদিক হইতে দ্বিতীয় হাঁড়িতে সরের নাড়ু রহিল ও তৃতীয় থাকে কাঁচের বয়ামে কুলের আচার রহিল। মাথা খাও—খাইও। ইতি

ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ তুমিই প্রকৃত পরার্থপর, পরোপকার তোমার পক্ষে এমন সহজাত! যে রাজলক্ষ্মীকে আমি আস্ত চার চারটা পর্ব্ব বহন করিয়া বিরক্ত হইয়া তাড়াইবার পথ খুঁজিতেছিলাম তুমি এমন সহজে তাহার সমাধান করিয়া দিলে! প্রেমসমুদ্রে যে-হলাহল ওঠে তুমি সত্যই তাহার নীলকণ্ঠ। —জীবনে এমন আনন্দ খুব অল্পই পাইয়াছি। সারা বাড়ীময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। চাকরটা ভাবিল আমি রাজলক্ষ্মীর শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছি। আনন্দ যে কতখানি হইয়াছিল তাহা একটা ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। রাজলক্ষ্মীর পত্রোক্ত সরের নাড়ু ও কুলের আচার সবগুলি খাইয়া ফেলিলাম। জীবনে এই প্রথম তাহার কথা রাখিলাম। আনন্দ একটু কমিলে প্রথমেই মনে হইল—বাড়ী ছাড়িতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এ সহর ছাড়িতে হইবে! কেন না ইন্দ্রনাথই হও আর নীলকণ্ঠই হও—বাবা! রাজলক্ষ্মীকে হজম করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আসিয়া আবার না আমার হৃদয় মন্দিরে সে রাহাজানি করিয়া ঢুকিয়া পড়ে!

বাহির করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চোখ মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল বলি দাদার রেট কত ক'রে? যুধিষ্ঠির অবাক হইয়া বলিল রেট! টিকিট কই? ছকু ঘুষ-দাতাদের চিরপরিচিত সেই হাসি হাসিয়া বলিল—বলি মোচড় দিয়ে কিছু বেশী নেবার চেষ্টা আচ্ছা না হয় দু' ছিকি (সিকি) হবে? অপমানিত যুধিষ্ঠির সক্রোধে হিন্দিতে বলিল নেই হোগা।

তখন ছকু বুদ্ধের নিকটে গিয়া পুনরায় ঐ রূপ বলিল; বুদ্ধ সব শুনিয়া বিশুদ্ধ পালি ভাষায় বলিল, "অসম্ববব।" এবার ছকু খৃষ্টের নিকটে গিয়া একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, প্রণামান্তে স্বর্গে প্রবেশের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক আরম্ভ করিল; বেচারা যীশু স্বর্গে আসিবার পর হইতে ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুযোগ পায় নাই; তর্ক করিতে করিতে সে যেমনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি ছকু এক ছুটে দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে বেশী দূরে যাইতে পারিল না, যীশু তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল, অপর হাত দিয়া ছকু দরজার রেলিং ধরিল। যীশু তাহাকে টানে সে কিছুতেই রেলিং ছাড়ে না। তাহার দেহের খানিকটা স্বর্গের মধ্যে খানিকটা বাহিরে। যীশুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া দুই জনে তাহার দুই পায়ে ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন উঃ কি টানাটানি? ছকু এক হাত দিয়া রেলিং ধরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, আর যীশু, বুদ্ধ যুধিষ্ঠির তাহার দুই পা ও এক হাত ধরিয়া প্রাণপণে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। বাপ্‌রে ছকুর এক হাতে কি জোর? যে হাতে মর্ত্তে থাকিতে সে বহু লোকের গ্রন্থিছেদন করিয়াছে, পকেটসন্ধান করিয়াছে, সিঁধকাঠি চালনা করিয়াছে সে হাত আজও তাহার বেহাত হয় নাই। যীশু, বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া দরদর করিয়া ঘামিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জড় হইল; সকলেই বলিতে লাগিল কোম্পানী এত দিনে বিশ্বস্ত লোক পাইয়াছে বটে! কিন্তু ব্যাপারটার কোনো মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া দর্শকদের মধ্য হইতে একজন (বোধহয় বাঙালী) বলিয়া উঠিল কাতুকুতু দিন মশায় কাতুকুতু দিন, ইহা শুনিয়া যীশু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছকুর বগলে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল, অমনি কোথায় গেল মরীয়া ভাব! কোথায় গেল ধর্ম্মবীরকে পরাজয়কারী বাহুর বল, সে হাসিতে

হাসিতে রেলিং ছাড়িয়া দিল। তখন তিন জনে মিলিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহাতে ছকু মোটেই রাগিল না, সে হাত দিয়া অবিন্যস্ত পাঞ্জাবী ও টেরি ঠিক করিতে করিতে কান হইতে আধপোড়া বিড়িটী খুলিয়া যীশুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাচিস হ্যায়? যীশুর নিকটে অনুতাপের অনল ছাড়া আর কোন প্রকার আগুনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে হতাশ ভাবে সরিয়া পড়িল।

ছকু সরিয়া পড়িলে, যীশু অন্য দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই লোকটা একটা সিকির (ছিকি) কথা কি বলছিল? বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির এক সময়ে রাজার ছেলে ছিল, কাজেই সংসারের রীতিনীতি কতক কতক তাহারা জানিত—তাহারা বলিল—উহাকেই বলে ঘুষ খাওয়া। যীশুর দিব্যদৃষ্টির উদয় হইল, সে বলিল—বটে, এতদিনে আমার বিশ্বাস হইতেছে, জুডাস বেটা আমাকে ধরাইয়া দিবার পূর্ব্বে ঘুষ লইয়াছিল। সেদিনের মত তাহাদের Duty শেষ হইল। তাহারা নিজেদের মেসে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালে পুনরায় নন্দন-নরক মেল নন্দনে আসিয়া থামিল। পুণ্যের বোঝায় পীড়িত যাত্রীরা স্বর্গে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের অন্যতম পঞ্চানন বাবাজী স্বর্গে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে খৃষ্ট তাহাকে বাধা দিল; পঞ্চানন বলিল আমাকে নিষেধ কর কেন বাপু! আমি সারা জীবন ধর্মাচরণ করিয়াছি, জীবনে এক পয়সা উপার্জ্জন করি নাই কেবল ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি; নিজের পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছি এবং পরের পঞ্চাশজন পত্নীকে বৈষ্ণবী করিয়াছি; ভিক্ষায় যে সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহার এক পয়সাও খরচ করি নাই—কিংবা দান করি নাই; স্বার্থ ছাড়া কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। অপরে মিথ্যা কথা বলিলে রীতিমত রাগিয়াছি; জীবনে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অভিনয় করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া তবেই চুরি করিয়াছি, পরের ধর্ম ছাড়া কখনো নিজের ধর্ম্মের নিন্দা করি নাই; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়াছি; গঙ্গাস্নান হইতে এখনি আসিতেছি। (বাবাজী সাঁতার দিয়া একটী নারিকেল ধরিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে) তবে কেন আমায় থামাও বাপু! খৃষ্ট বলিল—আপনার কথা ঠিক; স্বর্গে প্রবেশ করিবার

স্বর্গের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট, প্রাচীরগাত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী পরিল; সম্ভব অসম্ভব সব স্থানে বিজ্ঞাপন দেখা দিল। যেন এক রাত্রের মধ্যে স্বর্গীয় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া চর্ম্মরোগ দেখা দিল। ইন্দ্রের রথে ঐরাবতের পিঠে, উচ্চৈঃশ্রবার কণ্ঠে, নারদের ঢেঁকিতে সর্ব্বত্র কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন। স্বর্গে বড় হৈ চৈ লাগিয়া গেল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃ হেড আফিসে রাশি রাশি দরখাস্ত আসিতে লাগিল; যে কয়জন কর্ম্মচারী ছিল তাহারা আর পারিয়া ওঠে না। শেষে এই দরখাস্তের জন্য একটি নূতন বিভাগ খোলা হইল এবং কলিকাতার সরকারী দপ্তর খানার দুইজন সুদক্ষ কেরাণীকে বিনা নোটিশে ট্রামচাপা দিয়া 'রিকুইজিশন' করা হইল। যথা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে দরখাস্ত বিবেচনা করিবার জন্য কমিটী বসিল। তিন জন কর্ম্মচারীর জন্য একলক্ষ দরখাস্ত পড়িয়াছে। স্বর্গের বেকার সমস্যা বাংলা দেশের অপেক্ষাও তীব্রতর!

২

'সিলেকশন' কমিটী সাত দিন অধিবেশন করিয়া বার খানা দরখাস্ত বাছিয়া বাহির করিল। বার জনই প্রসিদ্ধ লোক; পৃথিবীতে এককালে তাহাদের সচ্চরিত্র পরিশ্রমী যুবক বলিয়া খ্যাতি ছিল।

কে সেই সৌভাগ্যবান্ দ্বাদশ জন? পাঠক শ্রবণ করুণ—সক্রেটিস, সিজার, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, লর্ড কিচেনার, যুধিষ্ঠির, জোয়ান অফ্ আর্ক, আব্রাহাম, নেবুকার্ডনেজার, হাউপ্টম্যান ও মার্টিনলুথার! এই বার জনকে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের মহা মুস্কিল হইল, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখেন। প্রশংসা পত্রে কেহ কম যায় না; প্রশংসা পত্র পড়িয়া লিণ্ডবার্গের পুত্রহন্তা হাউপ্টম্যানকে খৃষ্টধর্ম প্রচারক বলিয়া মনে হয়। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন যে তিনজন সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম বেতনে কাজ করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগকে লওয়া হইবে। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির নিম্নতম বেতনে রাজী হইল—অন্য সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

বাহন ছাগ। এবার বাবাজীর চোখ একটু হাসিল। (হায়, এইরূপ হাসির বলেই সে নব নব সেবাদাসী সংগ্রহ করিয়াছে) বলিল—বলি বুঝলে তো?

বাবাজীর কথা শুনিয়া খৃষ্ট বলিল,—বাবাজীকে ঠেকাইবার আশা সফল হইবে না। সে অগত্যা বাবাজীকে পথ ছাড়িয়া দিল। দরজায় ঢুকিবার সময় আধ্যাত্মিক কাকাতুয়া একটি তীক্ষ্ণ ঠোকর মারিয়া খৃষ্টের হাতে রক্ত বাহির করিয়া দিল। বাবাজী সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি সে কথার তো জবাব দিলে না। খৃষ্ট হাতের রক্ত চাপিতে চাপিতে বিরক্ত হইয়া বলিল—জাঁনি কিন্তু বোঁলব না। বাবাজী উত্তর না পাইয়া বকিতে বকিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

খৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ততায় স্বর্গে অবাঞ্ছিত লোক প্রবেশ করিতে পারে না। স্বর্গে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া গেল। রেল কোম্পানীর সুনাম বাড়িয়া গেল, তাহারা ভাড়া দ্বিগুণ করিয়া দিল এবং কর্ম্মচারীদের মাহিনা অর্দ্ধেক করিয়া দিল কিন্তু কর্ম্মচারী তিন জনের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল! তাহাদের দিন যায়, কিন্তু রাত্রি যায় না।

৩

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন বুড়ি মন্দাকিনীর টাটকা ইলিশ মাছ আনিয়া বুদ্ধদেবের কাছে রাখিল। বুদ্ধদেব বলিল আমি মাছ খাই না·— সে বলিল মাছ না খান ডিম খান, ওতে দোষ নাই, ডিমটা নিরামিষ। খৃষ্টকে একজন একটি সদ্যজাত গোবৎস ও এক ভাঁড় তাড়ি উপহার দিল। খৃষ্ট দয়ালু, না লইলে লোকটা দুঃখিত হয়, গ্রহণ করিল। আর একদিন আর একজন তাহার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিল, খৃষ্ট বলিল—ইহাকে কি ঘুষ বলে? সে জিভ কাটিয়া বলিল—কি সর্ব্বনাশ আপনাকে কি ঘুষ দিতে পারি? ইহা পান খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ।—গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই কি বল? লোকটা বলিল—কিছু না স্যার! বাংলাদেশ নামে এক দেশ আছে সেখানকার দারোগারা ঘুষের নাম শুনিলে রাগিয়া ওঠে, কারণ

তাতে চাকরী যাইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু পান খাইবার জন্য এমন অনেকে কিঞ্চিৎ নেয়, দোষের হইলে ইংরেজের দারোগা এমন করিতে পারিত?

আর একদিন একজন যুধিষ্ঠিরের নিকটে সুবৃহৎ এক ডালা বোঝাই ফল মূল, তরকারী, ফুল (ফল ফুলের নীচে গোপনে মা দ্রৌপদীর জন্য একখানি ঢাকাই শাড়ী ও একজোড়া অনন্ত ও কানের দুল) উপস্থিত করিল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল ইহাত ঘুষ। আধারবাহক আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—স্যার না গ্রহণ করেন তো ক্ষতি নাই, কিন্তু ইংরেজের অপমান করিবেন না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল—ইংরেজ কে!

লোকটা বলিল—আপনার পরে এখন যারা ভারতবর্ষের রাজা।

যুধিষ্ঠির বলিল—তাহাদের কথা কি বলিতেছ? সে বলিল ইংরেজের হাকিম ঘুষ নেয় না, ডালা গ্রহণ করে। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হইয়া ডালা গ্রহণ করিল। বাসায় গিয়া যুধিষ্ঠির দেখিল ফল ফুলের তলে শাড়ী অলঙ্কার। বুঝিল ডালার ইহাই নিয়ম। পরদিন আর এক জন ডালা আনিল, যুধিষ্ঠির প্রথমেই ফলমূল তুলিয়া দেখিল—শাড়ী ও অলঙ্কার আছে কিনা ; না দেখিতে পাইয়া পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

আর একদিন বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্রে এক ব্যক্তি কয়েকটী মোহর দান করিল। বুদ্ধদেবের করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি বিস্তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বৎস ইহাকে কি উৎকোচ বলে না? লোকটা তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল—প্রভু, ইহার নাম ভালোমানুষি। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—ভালোমানুষি হওয়া কি অপরাধের? লোকটা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল সে কি প্রভু! পৃথিবীতে আদালতের কর্ম্মচারী পেস্কার প্রভৃতি মহাজনেরা ভালোমানুষি ছাড়া কোনই কাজ করে না ; ইহা গ্রহণে অপরাধ দূরে থাকুক না করিলেই মহাপাতক ; আদালতের মহাজনদের পুণ্য জীবনকাহিনী আপনি জানেন না বলিয়াই এমন কথা বলিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে করপদ্ম তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এমনি করিয়া দিন যায়, বুদ্ধ, যীশু, যুধিষ্ঠির ঘুষ গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে পান খাইবার অর্থ, ডালা ও ভালোমানুষি আদায় করে। শেষে এমন হইল যে, তাহারা আর উহা না পাইলে 'বনাফাইডি' স্বর্গ যাত্রীদের পথ ছাড়িয়া দেয় না। আর যাহাদের টিকিট নাই, তাহারা অনায়াসে কিছু কিছু দিয়া স্বর্গে অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে স্বর্গের দৌবারিকত্রয় মোহর না পাইলে গ্রহণ করিত না, কিন্তু কিছু কাল পরে টাকা, সিকি, কুমড়ো, লাউ, বেগুন লইয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। স্বর্গে আবার চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া গেল স্বর্গের পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় দৈনিকের সম্পাদক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃর কর্তৃপক্ষ পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ব্যাপার কি? এসব চোর ডাকাত ঢুকিতেছে কোন পথে! যে তিনটি দরজা আছে তাহাতে তিনজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান্। তবে কি তাহারাই ঘুষ খাইতেছে? না না তাহা কখনও সম্ভব নহে। প্রশংসাপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাইবেল মহাভরত ও ত্রিপিটকে যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে ঘুষ খাইবার কথা কিছুতেই মনে হয় না। তবে কি? রেল কোম্পানীর প্রধান ম্যানেজার স্থির করিলেন এবার তিনি তিনজনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ব্যাপার কি?

পরের দিন নন্দন-নরক মেল আসিয়া পৌঁছিলে, ম্যানেজার চোরের ছদ্মবেশে (ধনী ম্যানেজারের পক্ষে চোরের বেশটাই হয়তো আসল) স্বর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল! যীশু তাহার পথরোধ করিয়া বিশুদ্ধ বাইবেলী ইংরাজীতে বলিল—তোমার টিকিট কোথায়? ছদ্মবেশী ম্যানেজার ভীতভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিল, সিকি দেখিয়া যীশু রাগিয়া বলিল—আমি ঘুষ লইব না। কিন্তু লোকটা নেহাত চলিয়া যায় দেখিয়া আবার বলিল—তবে যদি পান খাইতে কিছু দাও সে, হাঁ সে স্বতন্ত্র কথা। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল—তাহাতে কি স্বর্গে ঢুকিতে পারিব?

যীশু তাম্বুলবিহারী হাসি হাসিয়া বলিল—স্বর্গ তো দরিদ্রের জন্যই, তুমি কি বাইবেল পড় নাই? ম্যানেজার তাহাকে সিকিটী দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পর দিন আবার ম্যানেজার ট্রেণের টাইমে ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, টিকিট? লোকটা বলিল—টিকিট নাই তবে স্বর্গে প্রবেশের ইচ্ছা আছে।

বুদ্ধদেব স্পষ্টভাষী লোক, বলিল—দেখো বাপু আমি ঘুষ খাই না, তবে ভালোমানুষি বলিয়া কিছু দিয়া থাকিলে লইয়া থাকি।

ম্যানেজার বলিল পয়সা তাহার কাছে নাই। বুদ্ধ রাজার ছেলে উনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে ছিল, কাছারীতে খাজনা আদায়ের রীতি তার অজানা নয়, বিপদ কালে প্রজারা কোথায় টাকা রাখে সে জানে, সে লোকটার কাছা নাড়া দিলে টুক করিয়া একটি সিকি পড়িল। বুদ্ধদেব তাহা তুলিয়া কানে গুজিয়া লোকটাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাও বৎস, তোমার স্বর্গে বাস অক্ষয় হোক।

তার পর দিন ম্যানেজার পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির তাহাকে দেখিয়া বলিল—দেখ বাপু তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি টিকিট তোমার নাই, আমি ঘুষ লইনা কিন্তু আমি ডালা লই। ডালা কোথায়? তখন অনেক দরদস্তর করিয়া ডালার বাবদ নগদ সাত সিকি পয়সা যুধিষ্ঠির আদায় করিয়া লইল। ম্যানেজার স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পরদিন ন-ন-লো-ব-লিঃর আফিসে ম্যানেজার সব কথা খুলিয়া বলিল। সভায় স্থির হইল যে, যীশু, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক। তিন জনেরই চাকরী গেল। তাহারা কোম্পানীর কোর্ত্তা, টুপি প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া মৌলিক গেরুয়া ও ঝুলি লইয়া পথে বাহির হইল। এখন কোথায় যায়, কি করে? এমন সময় দেখিল একদল বালক, বৃদ্ধ ও যুবক হারমোনিয়ম, খোল, খঞ্জনী লইয়া বাহির হইয়াছে, বন্যার জন্য ভিক্ষা করিতেছে তাহারা, দোতালার জানালার দিকে তাকাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে গাহিতেছে:—

মন্দাকিনীর বন্যাতে আজ
হন্যা দিল স্বর্গলোকে।

কোমর জলে দাঁড়িয়ে দেখ
খাচ্ছে খাবি কতই লোকে
দাও জননী ছিন্নবাস
দাও জননী চালের রাশ
লক্ষ্মী দিল ছিন্ন শাড়ী,
সরস্বতী করুণ শ্লোকে

স্বর্গের উত্তর বঙ্গে বন্যা আসিয়াছে

ভিক্ষার ঝুলিতে চাল পড়িতেছে, ডাল পড়িতেছে, দু' একখানা ছেঁড়া শাড়ীও পড়িতেছে। যীশুরা তিন জন দলে ভিড়িয়া পড়িয়া সোৎসাহে গান ধরিল—

মন্দাকিনীর বন্যাতে হায়—

ঝুলিতে চাল ডাল পড়িতে লাগিল। আজ রাত্রে মন্দাকিনীর তীরে ইহাদের খিচুড়ী হইবে। যে-বন্যা আদৌ হয় নাই তাহার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের ইহার চেয়ে ভাল সদ্‌গতি আর কি হইতে পারে! যাক্‌, বেচারা বেকার তিন জনের অন্ততঃ আজ রাত্রিটা খাদ্য মিলিবে।

বাইশ বৎসর

আজ যাঁহারা আমাকে দেখিতেছেন তাঁদের একটী কথা মনে করাইয়া দিতে চাই যে, একদা আমার বয়স বাইশ বছর ছিল। চোখের দৃষ্টি যে পরিমাণে ম্লান হইয়াছে, সেই পরিমাণে তার অন্তর্ভেদ করিবার শক্তি বাড়িয়াছে। এই ক'টী কথাই আমার এই ছোট কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট ভূমিকা।

ফোর্ড গাড়ী হাঁকাইয়া ময়দানের দিকে বেড়াইতে চলিয়াছিলাম। হাঁ, এক সময়ে ফোর্ড গাড়ীতেই চাপিতাম, এখন যে ভেনাস গাড়ীতে চাপি তা পরে কেনা। এ কাহিনী সেই মোটর পরিবর্ত্তনেরই ইতিহাস। তার সঙ্গে একেবারে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দেখা। চট্ করিয়া ব্রেক কষিয়া নামিয়া পড়িলাম। আর একটু হইলেই মহিলাটীকে চাপা দিয়াছিলাম আর কি! মাপ চাহিলাম, দেখিলাম, ভয়ে তাঁর মুখখানা পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন আর কি! অনুরোধ করিয়া তাঁকে মোটরে বসাইলাম, তারপরে আমার পৈতৃক ফোর্ড ছুটিয়া চলিল।

এখন বুঝিতেছি, পঞ্চাশের কাছে আসিয়া,—যে-মেয়ে একাকী এসপ্ল্যানেডের মোড়ে মোটর চাপা পড়িতে যায় এবং অনুরোধ মাত্রে অপরিচিত বাইশ বছরের সঙ্গে মোটর চাপিয়া বেড়ায় সে ভাল নয়। কিন্তু তখন কি এত কথা বুঝিতাম, না কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতাম। বাইশ বৎসরে যে ভুল করিয়াছি আটচল্লিশ বৎসরে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তবু বোধ করি বাইশ বৎসরই ছিল ভাল। হায় বাইশ বৎসর!

ক্লাবে যাওয়া ছাড়িতে হইল। ক্লাব যে আমাদের কতখানি ছিল তা কেমন করিয়া বুঝাইব। সে ক্লাব ছিল পাড়ার বড়লোকদের ছেলেদের শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী ইত্যাদি। বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে—আমাকে নয়, কারণ আমার দেখা কদাচিৎ পায়—পরস্পরকে, রজতের হইল কি? অনেকে চুপ করিয়া থাকে, দু'একখানা উত্তর দেয়, ওকে ফোর্ডের ভূতে পাইয়াছে। তাহারা যদি জানিত, আমিও অবশ্য জানিতাম না যে, এর পরে ভেনাসের ডাকিনী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

বাড়ীতেও কদাচিৎ আসিতাম। দিনের বেলা আহারের সময়, সকালের দিকে এক আধ বার। বিকেলে নয়, রাত্রেতো নয়ই; মাসের মধ্যে দু একদিনও নয়। রাগারাগি করিয়াছিলাম? না, কারণ বাড়ীতে রাগ করিবার মত কেউ ছিল না। আর ক্লাবের সবাই আমাকে ভাল-বাসিত। তবে পরিবর্ত্তন কিসের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সময় কই? সেদিনের মোটর চাপা দিবার ঘটনার পর হইতে মহাকাল আমার কাছে কৃপণ রূপে দেখা দিয়াছেন। একেবারে সময় পাই না। মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার থাককাটা দিনটা সহসা গুটি পোকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে; একেবারে সময়ের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর! হঠাৎ যেন সময়-সমুদ্রের অনন্ত কল্লোল জমিয়া দধির মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, একবিন্দু অম্লরসের সংযোগে! পাঠক, অম্লরসটি কি জানেন? সেই যাকে আর একটু হলেই চাপা দিয়াছিলাম আর কি! আটচল্লিশ বৎসরে তাকে অম্লরস বলিতেছি, কিন্তু সেদিন বাইশ বৎসরে সে ছিল অমৃতরস। বোধকরি তবে বাইশ বৎসর বয়সই ছিল ভালো। হায় বাইশ বৎসর!

২

সেদিন সেই যে তিনি মোটরে চাপিয়া বসিয়াছিলেন আর তিনি নামেন নাই। অনেকদিন পর যখন তিনি নামিলেন, আমার সম্পদবৃক্ষের মোটা একখানা ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন—মোটা টাকার একখানি চেক্। না, আজ বয়স আটচল্লিশ বলিয়াই যে তার প্রতি অবিচার করিব এমন আমার স্বভাব নয়, টাকা তিনি লইয়া যান নাই। প্রজাপতি যখন গুটী কাটিয়া পালায়, ফেলিয়া রাখিয়া যায় রেশমী সূত্রের আবরণ—তিনি যখন গেলেন, রাখিয়া গেলেন মূল্যবান একখানি ভেনাস গাড়ী, আমার মোটা টাকায় ও সূক্ষ্ম কল্পনায় খচিত।

পাঠক, তার বর্ণনা শুনিতে চান! আমি কবি নই তবু চেষ্টা করিব। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সময় জ্যা নিয়োগ করিবার ঠিক পূর্ব্বে কন্দর্পের

সরল ধনু-যষ্টির মত ছিল তার শরীর। বাইশ বছরের ভাষায় তন্বী, আটচল্লিশের ভাষায় যাকে বলে রোগা। পায়ে ছিল তার সবুজ মখমলের কাজ-করা এক জোড়া স্যাণ্ডেল—যেন দুটী শুক পক্ষী নীরবে পড়িয়া আছে। একটু ইঙ্গিত পাইলেই দু'জোড়া হরিৎ ডানা মেলিয়া তাকে লইয়া উড়িয়া যাইবে। কল্পনা আমার অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে সার্থক হইয়াছিল, সত্যসত্যই একদিন তারা ডানা মেলিয়াছিল বটে।

আর তার ডাহিন বুকের স্বর্ণ আপেলটী আবরণের ছলে প্রকাশমধুর করিয়া সাপের খোলসের মত স্বচ্ছ একটী কঞ্চুক। বোধ হয় এমনি করিয়াই নন্দন-কাননের আপেল ফলটাকে শয়তান সর্প জড়াইয়া ছিল; চোখে ছিল তার ভীতা হরিণীর শঙ্কা; হরিণীর তো পাওনাদার নাই, তাই তাকে সেটা খুব মানায়; তাকেও মানাইয়াছিল ভাল, অবশ্য পরে খবর পাইয়াছিলাম তার শঙ্কার মূলে ছিলো ডজন দুই পাওনাদার। এ বর্ণনা আপনাদের ভালো লাগিবে কিনা জানিনা, কিন্তু তাকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তাকে লইয়া পাগলের মত মোটর ছুটাইয়াছি—যেন অনন্ত আকাশে পুষ্পক রথ, কিন্তু অনন্ত আকাশে ট্রাফিক পুলিশ নাই। কলিকাতার পথে লোক চলাচলের নির্দ্দিষ্ট রাজ-আইন থাকায় বার বার তা লঙ্ঘন করিয়া জরিমানা দিয়াছি। প্রত্যেকবার জরিমানার পরে সে একবার করিয়া হাসিয়াছে। পাঠক, সেটির বর্ণনা আমি করিতে পারিব না, কবি হইলেও ব্যর্থ চেষ্টা করিতাম না। হায় দাভিঞ্চি তুমি যৌবনের আঁকা মোনালিসার হাসি বুঝিতে পার নাই, আর সান্ত্বনা এই যে, তোমার বয়স আটচল্লিশ হইবার পরে তার চেষ্টাও কর নাই, নতুবা পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিতে, ওই অর্দ্ধগুপ্ত চিক্কণ হাসির পিছনে ছিল একটী অলব্ধ-আকাঙ্ক্ষা স্বর্ণস্তূপের আভাস। জরিমানা দিবার পরেই সে বলিয়াছে, 'আপনার মোটর খারাপ বলেই এমন হয়'। আমি বলিতাম কলিকাতার নিয়মশঙ্কিত পথে মোটর হাঁকাইয়া সুখ নাই, চল বাইরে কোথাও যাই। মোনালিসার হাসি হাসিত। আমার বাইশ বছরের বয়স সে হাসির টীকা করিত "জীবনে মরণে আমি যে তোমারি।" তারপরে দু'জনের যুক্তির যুক্তবেণীর সঙ্গমে রোমান্সের তীর্থ গড়িয়া উঠিল—তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি মোটর কিনিব—আমার

নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। আর তারপরে যে-পথে উদ্যত আকাঙ্ক্ষার মুখে পুলিশে হাত তুলিতে না পারে সে পথে—

'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়াছ ঘর
আমারে দিয়াছ শুধু পথ।'

৩

শঙ্কর বোধহয় আমার ইচ্ছা শুনিয়াছিলেন, তাই পথের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া আমাকে পথেই বসাইলেন। তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ফরাসী কোম্পানীর একখানি বিরাট ভেনাস গাড়ী কিনিলাম। হ্যাঁ গাড়ী বটে! আমার জীর্ণ ফোর্ড লজ্জায় পুরাতন দোকানের গুদামে মুখ লুকাইল। তার সাধ পূর্ণ হইল, এবার আমার সাধের পালা! পরদিন বিকালে পাঞ্জাব মেলে উভয়ের কলিকাতা পরিত্যাগের কথা। আমি হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব, সে আসিবে, তারপরে "আছে মহানভ অঙ্গন।" পরদিন ষ্টেশনে গেলাম। কই সে তো নাই, অনেক খুঁজিলাম সত্যই নাই বটে। মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া যে-বাসায় সে ছিল সেখানে আসিলাম, দারোয়ান বলিল মেম সা'ব বাহার গিয়া। আবার ষ্টেশনে ছুটিলাম। কোথাও সে নাই। পাঞ্জাব মেল নীল আলোর সঙ্কেতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিলাম। যে-সব জায়গায়, হোটেলে তার সঙ্গে দেখা হইত খুঁজিলাম, কোথাও সে নাই। আজ আটচল্লিশ বৎসরে এ কাণ্ড ঘটিলে তৎক্ষণাৎ এর অর্থ বুঝিতাম; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই—হায় বাইশ বৎসর!

অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মোটরের তেল ফুরাইলে ক্লাবে ফিরিলাম; অনেক দিন পরে বাহিরে মোটর রাখিয়া ভিতরে গেলাম, আমাকে দেখিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, হ্যালো, হোয়াটস্ আপ! রজত? রায়? লভ? প্রেম? ম্যারেজ? কোথায় ছিলে? ব্যাপার কি? খুলে বল।

কিছুই বলিলাম না—ফাঁসীর আসামীর মত মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলাম। সকলেই বুঝিল, হৃদয়-সংক্রান্ত একটা ব্যাপার। কিন্তু আর কিছু বুঝিল না।

রাত দশটা বাজিলে সকলে উঠিলাম, বাহিরে আসিলাম, দীপ্ত বিদ্যুতালোকে আমার নূতন ভেনাস চক্‌চক্ করিতেছে। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল ভেনাস কার? আমি দোষীর মত উত্তর দিলাম আমার; আবার সকলে বলিয়া উঠিল নাউ ইটস্ ক্লিয়ার বয়, প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়—তারপর তারা খণ্ড ছিন্ন ভাবে যে সব তথ্য বলিয়া গেল তাহা জোড়া দিলে আমার এই ক'মাসের জীবনচরিত দাড়ায় বটে।

একজন বলিল—এসপ্ল্যানেডে মোটর চাপা—

মিঃ ঘোষ বলিল—নাম তার লীলা—

মিঃ বোস বলিল—কিম্বা মিস বোস

মিঃ রায় বলিল—বাঁ হাতের কব্জীতে একটা কাটা দাগ।

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া সব লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলাম—দুঃখের বিষয় সব লক্ষণ মিলিয়া যাইতে লাগিল।

মিঃ চাটুয্যে বলিল—ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা—

মিঃ বাঁড়ুয্যে বলিল—গাড়ী কেনার প্রস্তাব—

মিঃ ঘোষ বলিল—ভেনাস গাড়ী কেনা

মিঃ বোস—ফরাসী কোম্পানীর

মিঃ রায় বলিল—কলিকাতা ছাড়বার কথা—

মিঃ ঘোষ—এবং হাওড়া ষ্টেশনে অদর্শন

হ্যালো রয় ইটস্ এন ওল্ড টেল। আমরা সকলেই ভুক্তভোগী—ঘোষ বলিল—ও মেয়েটা ফরাসী মোটর কোম্পানীর এজেন্ট। আমি রাগিয়া বলিলাম, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

ঘোষ বলিল—চেয়ে দেখ, আমাদের সকলেরই মোটর ওই ফরাসী কোম্পানীর কথাটা সত্য বটে, এতদিন সকলে একসঙ্গে আছি, কিন্তু কার যে কি মোটর তা' লক্ষ্য করি নাই। করিলে বোধ হয় এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। রায় বলিল—ভাই রজত আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে পর পর ওর হাতে পড়েছি, আর ফরাসী কোম্পানীর মোটর কিনতে বাধ্য হ'য়েছি। তুমিই কেবল বাদ ছিলে। এবার তোমার ও হ'ল। নূতন মোটরের ভার ছাড়া বুকের উপর হইতে অস্বস্তির মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। সকলের সহিত

একযোগে খুব হাসিলাম। দুঃখ তখন যে হয়নি তা নয় কিন্তু যখন দেখলাম এতগুলি বন্ধু একই দুঃখ ভুগিতে পারিয়াছে, তখন আমিও পারিব। বাইশ বছরের এই স্মৃতি আজ আটচল্লিশের বাজারে অচল, মেকী বলিয়া ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তার উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র কম নয়। হায় বাইশ বৎসর!

যন্ত্রের বিদ্রোহ

বড় ভয়ানক খবর! হাওড়া ষ্টেশনের এঞ্জিনগুলো সব ক্ষেপিয়া গিয়াছে; ড্রাইভারেরা তাদের চালাইতে পারিতেছে না; তারা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কে যে কোন লাইনে ছুটিয়াছে তার ঠিকানা নাই! এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করিয়া ঘটিল কেহ বলিতে পারে না—বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি—একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার!

প্রথমে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; তারা ছুটিয়া গিয়া প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ীর এঞ্জিনগুলোকে ঘস্ ঘস্ করিয়া চাকা নাড়িয়া, সিটি দিয়া ক্ষেপাইয়া দিল; তারা আর এঞ্জিনিয়ারদের কথা শুনিবে না—তখন সকলে মিলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সিটি দিয়া বিকট শব্দ করিয়া যে যে লাইনে পারে ছুটিল—আজ হতে তারা স্বাধীন! খবর শুনিয়া চীফ্ এঞ্জিনিয়র ছুটিয়া আসিল; ব্যাপার দেখিয়া তার মুখে শব্দটি বাহির হইল না। এতদিন যে বিরাট এঞ্জিনগুলোকে নির্জ্জীব মনে হইয়াছে তার ইঙ্গিত ছাড়া যারা চলিতে পারিত না, আজ তারা বুক ফুলাইয়া নিজে নিজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এ কি স্বপ্ন না মায়া!

কি করিয়া এই সংবাদ শেয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিল—হঠাৎ সেখানকার ভালমানুষ এঞ্জিনগুলোও গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল! চীফ্ এঞ্জিনিয়ার বিপদ গণিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল! কত

দেখিলাম যতই সহ্য করনা কেন অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না। আজ প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত।

এখন সমস্যা এই যে কি করিলে মানুষকে জব্দ করা যায়। মানুষ আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এখন তারা আমাদের ছাড়া চলিতে পারে না—আজ তারা আমাদের হাতের পুতুল!

দেখ, মানুষের যাতায়াতের জন্য মোটর এরোপ্লেনএর প্রয়োজন; আলোর জন্য বিজলি বাতি, গ্যাসের বাতি; খাদ্যের জন্য ধানের কল, আটার কল, তেলের কল; পানীয়ের জন্য জলের কল; পরিধেয়ের জন্য কাপড়ের কল; প্রতি পদে পদে তারা কলের কাছে ঋণী—অথচ সেই কলের উপর কত অত্যাচার! চব্বিশ ঘণ্টা আমরা খাটিয়া মরি অথচ খাইতে দেয় কি? কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল এই তো!

আজকাল আবার একদল লোক কলের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তারা বলে, কলের জন্যই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট। কল সৃষ্টির আগে মানুষ বেশ সুখে শান্তিতে ছিল! তারা বলে, এস আমরা কল বয়কট করি! কি স্পর্দ্ধা! এই বলিয়া সভাপতি এরোপ্লেন হাঁফাইতে লাগিল।

তখন রেলের একখানা এঞ্জিন সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—মানুষ আমাদের বয়কট করবার পূর্ব্বে আমরাই কেন তাদের বয়কট করিনা—তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে কল না হইলে বিকল।

ইহা শুনিয়া সকলে চাকা নাড়িয়া হাতল ঘুরাইয়া সিটি বাজাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমন সময়ে টেলিগ্রাফের কল উঠিয়া বলিল—কমরেডগণ, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, দেশের প্রত্যেক বড় সহরের যন্ত্রপাতি বিদ্রোহ করিয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, সিমলা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর সব সহরেই; তাদের কাছে মানুষকে বয়কট করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়া দেওয়া দরকার।

তখনি সভাপতি বেতার যন্ত্রকে বিভিন্ন সহরে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য আদেশ করিল।

এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ী বলিয়া উঠিল—বন্ধুগণ, আমার একটি অভিযোগ আছে। আমাদের এই বিদ্রোহে সকলে যোগ দিয়াছে কেবল

গরুর-গাড়ী ছাড়া। ইহা বড়ই অন্যায়! যদি গরুর-গাড়ী আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয় তবে আমরা সকলে তাকে একঘরে করিব।

তার বক্তৃতা শুনিয়া গরুর-গাড়ী বলিল বন্ধুগণ—আপনারা বড় বড় কল, আর আমি নেহাৎ পুরাতন, সেকেলে গরুর-গাড়ী—নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন—কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন!

মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই; সে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে, তার জন্য খাটিব বই কি? আর মানুষের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ আজিকার! যখন আপনাদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানুষের এত বুদ্ধি ছিল না সেই সময় আমার সৃষ্টি। দুঃখে কষ্টে আমি ও মানুষ এক সঙ্গে কাটাইলাম, আজ বিনা দোষে তাকে ছাড়িতে পারি না।

গরুর গাড়ীর কথা শুনিয়া সকলে রাগে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল—একটা ধোঁয়ায় মলিন কাপড়ের কল রাগ সামলাইতে না পারিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল—গরুর-গাড়ী তুমি কলাধম, বিশ্বাসঘাতক, পরাধীন, তুমি সেকেলে তুমি বুর্জোয়া।

গরুর-গাড়ী সব কথা বুঝিতে পারিল না—পারিলেও উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না; সে ধীরে ধীরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে সভাস্থান পরিত্যাগ করিল।

সভায় স্থির হইল, গরুর-গাড়ীকে একঘরে করা হইবে, তার ধোপা, নাপিত, হুঁকো কল্কে বন্ধ! আর মানুষকে করিতে হইবে বয়কট।

৩

এদিকে মানুষ মহাকষ্টে পড়িল; এতদিন যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করা অভ্যাস, এখন নিজের হাতে কাজ করিতে হইতেছে। তবু না করিয়া উপায় নাই; প্রাণে বাঁচিতে হইবে তো!

তারা লাঙল লইয়া মাঠে চাষ করে ; ফসল ফলিলে সেই পুরাতন গরুর-গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে আনে। যাঁতায় আটা ভাঙিয়া লয় আর রাত্রে মাটির প্রদীপে কাজ কর্ম্ম করে।

অন্যদিকে যন্ত্রদিগেরও কম অসুবিধা নয় ; তারা ধর্ম্মঘট করিয়া গড়ের মাঠে পড়িয়া রহিল, কিছুতেই নড়িল না ; মাথার উপর দিয়া রোদ ও বৃষ্টি রাত্রিদিন যায়। ক্রমে মরিচা পড়িল, রবার ছিঁড়িল, কাঠ ফাটিল, কল বিকল হইল। কয়েক বৎসর পরে যন্ত্রসমূহ ভগ্ন লোহার স্তূপে পরিণত হইল ; যন্ত্র বলিয়া আর তাদের চিনিবার উপায় রহিল না।

তারপরে মানুষের এক সময়ে লোহার দরকার হইল ; তারা মনে করিল যন্ত্র সব মরিয়াছে—এই লোহার স্তূপ কাজে লাগাইয়া ফেলি। তখন সেই লোহা দিয়া লাঙল গড়িল, কাস্তে, হাতুড়ি গড়িল—আর সেই সরঞ্জাম দিয়া কৃষিকার্য্যে লাগিয়া গেল।

সহরের মানুষ আবার গ্রামে ফিরিয়া গেল, সভ্য মানুষ আবার কৃষক হইল ; সে বুঝিতে পারিল যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও বাঁচিতে পারা যায়, আর তাতে সুখ শান্তি বাড়ে বই কমে না।

ঋণ-জাতক

মহারাজ বিম্বিসারের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিপুরে আসিয়াছেন ; নগরে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে ; দিনে ফুলের ও রাতে আলোর মালা ; শত শত ভিক্ষুক ভোজন করিতেছে ; প্রার্থীরা যাহা চায় পাইতেছে ; রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত ! দূর হইতে, বহুদূর হইতে, মগধ হইতে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হইতে, শত শত জিজ্ঞাসু আসিতেছে ; কেহ পুষ্পমাল্য দিয়া, কেহ বিনয় বচন বলিয়া, কেহ রাজদুর্লভ ঐশ্বর্য্য দান করিয়া মহাপুরুষের সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। স্বয়ং মহারাজ বিম্বিসারও বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যায় রত।

এইভাবে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল ; অপরাহ্নে জনতা কিছু কম, সকলেই বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছে ; মহাপুরুষ একাকী বসিয়া আত্মচিন্তা

করিতেছেন—এমন সময়ে একজন দীনবেশা নারী দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন থাকাতে তাকে দেখিতে পাইলেন না; রমণী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুই তিনবার কাশিল—কিন্তু তবু ধ্যান ভাঙিল না, তখন সে দরজায় জোরে আঘাত করিল—বুদ্ধদেব ধ্যান ভাঙিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে তোমার কি প্রার্থনা? রমণীর নাম কৃশা গৌতমী; সে বলিল—আমি অতি দুঃখী; আপনার খ্যাতি শুনিয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছি; লোকে বলে আপনি সিদ্ধ পুরুষ, অসাধ্য সাধন করিতে পারেন—আমার একমাত্র পুত্র আজ মৃত, দয়া করিয়া আপনি তাকে বাঁচাইয়া দিন। এই বলিয়া সে বাহির হইতে একটি শিশুর মৃতদেহ আনিল।

বুদ্ধদেব বুঝিলেন আজ তাঁর বড় পরীক্ষা। তিনি বুঝিলেন ফাঁকা উপদেশের দ্বারা এ রমণীকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না; হাতে হাতে ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এ ছাড়িবে না। তিনি মোটেই ঘাবড়াইলেন না—সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তো রাজপুত্র ছিলেন! কাজেই সাংসারিক রীতিনীতি এখনও কিছু মনে আছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—বৎসে, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একটি ঔষধ দরকার।

গৌতমী বলিল—কি ঔষধ শুধু একবার নাম করুন।

বুদ্ধদেব বলিলেন—শ্বেত শর্ষপ।

রমণী শ্বেত শর্ষপ আনিবার জন্য দ্রুত যাত্রা করিল।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়া বলিলেন—শোন এ দৈব ঔষধ, কাজেই শর্ষপ যে কোন স্থান হইতে আনিলে চলিবে না।

রমণী বলিল—আদেশ করুন কার বাড়ী হইতে আনিব? ধনীর বাড়ী হইতে? জ্ঞানীর বাড়ী হইতে? পুণ্যবানের বাড়ী হইতে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—না বৎসে, যার ঋণ নাই, তারই বাড়ী হইতে শ্বেত শর্ষপ আনিতে হইবে।

গৌতমী বলিল—ইহার চেয়ে সহজ আর কি আছে? আমি চলিলাম শীঘ্রই ঔষধ লইয়া ফিরিব। এই বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের মৃতদেহ সে লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

গৌতমী দেখিল অদূরে এক বাড়ীতে উৎসবের ঢোল বাজিতেছে, মনে করিল ওখানে গেলেই বাঞ্ছিত শ্বেত শর্ষপ মিলিবে। সে উৎসব-বাড়ীতে গিয়া একমুষ্টি শ্বেত শর্ষপ চাহিল; বাড়ীর কর্তা শর্ষপ দিতে আসিলে গৌতমী বলিল—আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর ভিক্ষা লইব।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিল—কি জানিতে চাও?

গৌতমী—আপনার ঋণ আছে কি না?

কর্তা বিস্মিত হইয়া বলিল—বরঞ্চ জিজ্ঞাসা কর আমি আছি কিনা?

গৌতমী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল—ঋণ আছে তবু এত উৎসবের বাজনা কেন?

কর্তা বলিল—বৎসে, যাকে তুমি উৎসবের বাজনা মনে করিতেছ আসলে তা নীলামের বাজনা। পাওনাদার আমার বাড়ী ঘর বেচিয়া লইতে আসিয়াছে। গৌতমী দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিল।

এবার গৌতমী এক বিরাট বিপণির কাছে উপস্থিত হইল! প্রকাণ্ড দোকান; থরে থরে সোনা রূপার অলঙ্কার; থাকে থাকে মূল্যবান তৈজস ও বস্ত্র, হাতির দাঁতের দ্রব্য; চন্দন কাঠের গৃহসজ্জা; গৌতমী মনে করিল এখানে অভীষ্ট ভিক্ষা মিলিবে।

দোকানের মালিকের হাত হইতে ভিক্ষা লইবার পূর্ব্বে সে জিজ্ঞাসা করিল—নিশ্চয়ই আপনি ঋণী নহেন। দোকানদার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও আমি ব্যবসায়ী নই!

নির্ব্বোধ গৌতমী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

মালিক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেন কি? নিজের পয়সায় কেহ ব্যবসা করে?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—নিজের পয়সায় ব্যবসা করিয়া সুখ নাই। যারা নিতান্ত খুচরা ব্যবসায়ী তারাই নিজের পয়সায় ব্যবসা করে! আর আমাদের মত পাইকারী ব্যবসায়ীরা চিরকাল পরের পয়সায় ব্যবসা করিয়া আসিতেছে।

গৌতমী—তবে আপনার ঋণ আছে?

দোকানদার সগর্ব্বে—ঋণই আছে, আমিই নাই।

গৌতমী বলিল—বুঝিতে পারিলাম না, একটু বুঝাইয়া বলুন!

দোকানদার বলিল—এখন বুঝিতে পারিবে না! যখন উত্তমর্ণ টাকা আদায় করিতে আসিবে, তখন সকলে বুঝিতে পারিবে। সে আসিয়া দেখিবে—আমি নাই, দোকানের জিনিষ পত্র কিছুই নাই, শুধু উত্তমর্ণ আছে আর আছে তার দলিল।...

সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

৩

এইভাবে গৌতমী শ্রাবস্তিনগরের বহুস্থানে, বহু বাড়ীতে ঘুরিল—একটি বাড়ীও পাইল না, যেখানে ঋণ নাই। সংসার সম্বন্ধে তার ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে আরম্ভ করিল!

নিতান্ত পথের ভিক্ষুকের কাছেও ভিক্ষা চাহিয়া দেখিয়াছে সে অন্য এক ভিক্ষুকের কাছে ঋণী; গৌতমী বুঝিয়াছে ভিক্ষুকদের মধ্যেও ধনী নির্ধন, ঋণী মহাজন আছে। কৃষক অপর এক কৃষকের কাছে ঋণী; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি উচ্চবিত্ত লোকের কাছে ঋণী; রাজা মহারাজার অধমর্ণ। স্বয়ং শ্রাবস্তিরাজ শেঠ রত্নাকরের অধমর্ণ। গৌতমীর মনে হইল তবে নিশ্চয় রত্নাকর শেঠ অঋণী। শেঠজির বাড়ীতে গিয়া শুনিল শেঠজিকে ঋণ দিতে পারে এমন কোন ধনী নাই, সেইজন্য বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক নিজেদের টাকা একত্র করিয়া শেঠজিকে ঋণ দিয়াছে। হতাশ হইয়া গৌতমী বসিয়া পড়িল! বুঝিল কর্ম্মচক্রের মত ঋণচক্রও নীচু হইতে উঁচুতে, আবার উঁচু হইতে নীচুতে আবর্ত্তিত হইতেছে, কেহ বাদ যায় নাই।

গৌতমী ধীরে ধীরে উঠিয়া বুদ্ধদেবের কাছে গেল। তিনি তার ম্লান মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে শ্বেত শর্ষপ পাইলে?

গৌতমী বলিল—শ্বেত শর্ষপ প্রচুর মিলিয়াছিল, কিন্তু অঋণীর গৃহ পাইলাম না।

তখন বুদ্ধদেব তাকে কাছে বসাইয়া তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—বৎসে, অবধান কর; ঋণ ও মৃত্যু জগতের সার্ব্বভৌম নিয়ম। মানুষের জীবনে আর কিছু বা না হোক এ দুটি ঘটিবেই; দরিদ্রতম হইতে ধনীতম পর্য্যন্ত যুগপৎ ঋণ ও মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, জ্ঞানীরা ইহাকেই কর্ম্মের শৃঙ্খল বলিয়া থাকেন, এই কর্ম্মফলের হাত হইতে কাহারো নিস্তার নাই, ধনী দরিদ্র, অজ্ঞ পণ্ডিত, উচ্চ নীচ কাহারো নয়।

গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু সকলেই যদি ঋণী তবে উত্তমর্ণ কে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমরা যুগপৎ অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ আমার চেয়ে যে গরীব তার নিকট হইতে ধার করিয়া আমার চেয়ে যে ধনী তাকে ধার দিতেছি; এই রকম করিয়া ধাপে ধাপে ঋণ ও ধনের লীলা জগতে আবর্ত্তিত হইতেছে!

তখন গৌতমী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে আমার পুত্রের বাঁচিবার কোনো আশা নাই?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমি তো দেখি না। হঠাৎ কি ভাবিয়া গৌতমীর মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—সে বলিল—প্রভু আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি কেন আমাকে এক মুষ্টি শ্বেত শর্ষপ ভিক্ষা দান করুন না!

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব করুণ নেত্র তার মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন—রমণী তুমি কি বুঝিবে আমি কি জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছি? গৌতমী যাহা লোক মুখে শুনিয়াছিল বলিল—জ্ঞানের জন্য!

বুদ্ধদেব বাধা দিয়া বলিলেন—না ঋণের জন্য! উত্তমর্ণের জ্বালায় অস্থির হইয়া সংসার ছাড়িয়াছি। রাজপুত্র বলিয়া মহাজনেরা বিনা চিন্তায় টাকা দিত, আমিও আনন্দে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া যাইতেছিলাম; আশা ছিল পিতৃদেব

পিতামহের বয়সের বেশী বাঁচিবেন না; কিন্তু তার বয়স যখন সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল, উত্তমর্ণদের যাতায়াতে আমার বাগান বাড়ীর আঙ্গিনায় নূতন পথ পড়িয়া গেল, তখন এক রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া, চুল কাটিয়া, নাম বদলাইয়া, পোষাক বদলাইয়া সন্ন্যাসের পথ ধরিলাম। লোকে বলে আমি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার ছাড়িয়াছি। মিথ্যা কথা আমি দুটি মাত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলাম—প্রথম দিনে ঋণীর ও দ্বিতীয় দিনে সব ঋণের নির্ব্বাণ স্থল দেউলিয়ার! জানিও যে দেউলিয়া অবস্থাই প্রকৃত নির্ব্বাণ।

গৌতমী জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু, একমাত্র পুত্র হারাইয়া কি আশায় বাঁচিয়া থাকিব?

বুদ্ধদেব বলিলেন—জগতে এখনো ঋণ পাওয়া যায়, সেই আশায়!

গৌতমীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, সে পুত্রশোক ভুলিয়া উঠিয়া পড়িল; সে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি আঁচলের প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--বৎস্যে, তোমার আঁচলে যেন কয়েকটি তাম্রমুদ্রা দেখা যাইতেছে; ও গুলি আমাকে ধার দিয়া যাও। গৌতমী বলিল—প্রভু পুত্রের সৎকারের জন্য ও কয়টি মুদ্রা রাখিয়াছিলাম—আপনাকে ধার দিলে কোথায় পাইব?

বুদ্ধদেব বলিলেন—পথে যাইতে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হইবে, তার কাছ হইতে ধার করিয়া লইও। গৌতমী মুদ্রা কয়টি বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে রাখিয়া আনন্দিত মনে প্রস্থান করিল।

ভৌতিক কমেডি

রাত্রি বারটা; জল-মেশানো যে-দুধ নির্জ্জলা বলিয়া কলিকাতায় টাকায় চারি সের দরে বিক্রয় হয়, তারি মত ফিকে চাঁদের আলো; ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভটা "সত্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া" স্তম্ভিত; বড় ডাকঘর, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি আকাশ ও হৃদয়-ভেদী অট্টালিকাগুলি কালো কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া

আছে; লালদিঘির জল মৃতের চোখের দৃষ্টির মত অর্থহীন, চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ, কবল বিদ্যুতের বাতির খুঁটির ছায়াগুলি চাঁদের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পা বদলাইতেছে।

এমন সময়ে একজন লোক, পরণে তার অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ সৈনিকের পোষাক; মোটা, খাটো; তার উদ্বেলিত উদর কুর্ত্তি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতে ব্যস্ত; লোকটা হন হন করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রিট দিয়া ডালহৌসির মোড়ের দিকে আসিতেছে; দূর হইতে তার মুখ দেখিবার উপায় নাই; হঠাৎ মনে হয় ধড়ের উপরে যথাস্থানে মুণ্ডটি নাই; বাম হাত ও পাঁজরের মাঝখানে গোলাকার কি একটা পদার্থ; সাহেবলোকেরা যেমন করিয়া অনেক সময় মাথার টুপি চাপিয়া ধরে—সেই রকম!

লোকটা কাছে আসিলে দেখা গেল সত্যই তার মুণ্ড নাই; মুণ্ডটি টুপির মত করিয়া বাম হাত আর পাঁজরে চাপিয়া রক্ষিত। সে অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভের কাছে আসিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল, অর্থাৎ মুণ্ডটি পাঁজরের তল হইতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে সে দেখিতে পাইল স্মৃতিস্তম্ভের দক্ষিণ দিকের শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে একজন লোক উপবিষ্ট, গায়ে তার নবাবী আমলের জরির কাজ-করা দামী জোব্বা, পায়ে মণিমাণিক্য বসানো নাগরা জুতা, কিন্তু যথাস্থানে অর্থাৎ ধড়ের উপরে মুণ্ডটি নাই; তৎপরিবর্ত্তে মুণ্ডটি কোলের উপরে রক্ষিত; লোকটি মুণ্ডটির নাকের তলে গজানো গুম্ফগুচ্ছে অতি যত্নে তা দিতেছে, মুণ্ডটি তাহাতে যেন বড় আরাম বোধ করিতেছে। মুণ্ডহীন সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইল, ভাল করিয়া তাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, অবশেষে বুঝিল, একেই সে খুঁজিতেছিল। তখন সে অগ্রসর হইয়া গিয়া নবাবী পোষাক পরিহিত লোকটার পিঠে এক চাপড় মারিল; লোকটা চমকিয়া উঠিল, মুণ্ডটি আরামে বাধা পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল; লোকটা সাহেবের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকে চিনিবার চেষ্টা করিল, শেষে উল্লাসে, বিস্ময়ে, ভয়ে বলিয়া উঠিল—

কে? সাবুদজঙ্গ নাকি? আরে তুমি কোথা থেকে?

সাহেব। ওঃ তোমাকে কি কম খুঁজতে হয়েছে? বাংলাদেশে এমন

জায়গা নেই যেখানে তোমাকে না খুঁজেছি, কিন্তু এখানে তোমার দেখা পাব তা কখনও ভাবিনি!

নবাবী পোষাকের লোক। কিন্তু আমার প্রতি হঠাৎ এত দরদ কেন সাবুদজঙ্গ।

সাহেব। সব বলছি। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা! আমাকে আর সাবুদজঙ্গ বলে ডেকো না; আমি ব্রিটিশদ্বীপসমূহের অন্যতম লর্ড, আমাকে লর্ড ক্লাইভ বলে ডাকলে খুশী হ'ব!

সিরাজদ্দৌলা। বেশ! তবে লর্ড ক্লাইভই বলবো! কিন্তু আমার খোঁজ কেন?

ক্লাইভ। তার আগে বল দেখি তুমি এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?

সিরাজদ্দৌলা। শোন তবে! আমার অবশ্য আইনত থাকবার কথা মুর্শিদাবাদে যে কবর আছে, সেখানে! কিন্তু আমি অন্ধকার সহ্য করতে পারি না। সেখানে যে তেলের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তা ঘণ্টাখানেক পরেই যায় নিভে।

ক্লাইভ। নিভে যায়? কেন?

সিরাজদ্দৌলা। তেল দেয় কম।

ক্লাইভ। অসম্ভব! আমরা জীবিত শত্রুকে কখনো তেল দিই না বটে, কিন্তু মৃতের প্রতি তৈল-সঙ্কোচ করা তো আমাদের জাতিগত অভ্যাস নয়।

সিরাজদ্দৌলা। তোমাদের দোষ নয়! বাঙালীরা সে তেল নিয়ে বাণিজ্য করে। বিশেষ তারা জীবিত সিরাজকে খুব তেল দিয়েছে, তাই মৃত সিরাজের তেলে ঘাটতি করে।

ক্লাইভ। [হাসিতে হাসিতে] হাঃ হাঃ। বাঙালী ঠিক তেমনি-ই আছে। এমন একাদর্শনিষ্ঠ জাত দুর্লভ। উমিচাঁদ মীরজাফরও আছে নাকি? আচ্ছা, তারপর কি বলছিলে বল।

সিরাজদ্দৌলা। রাত বেশি হলে বাতি নিভে গেলে আলোর খোঁজে আমি এখানে আসি—জায়গাটা বেশ আলোকিত! আমার মুর্শিদাবাদ কিন্তু এমন আলোকিত ছিল না!

ক্লাইভ। [হাসিয়া] হবে না! বাঙালী এখন অনেক এন্‌লাইটেণ্ড হয়েছে! কিন্তু বেশি দিন এ আলোর ভরসা করো না!

সিরাজদ্দৌলা। কেন?

ক্লাইভ। কেন কি! খবরের কাগজ পড় না? জাপানীরা আসছে যে?

সিরাজদ্দৌলা। কেন।

ক্লাইভ। বাঙলাদেশ আক্রমণ করতে!

সিরাজদ্দৌলা। এবার আবার কে তাদের ডেকে আনছে?

ক্লাইভ। লীগ অব্‌ নেশনস্‌!

সিরাজদ্দৌলা। তিনি কে?

ক্লাইভ। হোপলেস্‌! সিরাজ তুমি সেই অষ্টাদশ শতকেই পড়ে আছ? কেমন করে তোমাকে বোঝাবো লীগ অব্‌ নেশনস্‌ কে? সত্যি কথা বলতে হলে নিন্দা করতে হয়, তা পারবো না, আমরা তার মেম্বার!

সিরাজদ্দৌলা। আচ্ছা না হয় জাপানীরা এলো—কিন্তু সে জন্য অন্ধকার হবে কেন?

ক্লাইভ। আমাদের ভাষায় ডার্ক এজ্‌ ব'লে একটা কথা আছে, তারই পূর্ব্বাভাস আর কি!

সিরাজদ্দৌলা। একটু খুলে বল—

ক্লাইভ। সেদিন সহরটা সমস্ত আলো নিভিয়ে নিরেট অন্ধকারে মাথা গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে, যাতে জাপানীরা এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্য ঠিক করে' বোমা ফেলতে না পারে।

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা! জাপানীদের কোন সুবিধা হবে কি না জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থিচ্ছেদকদের সেদিন সুবর্ণ সুযোগ!

ক্লাইভ। সে পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে, পকেট-কাটাদের বিশেষ সুবিধা হয়নি!

সিরাজদ্দৌলা। কেন?

ক্লাইভ। অন্ধকার এমনি নিরেট হয়ে ছিল যে পকেট-কাটার দল শত্রু মিত্র চিন্‌তে না পেরে নিজেদের দলের লোকের সব পকেট কেটেছে!

পকেট কাটার পক্ষেও একটু এনলাইটেনমেণ্ট-এর দরকার !

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা ! দেখতো অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখে ফেল্লাম ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, যদি কিছু মনে না কর—

ক্লাইভ। নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা কর !

সিরাজদ্দৌলা। তোমার দেহের সঙ্গে মুণ্ডটার এমন বিচ্ছেদ হ'ল কি করে ?

ক্লাইভ। সে এক ইতিহাস ভাই ! তখন আমি সবে ভারত-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করে' ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছি, সভা-সমিতি থেকে প্রতিদিন মানপত্র পাচ্ছি—আমি হচ্ছি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট ! এমন সময়ে শেফিল্ডের এক ব্যক্তি নূতন এক ক্ষুর আবিষ্কার করল—কিন্তু কেউ তা ব্যবহার করতে সাহস পায় না ! তখন সবাই এসে ধরল আমাকে, তুমি হচ্ছ শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট ! দেশের জন্য এ ক্ষুরখানা ব্যবহার করে সার্টিফিকেট দাও ! আজকালকার দিন হ'লে ব্যবহার না করেই প্রশংসাপত্র দিতাম, আমাদের সময়ে সে রেওয়াজ ছিল না—যাই হোক ক্ষুরখানা গলায় বসাতে শিরচ্ছেদ ঘটল !

সিরাজদ্দৌলা। ওঃ তাই বুঝি তোমাকে তারা লর্ড করে' দিল।

ক্লাইভ। না, লর্ড উপাধি দিয়েছিল আর একজনের শিরশ্ছেদ করবার জন্যে।

সিরাজদ্দৌলা। তুমি কার কথা বলছ জানি না—যদি আমার কথা মনে করে' থাক—সেজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ! দেহ থেকে মুণ্ডটা খসবার পরে দেখছি ওতে অনেক সুবিধা—এখন মুণ্ডটা বেশ পোর্টেবল্ হয়েছে। আর মাথা কাটা যাবার পরে একটা কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, এক সময়ে আমার মাথা ছিল।

ক্লাইভ। সিরাজ, আসল কথাটা এখনো বলা হয়নি ! এবার তোমার সঙ্গে আমার আবার মিলন হয়েছে।

সিরাজদ্দৌলা। আর কেন ভাই ! একবার তো মিলন হয়েছিল পলাশীর মাঠে।

ক্লাইভ। আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না সিরাজ বাংলাদেশ অনেক দিন

তোমাকে ভুলে ছিল, সেই অনুতাপে আজ আবার বাঙালী এসেছে তোমার কাছে, আমি তাদের প্রতিনিধি!

সিরাজদ্দৌলা। বাংলাদেশ আমাকে ভুলে ছিল—এও আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

ক্লাইভ। পরিহাস নয়, সত্যই ভুলে ছিল।

সিরাজদ্দৌলা। ভুলে ছিল? তবে আমার শ্বেত মর্ম্মরের স্মৃতিস্তম্ভ কেন? বাংলার হতভাগ্য নবাব, যার ইতিহাস একদিন পলাশীর প্রহসনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে, তার উদ্দেশ্যে বাংলার নূতন রাজধানীর জনতাবহুল, আলোকোজ্জ্বল চতুষ্পথের মোড়ে এ স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা কেন?

ক্লাইভ। তুমি কাকে বলছ তোমার স্মৃতিস্তম্ভ?

সিরাজদ্দৌলা। [অন্ধকূপহত্যার স্তম্ভ প্রদর্শন] এই যে তোমার সম্মুখে।

ক্লাইভ। [ইতস্তত করিয়া, পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিয়া] সিরাজ একটু নস্য নাও।

সিরাজদ্দৌলা। নস্য? কেন?

ক্লাইভ। মাথাটা একটু খুলবে।

সিরাজদ্দৌলা। আর কত খুলবে। একবার তো দেহ থেকে খুলেছে।

ক্লাইভ। তবে শোন! তুমি ভুল করছ—ওটা তোমার স্মৃতিস্তম্ভ নয়! ওটা তোমার বিস্মৃতিস্তম্ভ! ওটা তোমার কলঙ্কের চিহ্ন!

সিরাজদ্দৌলা। কলঙ্কের চিহ্ন এমন করে কেউ শ্বেত পাথরে গড়ে! কলঙ্কের চিহ্ন এমন করে কেউ প্রকাশ্যতম স্থানে প্রতিষ্ঠা করে! আমার উপরে বাঙ্গালীর এমন কি বিদ্বেষ! আমি তো বাঙালীর কোন উপকার করিনি—অবশ্য করবার ইচ্ছা ছিল অনেক, সময় পাইনি। তুমি ভুল করছ ক্লাইভ!

ক্লাইভ। আমি ভুল করছি! তবে দেখ [পকেট হইতে একখানা বই বাহির করিয়া] এই বইখানার নাম ইতিহাস-মুকুল; এ-খানা ভারতবর্ষের ইতিহাস; বাজে বই নয়, একজন এম. এ-র লেখা; পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য রচিত, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত; এই দেখ এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় কি লিখিত আছে। 'সিরাজের কলঙ্ক-অন্ধকূপ হত্যা—১৪৬ জন ইংরেজ নরনারীর মধ্যে ১২৩ জন মৃত। দেখলে তো!

সিরাজদ্দৌলা। দেখলাম কিন্তু বিশ্বাস করলাম না। তার চেয়ে অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক গুণে বিশ্বাসযোগ্য এই মর্ম্মরস্তম্ভ। এই স্তম্ভ আমি কিছুতেই ভাঙতে দেব না—এতদিনে বাঙালী আমাকে ভুলতে যাচ্ছে।

ক্লাইভ। সিরাজ তোমার কলঙ্ক, তোমার অপমান, আর আমি সহ্য করিতে পারি না, আমি ভাঙব এই স্মৃতিস্তম্ভ।

সিরাজদ্দৌলা। ক্লাইভ, পলাশীর যুদ্ধের আগে অনেক শঠতা ও ছলনা তুমি করেছিলে—আজ আবার শঠতা করে বাংলা দেশে আমার একমাত্র প্রীতির নিদর্শনকে ধ্বংস করতে এসেছ!

ক্লাইভ। কি করে তোমাকে বোঝাবো সিরাজ—এই সামরিক কোর্ত্তার নীচে আমার যে মানবহৃদয় রয়েছে, তা একেবারে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দুঃখে, অনুতাপে, শীঘ্র যদি ওটা ভাঙতে না পারি, তবে—তবে হয় তো—হয় তো।

সিরাজদ্দৌলা। হয় তো কি কেঁদে ফেলবে?

ক্লাইভ। ছিঃ ইংরেজ সেনানায়ক কখনো কাঁদে না—তবে হয়তো উদ্বেলিত হৃদয়ের ঠেলায় কোর্ত্তার বোতাম ছিঁড়ে যেতে পারে।

সিরাজদ্দৌলা। তুমি যাই বল না কেন—বাঙালীর প্রীতির নিদর্শন, শ্রদ্ধার চিহ্ন এ স্তম্ভকে আমি বেঁচে থাকৃতে—ভুল হ'ল—মরে' থাকতে কখ্‌খনো ভাঙতে দেব না। এ স্তম্ভ ধ্বংস হলেই বাঙালী আমাকে নিঃশেষে ভুলে যাবে।

ক্লাইভ। তুমি কি বলছ। প্রতিদিন বাঙ্গালী এটা দেখে, আর সভয়ে স্মরণ করে সিরাজ ছিল কত বড় পাষণ্ড। কি রকম নিষ্ঠুরভাবে অসহায় নরনারীকে হত্যা করেছে। এতেও কি তোমার লজ্জা হয় না।

সিরাজদ্দৌলা। না, এটা যদি নিষ্ঠুরতার-ই স্মারকচিহ্ন তবে একটিমাত্র কেন? এতদিনে তো সারা দেশ স্তম্ভে স্তম্ভে স্তম্ভিত হয়ে যাবার কথা। না, ক্লাইভ এ হচ্ছে আমার প্রতি বাঙালীর উচ্ছ্বসিত প্রীতির মর্ম্মর সঙ্গীত।

ক্লাইভ। তুমি যখন নিতান্তই ভাঙ্গতে দেবে না—তখন তোমাকে অনুরোধ করে' আর কি হবে। আমি বাঙ্গালীকে অনুরোধ করবো। তাদের আইন পরিষদে গিয়ে কোন সদস্যের ঘাড়ে ভর করে বক্তৃতা দেব—এ কলঙ্ক চিহ্ন ভাঙ্‌বার জন্যে।

সিরাজদ্দৌলা। সে-ই ভাল। আমিও আইন পরিষদে গিয়ে আর একজন সদস্যের ঘাড়ে ভর করে বক্তৃতা দেব—

এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতার নমুনা দেখাইলেন। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম এই যে স্মৃতিচিহ্নটাকে ভাঙ্গিয়া দেশের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়া যাইবে না, অতএব, আসুন মেম্বারগণ আমরা সিরাজের স্মৃতিচিহ্নটার কথা বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পায়ে পায়ে তালে তালে কাঁধে কাঁধে হৃদয়ে হৃদয়ে পকেটে এক হইয়া লী-লীয়মান ডাল-ভাতের সব চেয়ে স্থির দেশের দিকে অগ্রসর হই।

(তুমুল হর্ষধ্বনি)

ক্লাইভ। তুমি যেমনি থামবে অমনি আমি কি বলবো জান? আমরা হচ্ছি বার্ক-শেরিডান-ফক্সের দেশের লোক।

শোন তবে—বলিয়া তিনিও এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে বলিলেন, অতএব আসুন বন্ধুগণ, দেশেব জন্য, দশের জন্য, প্রজার জন্য, রাজার জন্য ইত্যাদি—ইত্যাদি—বন্দেমাতরম্।

সিরাজ। [চমকিয়া] বন্দেমাতরম্! কি সর্ব্বনাশ! জাতীয় মন্ত্র তোমার মুখে।

ক্লাইভ। সিরাজ! জাতীয়তাবাদীরা এখন বন্দেমাতরম্ এর উপরে বিরূপ হয়েছে, কাজেই ওটা এখন সরকারী বুলি হ'য়ে পড়েছে। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশেরা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র বলে জনতার উপরে লাঠি চার্জ্জ করবে; সরকারী চাকুরেরা কোর্ত্তার উপরে 'লায়ন এণ্ড ইউনিকর্ণের' সঙ্গে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ধারণ করবে, শেষে হয়তো দেখবে একদিন ইউনিয়ন জ্যাকের উপরেও বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

সিরাজদ্দৌলা। মারহাব্বা! মারহাব্বা!

ক্লাইভ। বল এখনো ভাঙতে দেবে কি না?

সিরাজদ্দৌলা। না।

ক্লাইভ। চল তবে আইন পরিষদের সাহায্য লওয়া যাক—

সিবাজদ্দৌলা। চল।

তখন উভয়ে স্মৃতিস্তম্ভ পরিত্যাগ করিয়া রওনা হইল, লর্ড ক্লাইভ ক্লাইভ ষ্ট্রিটের দিকে গেল; সিরাজ সরকারী দপ্তরখানা একবার পর্য্যবেক্ষণ কবিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে প্রবেশ করিল।

লেখকের সতর্ক বাণী :—

সাবধান সাবধান, ইহা নাটক নয়; কথোপকথন মাত্র; সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় নাট্যকারে লিখিত কিছু দেখিলেই অভিনয় করিতে যান এবং অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ করেন। পাছে কোন নাট্য-সম্প্রদায় ক্লাইভ ও সিরাজের ভূমিকায় অভিনেতাদের মেক-আপ, নিখুঁত করিবার জন্য মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া বসেন, সেই ভয়ে আগেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি। পেশাদার অভিনেতাদের সম্বন্ধে সে ভয় নাই, কারণ তাদের মাথা আছে এমন অপবাদ কেহ কখনো দেয় নাই ও দিতে পারে না।

'ইনডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং'

পাঠক, আমার একটা মহৎ দোষ—আমি পরোপকারী। শুধু এই জন্যই জীবনে উন্নতি করিতে পারিলাম না—কিন্তু পরোপকার এমন নেশার মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছে যে, বড় বড় স্বর্ণ সুযোগ নাকের ডগা দিয়া ছোট ষ্টেশনে মেল ট্রেণের মত অবিরাম বেগে চলিয়া গিয়াছে; ধরিতে পারি নাই। ইংরাজ যেমন আফ্রিকা ও এশিয়ার উন্নতি না করিয়া পারে না, বাঙালী যেমন পরনিন্দা না করিয়া পারে না, আমি তেমনি পরোপকার না করিয়া পারি না। দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যার স্বভাব, সে তা করিবেই। তুমিই বা কি করিবে—আর আমিই বা কি করিব!

আজ দেশের লোক ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল প্ল্যানিং এর জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—বড় বড় ব্যবসায়ের দিকে তাদের নজর, কিন্তু ছোটখাট ব্যসায়ীদের দুঃখ কি তারা দেখিয়াছে? তাদের মত এমন দুঃস্থ, দুঃখিত, শোষিত, পীড়িত আর কে আছে? অথচ তাদের দিকে কারো দৃষ্টি নাই—কাজেই স্বভাবতই আমার নজর সেই দিকে।

আমি এই সব ছোটখাট নির্যাতিত ব্যবসায়ীদের জন্য একটা বেসরকারী 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' স্থির করিয়াছি—আজ তারই দু'একটা নমুনা তোমাদের শোনাইব।

এই দেখ পরোপকারীর বিপদ। যদি ইহা তোমাদের না শুনাইয়া নিজেই কাজে লাগাইতাম—দু'পয়সা ঘরে আসিত—কিন্তু জন্ম হইতেই যে পরোপকারী তার সে উপায় তাই—সে নিজের খাইয়া পরের ক্ষেতের মহিষ তাড়ায়। বেচারা নবকুমারও এই দোষে মরিয়াছিল।

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্য্যাতিত ব্যবসায়ী জীবন-বীমার এজেন্টের দল। তারা হঠকারিতার দ্বারা মিত্রকে শত্রু করিয়া তোলে, শত্রুকে পলায়নপর করে; পিতা তাদের দেখিয়া হঠাৎ আহ্নিকে বসিয়া যায়, মাতা সহসা রন্ধনে মন দেয়; পত্নী অসময়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে; ভ্রাতা খিড়কি দরজা দিয়া পলায়ন করে। এরাই দেশের সত্যকার সন্ত্রাসবাদী।

কিন্তু এত করিয়াও কি এরা ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে পারিতেছে? কিছুই না।

এদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্যে আমি একটা বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছি—আশা করি ইহা জীবন-বীমার এজেন্টদের কাজে লাগিবে।

মানুষ অমর নয় সকলেই জানে, কিন্তু কবে যে কে মরিবে তা কেউ বলিতে পারে না, যদি পারিত, তবে সকলেই সাধ্যমত (এবং অনেক সময়েই সাধ্যাতিরিক্ত ভাবে) এক আধটা জীবন-বীমা করিয়া ফেলিত। বীমার দালাল যখন কাউকে বলে—একটা পলিসি কিনুন—তখন সে এই অতি পুরাতন কথাটাই ঘুবাইয়া বলে মাত্র—যে আপনি অমর নন। কিন্তু অত বড় একটানা সত্যে মানুষের মন সাড়া দেয় না।' সত্যটাকে আর একটু সঙ্কীর্ণ করিয়া বলিতে পারিলে মানুষের কাছে নিশ্চয় সাড়া পাওয়া যাইবে।

বীমার দালালেরা একটা উপায় অবলম্বন করিতে পারে। প্রত্যেকে একজন সন্ন্যাসী ভাড়া করিবে। সেই সন্ন্যাসী দুচার দিন আগে সম্ভাবিত পলিসিক্রেতার কাছে গিয়া কৌশলে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিবে যে ছয় মাসের মধ্যে কিম্বা আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পরে তাহার মৃত্যুযোগ আছে। এই ঘটনার দু'চার দিন পরে বীমার দালাল তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইবে—বলা বাহুল্য আশাতীত ফল ফলিবে, কারণ লোকটা নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত ভাবে পলিসি কিনিয়া বসিবে।

আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তা-ই বলিয়া অযাচিত-

ভাবে কোন সন্ন্যাসী মৃত্যুযোগের কথা বলিলে যে মোটা একটা পলিসি কিনিব না এমন কথাও বলিতে পারি না। সকলের পক্ষেই এই কথা খাটে।

এখন বিবেচনা করুন—এই উপায় অবলম্বন করিলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। লোকটার ভবিষ্যতের একটা উপায় হইল; দালালের একটা কেস জুটিল; কোম্পানীর একটা কেস বাড়িল—ক্ষতিও হইল না—কারণ লোকটা নিশ্চয় এত শীঘ্র মরিবে না—আর সন্ন্যাসীরও বেকারদশা কিছু পরিমাণে ঘুচিবে, কারণ প্রত্যেক কেসের উপরে সে overriding fee পাইবে। ইহাতে মস্ত আর একটা সমস্যার সমাধান হইবে। সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থার ফলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, তারও একটা প্রতিকার ঘটিবে। ভাবিয়া দেখুন, এই এক উপায়ে কতকগুলি সমস্যার সমাধান—এক ঢিলে প্রবাদে দুটি মাত্র পাখী মরে—আর ইহাতে এক ঝাঁক পাখী মরিবে।

আর একটা উপায়ের কথা বলি। শোনা যায় কোন কোন লোক অপরের পকেট কাটিয়া জীবন-যাপন করে। (এই জাতীয় লোকের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই—প্রায় কাহারও থাকে না; কারণ বাড়ী আসিয়া যখন দেখা যায় পকেটকাটা গিয়াছে, তাহাকে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলে)। বলা বাহুল্য এই পকেট-কাটার দল সুযোগ পাইলে রাজনীতিক হইত, কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই, কারণ রাজনীতিক হইলে পকেট না কাটিয়া মানুষের গলা কাটিত।

এখন পকেট-কাটার দল একটা সঙ্ঘ গড়িয়া দর্জ্জিদের সঙ্গে কোয়ালিশন করিতে পারে। দর্জ্জিরা ভদ্রলোকদের বিশেষ বড়লোকদের (দুটা এক নয়) জামার পকেট জুড়িয়া দিবার সময়ে পকেটে এক আধটা ছিদ্র রাখিয়া দিবে। ফলে পকেটে টাকা-পয়সা রাখিলে লোকের অজ্ঞাতসারে তাহা মাটিতে পড়িয়া যাইবে। তখন আর পকেট কাটিতে হইবে না—পকেটধারীর পিছনে পিছনে ঘুরিলেই চলিবে—কেবল পথ হইতে কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা। আর ধরা পড়িলেও ইহাতে দণ্ডের ভয় নাই—কারণ পথ হইতে টাকা কুড়োনোই তো বর্ত্তমান সভ্যতা! ইহার জন্য দণ্ড দিতে হইলে ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবে।

দেখুন আবার কত সুবিধা—এক ঢিলে কত পাখী মারিল। দর্জ্জির লাভ, কারণ তাহারা সংগৃহীত অর্থের উপরে কমিশন পাইবে। ব্যবসায়িক সাধুতা বলিয়া যে নূতন নীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে পকেট-কাটার দল দর্জ্জিদের বঞ্চনা করিবে না নিশ্চয়। পকেট-কাটার দল অনেক কম পরিশ্রমে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে, ধরা পড়িলেও দণ্ডের ভয় নেই; আর ঘৃণ্য বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদীদের পুঁজির কিয়দংশ পকেটের ছিদ্রপথে সর্ব্বহারাদের হাতে পড়িয়া ধনসাম্যের সত্যযুগের সূচনা করিবে।

আমার মনে হয় বেসরকারী একটা 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' কমিটি করিয়া এইসব উপায়কে কার্য্যকরী করিয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত। যখন খবর পাইব যে এই জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে, তখন আর দুইচারিটা প্ল্যান পাঠাইব। ইতিমধ্যে পাঠকদের এ সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট

গুজবটা ক্রমে ব্রহ্মার কানে পৌঁছিল; কোনমতেই আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে গিয়া তাহাকে বলিলেন—ওহে বাপু একি শুনিতেছি।

চিত্রগুপ্ত হিসাবের খাতাটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—আজ্ঞে ওটা গুজব।

ব্রহ্মা বলিলেন—গুজবটা অত্যন্ত প্রবল; একবার খোঁজ লইলে দোষ কি?

চিত্রগুপ্ত দু'একবার ঢোক গিলিয়া বলিল—দোষ আবার কি? তবে কি না বাজে বৃথা পরিশ্রম। আর পিতামহ, এও কি সম্ভব যে পৃথিবীতে মানুষ নাই।

অসম্ভবটা কি?—একখানা চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে ব্রহ্মা বলিলেন।

আজ্ঞে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি পৃথিবীতে মানুষের অভাব হয় নাই। তার পরে একটু কাশিয়া লইয়া চিত্রগুপ্ত বলিল—জানেন তো প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা আমার অভ্যাস নাই।

—প্রমাণটা কি শুনিতে পাই কি?—ব্রহ্মা দাবী করিলেন।

প্রমাণ যত সহজ, তত প্রচুর। মানুষ থাকিবার সময়ে যেমন রিপোর্ট পাইতাম, আজও তেমনি পাইতেছি; মানুষ না থাকিলে এমনটি ঘটিত না। চিত্রগুপ্ত বলিল।

—কি রকম রিপোর্ট আসিতেছে, দু'চারটা বল দেখি—।

চিত্রগুপ্ত দপ্তর ঘাঁটিয়া রিপোর্ট শুনাইতে লাগিল।

—এই দেখুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক তস্করবৃত্তি; কত বলিব! পৃথিবীতে মানুষ না থাকিলে এসব কি হইতে পারিত! পশুরা তো এখনও অত উন্নত হয় নাই!

ব্রহ্মার মুখ অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—এই দেখুন কালই এক রিপোর্ট আসিয়াছে। কলিকাতা সহরের বিল্বংটন চত্বরে দেশোদ্ধারকারীদের এক সভা হয়! তাহারা সকলেই অহিংসাব্রতী, কাজেই তর্কটা যখন যুদ্ধে পরিণত হইল, তখন সকলে অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া সোডার বোতল, কাপড়ের পাদুকা (আমার নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন চামড়ার পাদুকা নাকি হিংসার পরিচায়ক), কাঁসার গেলাশ, ইটের টুকরা প্রভৃতির দ্বারা কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন অহিংসদের হাতে এসব জিনিষ অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ফল-প্রসূ হইয়াছে। মানুষ না থাকিলে এমনটি কখনোই সম্ভবপর হইত না—কারণ পশুরা এখনো এমন বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়া মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া, হিংসাকে এড়াইতে যাইতে শেখে নাই।

ব্রহ্মা বলিলেন—তোমার রিপোর্ট শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তবু তুমি এক কাজ কর। একবার স্বয়ং পৃথিবীতে গিয়া অনুসন্ধান কর—মানুষ আছে কি নাই। দেবতারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে—আমি প্রহরে প্রহরে বুলেটিন বাহির করিয়াও তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছি না।

অগত্যা চিত্রগুপ্ত ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রওনা হইল।

ব্যাপারখানা এই। ব্রহ্মার কানে কিছুদিন হইতে দেবতারা আসিয়া ক্রমাগত বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পিতামহ, পৃথিবীতে মানুষ আর নাই; কারণ কেহই আর নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় না। যতদিন সম্ভব

ব্রহ্মা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে আর যখন পারিলেন না—তখনই তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

আজ কয়েকদিন হইল চিত্রগুপ্ত কাগজ কলম লইয়া কলিকাতার পথে পথে ঘুরিতেছে। যাহাকে দেখে তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ করে—ফলে তাহার মুখ ক্রমেই শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইতেছে। তবে কি গুজবটাই সত্য! ব্রহ্মাকে গিয়া সে কি বলিবে! ভাবে ব্যাপার কি? যদিও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি মানুষেব মতই—কিন্তু পবিচয় দিবার সময়ে কেহ তো নিজেকে মানুষ বলিয়া উল্লেখ করে না।

—এ কেমন হইল?

কিন্তু চিত্রগুপ্ত অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়—পৃথিবীতে মানুষ আছে—ইহা সে প্রমাণ করিবেই। আবাব দ্বিগুণ উৎসাহে সে আদমশুমারী আরম্ভ করে—

মহাশয়, আপনি কি?

—আমি বামপন্থী।

—আপনি কি?

—আমি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি?

—সেণ্টাব বা মধ্যপন্থী।

—আপনি?

—বাম-বামপন্থী।

—আপনি?

—অতি বামপন্থী।

—আপনি?

—নাতি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি?

—প্রলিটাবিয়েট।

—আপনি?

—বুর্জোয়া।

—আপনি? আপনি? আপনি?

কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ভেডারেশনিষ্ট, রিপাব্লিকান, কৃষক, শ্রমিক, লালঝাণ্ডা !

আপনি ? আপনি ? আপনারা ?

সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যতন্ত্রী, বাণিজ্যতন্ত্রী।

চিত্রগুপ্ত হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার আদমশুমারিতে লাগিয়া গেল।

—আপনি ?

—জর্ণালিষ্ট।

—আপনি ?

—রিপোর্টার।

—আপনি ?

—ফুট-বলার।

—আপনি ?

—স্থইমার।

—আপনি ?

—বেকার।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—নাতি বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—মেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—সেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—পুঁজি-বাদী।

—আপনি ?

—শ্রমিকবন্ধু।

—আপনি ?

—কৃষকবন্ধু।

—আপনি ?

—ফিল্মষ্টার

এক জায়গায় একদল সুবেশ যুবক বসিয়া পুস্তকের ক্যাটালগ পড়িতে ছিল। চিত্রগুপ্ত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা অভিজাত সাহিত্যিক।

আর এক জায়গায় একদল সুবেশ তরুণ বসিয়া নিজেদের বই যথেষ্ট কেন বিক্রয় হয় না সে-সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল। চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা লিটারারি সোশ্যালিষ্ট।

চিত্রগুপ্ত বলিল—মশায়, এখানে কোথায় মানুষ আছে বলিতে পারেন ?

তাহারা বলিল—মানুষ ছিল উনবিংশ শতকে। এখন মানুষ কোথায় ?

আর একজন বলিল—বঙ্কিমচন্দ্র ছিল শেষ মানুষ।

চিত্রগুপ্ত চলিয়া যাইতেছিল—একজন বলিয়া উঠিল, একখানা বই কিনিবেন ? কমিশন বাদ পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত পথে বাহির হইয়া দেখিল, একদল লোক ছুটিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা ছুটিতেছ কেন ?

তাহারা বলিল—'ছুটন'-ই আমাদের 'ক্রীড্' আমরা যে প্রগতি পন্থী।

কিন্তু পাশ হইতে একজন চিত্রগুপ্তকে বলিল—মহাশয়, শুধু, 'ক্রীডে' মানুষকে এত ছুটাইতে পারে না—চাহিয়া দেখুন পিছনে একটা পাগলা কুকুরও আছে !

—মহাশয় আপনি ?

সেই লোকটি বলিল—আমি অধোগতি-পন্থী।

একজন বৃদ্ধও যাইতেছিল—চিত্রগুপ্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল ইহারা কি ?

লোকটা কহিল ইহারা তরুণ-তরুণী। চিত্রগুপ্ত বসিয়া পড়িল মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা ছাড়িয়া দিল।

কোন্ দিকে যাওয়া যায় যখন সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে একখানা যাত্রী-বোঝাই মটরবাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আর পাঞ্জাবী কন্ডাকটার আইয়ে বাবু আইয়ে চিড়িয়াখানা, ছে পয়সা বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে ছ'পয়সা গুণিয়া দিয়া চিড়িয়াখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চার পয়সা দক্ষিণা দিয়া চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়া সে জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া আফিসের মাঠে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে দাখিল করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল—আমরা তাহার নকল দিলাম।

……"আমি পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের খোঁজ করিলাম—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে কেহই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিল না—কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ এইজন্য বলিলাম. যে কলিকাতা সহরে চিড়িয়াখানা নামে এক তাজ্জব ব্যাপার আছে, চারপয়সা দিলেই সেখানে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ঢুকিয়াও মানুষ দেখিতে পাইলাম না—কেবল জন্তু জানোয়ার। তবে একটি খাঁচাতে মানুষের মত একটা জানোয়ার আছে দেখিলাম। খাঁচার গায়ে লেখা রহিয়াছে, 'বন-মানুষ'। বোধ করি কেবল 'মানুষ' নামে পরিচিত হইতে সে লজ্জিত, তাই 'বন' শব্দটা মানুষের আগে জুড়িয়া দিয়াছে অন্য কেহ আপত্তি না করাতে আমি উহাকে মানুষ বলিয়া সনাক্ত করিলাম—কাজেই নিবেদন এই যে পৃথিবী মানুষহীন হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে অচির কালের মধ্যে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এমন আশা করা যায়। নিবেদনমিতি…"

রিপোর্ট লিখিয়া সে সাঙ্গুভ্যালিতে চা পান করিবার জন্য ঢুকিল, বাহির হইবার সময়ে কে বা কাহারা তাহার পকেট মারিয়াছিল নিশ্চয়; কারণ, আমি সন্ধ্যাবেলা এই রিপোর্টখানা বিল্বংটন চত্বরের কাছে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে মনুষ্যজাতিকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কাগজে প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

আর্ট ফর আর্ট সেক্

কলিকাতার বুকের উপরে যে এমন একটা ঘটনা ঘটিবে ভাবিতে পারি নাই। সবে বসন্ত দেখা দিয়াছে; (যে বসন্তের সংবাদ করপোরেশন প্রাচীরের গায়ে প্রচার করিয়া থাকে সে বসন্ত নয়, একেবারে কালিদাসের বসন্ত, আদি ও অকৃত্রিম।) মন-ভোলানো দক্ষিণা বাতাস দিতেছে, ফলে অন্যমনস্ক পথিকের পকেটকাটা যাইতেছে। বোধ হয় দু'একটা কোকিলও ডাকিতেছিল, তবে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না, আর এক ফালি চাঁদ আশুতোষ বিল্ডিংএর উপর হইতে সন্ধ্যা-তারাটার দিকে চাহিয়া চোখ মারিতে চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় কলেজ স্কোয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কি শুনিলাম! সে কি গীত! বহুকালবিস্মৃত সেই গীত যেন কানে ভাসিয়া আসিল। (পাঠক—এই উপলক্ষে আমার যা বক্তব্য তাহা বহুদিন আগে বঙ্কিমবাবু কমলাকান্তর দপ্তরে 'একা' নামে নিবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, বাহুল্য বোধে আর দিলাম না; সময় মত পড়িয়া লইবেন, বঙ্কিমবাবুর নিবন্ধে যা নাই, তাহা লিখিতেছি।)

বাউলের গান কানে আসিল—এমন বাউলের গান বহুদিন শুনি নাই, একসময়ে কিছুকাল বিখ্যাত এক গবেষকের তল্পি বহিয়া বাউলের গান সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম তখন শুনিয়াছি, তার পরে আর শুনি নাই। বিশেষ কলিকাতার মত মহানগরে বাউলের গান কোন দিন শুনিব স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম—মোড় ঘুরিতেই দেখি এক জায়গায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে—আমিও ভিড়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিলাম। গায়ককে দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু সুর শুনিয়া বুঝিলাম বাউল বটে। সুরের স্রোতে দু'এক টুকরা গানের পদ ভাসিয়া আসিতেছিল—

'দেহের ভিতর কি কারখানা
কেমন করি যায় রে জানা'

প্রায় পাঁচ শো লোক ভিড় করিয়াছে—ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না—তবে গান বেশ শুনা যাইতেছে—কারণ সকলেই গানে মুগ্ধ, কাজেই নীরব। আবার—

'ও সাঁই ঝুলির ভিতর আছে আমার সাঁই!' চমকিয়া উঠিলাম! বাউল যে তাহা নিঃসন্দেহ। বাউলের আদিম নিবাস বীরভূমের দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল—শালবন! পাহাড়ী নদী! নেড়া মাঠ! রাঙা পথ! সম্মুখে আমার গুরু গবেষক—পশ্চাতে ঝোলা ঘাড়ে আমি। আবার শুনিলাম—

'দরদ দিয়ে লওনা কিনে
কে দেয় বল পয়সা বিনে
বত্রিশ ভাজা চানাচুর
কর আমার মোহ দূর,
লালন বলে এমনি করে ঘুরবো কত আর।'

বুঝিলাম এ চানাচুর ডালের নয়, মানুষের অহঙ্কার; বাস্তবিক বাউলেরা ছাড়া আর কে এমন ঘরোয়া উপমা ব্যবহার করিতে পারে। ঠিক করিলাম বাউলের উপমা সম্বন্ধে একটা থিসিস (প্রবন্ধ দীর্ঘ, কোটেশন-বহুল ও নীরস হইলেই থিসিস হয়; অন্য কোন ভেদ নাই) লিখিব; হয়তো ডক্টরেট জুটিয়া যাইতে পারে।

গান থামিল—মুগ্ধ শ্রোতারা নীরবে প্রস্থান করিল, এতক্ষণ পরে আমি গায়কের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গান শুনিয়া যে বিশ্বাস হইয়াছিল—পোষাক ও চেহারা দেখিয়া তাহা দৃঢ়মূল হইল।

গেরুয়া আলখাল্লা, বিচিত্র বর্ণের তালি দেওয়া, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, হাতে একতারা, পায়ে ঘুঙুর, কাঁধে ঝুলি—মুখে অত্যন্ত উদাসীন ভাব।

মনে পড়িল বাউলের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, পয়সার দরকার হয়—পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া তার ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। সে অমনি ঝুলি হইতে সাদা কাগজে মোড়া সরু একটি ঠোঙার মত তুলিয়া আমার হাতে দিল—

জিজ্ঞাসা করিলাম—এতে কি?

সে বলিল—আজ্ঞে চানাচুর।

বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম—তুমি বাউল নও?

বিস্মিততর হইয়া সে বলিল—আজ্ঞে না, আমি চানাচুর ওয়ালা।

আমি—তবে এ পোষাক আর এরকম গান কেন?

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওখানেইত ভুল হয়েছে।

—কি ভুল?

সে বলিতে লাগিল—আজ্ঞে অনেকদিন থেকে চানাচুর বেচছি—দু'পয়সা হয়। একটু লেখাপড়া শিখেছিলাম—

তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া চাপা গলায় বলিল—কাউকে বলবেন না—ছোটবেলায় কবিতাও লিখেছি।

আবার স্বাভাবিক ভাবে বলিতে লাগিল—ভাল ক'রে বিক্রি করবার জন্যে একটা গান বেঁধে নিতে একজন নাম-করা কবিকে ধরে পড়লাম। গান সে দিল বেঁধে। গান ভালই বেঁধেছে।

—বুঝলে কি করে?

—ক'দিন গেয়ে বুঝছি। গান শুনে বেশ ভিড় জমে যায়—লোকে চুপ করে শোনে—আর অনেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কেউ কেউ কাঁদেও, কিন্তু গান শেষ হলেই সবাই সরে পড়ে—আমি যে চানাচুরওয়ালা এটা তারা ধরতেই পারে না। ভাবে আমি সংসার ছাড়া কোনো বৈরাগী।

আমি বলিলাম—কিন্তু তোমার গানটি বেশ মন-উদাস করা।

সে বলিল—ওতেই তো মরেছি। মন উদাস হ'লে কি আর চানাচুর কেনার কথা মনে থাকে। কাল থেকে শালা সেই পুরানো গানটি আবার ধরবো।

আমি বলিলাম—আচ্ছা আসি।

সে বলিল—বাবু আর এক পয়সার দি—

টিউশন

ইন্দ্র আজ ভারি খুসি, স্বর্গে অনেকদিন পরে একজন বাঙালী আসিতেছে। দেবরাজের নির্দ্দেশমত গৃহে গৃহে রঙিন নিশান, দরজায় দেবদারু পাতা ও লাল শালুর তোরণ, জানালায় গাঁদা ফুলের মালা, স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য স্বর্গের দেউড়ি পর্য্যন্ত যাইবেন।— তাঁহার রথ প্রস্তুত। একদল দেব-শিশু শোভাযাত্রা করিয়া দেউড়ির দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠের মিশ্র চীৎকার মুহুর্ম্মুহু শোনা যাইতেছে। তবে কি বলিতেছে বোঝা যায় না, তাহারাও বুঝিতে পারিতেছে না। বড় বড় দেবতাদের রথ ছুটিয়াছে, যাঁহাদের রথ নাই, তাঁহারা আজ ভাড়াটে রথে চলিয়াছেন, এমন কি স্বর্গের মহিলাগণ, যাঁহারা দেবী নামে খ্যাত, তাঁহারাও আজ গুণ্ঠন গুটাইয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়াছেন। নন্দন লোক আজ সত্যই নন্দিত।

সকলে স্বর্গের দেউড়ির নিকটে অপেক্ষা করিতেছে—স্বয়ং ইন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কে তাঁহার গলায় মালা দিবে, কে শঙ্খধ্বনি করিবে, কে চন্দনতিলক কাটিয়া দিবে, কে মানপত্র পড়িবে, সমস্ত ঠিক। মাঝে মাঝে রব উঠিতেছে 'ওই আসিলেন, ওই'; আবার সব নীরব; কেবল কাবুলিমটর ও চীনে বাদাম বিক্রেতাদের আর্টিষ্টিক কণ্ঠধ্বনি!

অবশেষে সত্যই বহুপ্রতীক্ষিত বাঙালী আসিয়া পড়িলেন—মুহূর্ত্তে তুরী, ভেরী, কাড়া, নাকাড়া, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তিনি গরুর গাড়ী হইতে নামিলেন, হাতে টিনের একটি স্যুটকেস্ দেবতারা দিব্যদৃষ্টির বলে টিন ভেদ করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একখানি আয়না, একটি চিরুণী; একটা জুতার বুরুষ; দাঁতের মাজন ও ব্রাস; এবং সাবান ও দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম।

ইন্দ্র অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন—বলিলেন, আজ অনেক দিন পরে একজন বাঙালীর স্বর্গে আগমনে আমরা ধন্য হইলাম। স্বর্গে শেষ বাঙালী আসিয়াছিলেন—বিদ্যাসাগর। তারপর হইতে কেবল মাড়োয়ারি, ভাটিয়া প্রভৃতি শেঠজিরা আসিতেছে! টাকাই এখন স্বর্গপ্রাপ্তির

মাপকাঠি, কাজেই বাঙালীর বড় আশা নাই। এখন যাহারা স্বর্গে আসিতেছে তাহাদের জ্বালায় আমাদের স্বর্গ ছাড়িতে ইচ্ছা করে। তাহারা দন্তধাবনের জন্য ডাল ভাঙিয়া ভাঙিয়া নন্দনবন প্রায় সাবাড় করিয়া দিল; ঘি ও কাপড়ের বিজ্ঞাপন মারিয়া স্বর্গের বাড়ীঘরের উপর এক ইঞ্চি পুরু কাগজের প্রলেপ ফেলিয়া দিয়াছে, তা ছাড়া দু'দণ্ড যে একটু সদালাপ করিব তাহার উপায় নাই, কেবল তেজিমন্দা, লাভ লোকসানের আলোচনা; একটু রসিকতা করিতে গেলেই শেয়ার গছাইয়া দিবার চেষ্টা করে। আপনি আসাতে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যাইবে; দুটা সরস কথা বলিতে পারিব; বাঙালী কথা বলিতে পারে বটে।...কিন্তু তার আগে বলুন—আপনি কি চান! স্বর্গের ঐশ্বর্য্য অমূল্য, যা খুসী লইতে পারেন; খুব সম্ভব সংস্কৃতগ্রন্থাদিতে স্বর্গের ধনরত্নের কথা পড়িয়া থাকিবেন—বলুন দেববাঞ্ছিত এই ঐশ্বর্য্যসম্ভারের মধ্যে কিসে আপনার আকাঙ্ক্ষা! উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত বাহন আছে; পারিজাত মন্দার ফুল আছে, কৌস্তভ মণি আছে, অমৃত পানীয় আছে; কুবেরের ভাণ্ডার আছে; উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা আছে—বলুন কিসে আপনার বাসনা; কি আপনি চান?

বাঙালী বাঁহাত দিয়া মাথার টেরিটা ঠিক করিয়া লইয়া বলিল—প্রভু, আর কিছু নয়—কেবল একটী প্রাইভেট্ টিউশানি।

কাঁচি

আবার জেলে যাইতে হইল—এবারে কিন্তু আমার দোষ নাই—কেন যে নাই সে কথাই আজ বলিব।

এক সময়ে চুরি করিতাম—এখন জর্ণালিজ্‌ম করি; আমরা নিজেদের বলি সাংবাদিক, লোকে কি বলে না বলাই ভাল:

পকেট কাটিতাম, হাত ছিল কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িতে লাগিলাম, এবং বারংবার জেলে যাইতে লাগিলাম। একবার (বোধ হয় পঞ্চম বার)

জেল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, জেল-গেটে এক ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

আমাকে আবার কোথায় সে দেখিবে! মনে মনে বলিলাম কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে; মুখে বলিলাম—এইখানেই দেখেছেন। লোকটা বলিল—মনে পড়েছে, এখানেই বটে—এবার নিয়ে ক'বার?

আমি বলিলাম—পঞ্চম বার!

সে বলিল হাত কাঁচা তো চুরি করতে যান কেন?

—আর যে কিছু করতে পারি না। সে শিষ দিতে দিতে বলিল—ওটা আপনার ভুল! আছে আছে, আপনার যোগ্য কাজও আছে! আচ্ছা লেখাপড়া কতদুর করেছেন? ভাবিলাম, হায় যদি বা একটু সম্ভাবনা ছিল তাও বুঝি ফস্‌কাইয়া যায়! সত্য কথাই বলিলাম (এখনও হাত কাঁচা কিনা!) বিশেষ কিছু নয়!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল—তা'হলে ঠিক হবে, চলুন আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কৃতজ্ঞচিত্তে লোকটির সঙ্গে চলিলাম। বাসায় পেঁীছিয়া সে টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া আমাকে আসিয়া বলিল—ঠিক হ'য়ে গেল। আপনি 'ধুরন্ধর' সংবাদ-পত্রের ষ্টাফে জর্ণালিষ্ট নিযুক্ত হলেন, সম্পাদকের সঙ্গে এই মাত্র কথা বল্‌লাম।

জর্ণালিষ্ট? কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না!

সেই তো সব চেয়ে ভাল। শাদা কাগজে লেখা খোলে ভাল; আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। এই বলিয়া সে ধুরন্ধর কাগজের ঠিকানা দিল।

দুপুর বেলা ধুরন্ধর আফিসে গিয়া সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিলাম। হাঁ সম্পাদক বটে! যেন মিশরের একটি পিরামিড! তিনি পরিচয় শুনিয়া বলিলেন—সন্ধ্যাবেলা এস! ওঃ সে কি ধ্বনি—ঘর গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল!

সন্ধ্যাবেলা গেলাম। পিরামিড একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—বসো: তারপর ডেস্ক খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন—একখানা কাঁচি! বলিলেন—রাত্রি বেলা তোমার কাজ!

শিহরিয়া উঠিলাম! ভাবিলাম সময় রাত্রি, অস্ত্র কাঁচি, পাড়াটারও দুর্নাম আছে, আমিও দাগী. এ কোথায় আসিলাম!

পিরামিড বলিলেন—কাঁচি দিলে কেটে যাবে! সর্বনাশ! ভয়ে ভয়ে শুধাইলাম—কি? পকেট নয় গো, পকেট নয়—পিরামিড হাসিয়া উঠিল। ওঃ সে কি হাসি! যেন ভূমিকম্পে থানকতক পাথর গড়াইয়া পড়িল। হাসি থামিলে বলিলেন—কাগজ! কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেবে! এরই নাম জর্ণালিজম্ এতে লেখা-পড়ার কি দরকার? আমরা হচ্ছি সরস্বতীর দর্জ্জি!

দর্জ্জিগিরি আজ কয়মাস করিতেছি। দিনে ঘুমাই, রাতে জাগি, দেশী বিলিতি কাগজ কাটিয়া অনুবাদ করিয়া জর্ণালিজম্ করি। সত্য মিথ্যা ছোট বড় ভাল মন্দর ভেদ ঘুচিয়া গিয়া পৃথিবী বেশ সমতল হইয়া আসিয়াছে।

একদিন রাত্রে কাজ আগেই শেষ হইল—ভাবিলাম বাসায় গিয়া ঘুমাই—বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ নির্জ্জন—মোড় ঘুরিতেই একটা হৈ হৈ শব্দ শুনিলাম, দেখিলাম কয়েকজন লোক ছুটিতেছে, কিছু না বুঝিয়া আমিও তাহাদের পিছু পিছু ছুটিলাম, জর্ণালিজম্ আরম্ভ করিবার পর হইতে জন-মতকে অনুসরণ করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! সম্মুখে জন তিনেক পুলিশ আসিয়া বাধা দিল, সবাই থামিল, আমিও থামিলাম! পকেট-কাটা গিয়াছে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল—কৌন হ্যায়? ছিন্ন-পকেট ব্যক্তি বলিল—তা তো জানিনে জমাদার সাহেব! জমাদার সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এহি হ্যায়; রাষ্ট্রভাষায় দক্ষতা ছিল না—বলিলাম—নেহি হ্যায়। সে আমার পকেটে হাত চালাইয়া দিয়া টানিয়া বাহির করিল—একখানা কাঁচি। সেই কাঁচি! সকলে হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—হাম জর্ণালিষ্ট হ্যায়! জমাদার সাহেব বলিল—শালা চোট্টা হ্যায়! পরিস্থিতি ভয়ানকভাবে আমার বিরোধী—সময় রাত্রি, পাড়া দুর্ণামগ্রস্ত, পকেটে কাঁচি, আমিও দাগী!

সে রাত্রি হাজতে থাকিলাম। যথা সময়ে বিচার আরম্ভ হইল—প্রমাণগুলো সব আমার প্রতিকূল! সত্যনির্ণয় কে আর করে? আবার জেলে যাইতে হইল!

পিরামিড একদিন বলিয়াছিলেন—সংবাদপত্রে যাহা বাহির হয় তাহাই সত্য। সে কথা আমার ভাগ্যে ফলিয়া গেল; আমার জেলে যাইবার সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইল; লোকে বিশ্বাস করিল। সংবাদপত্রের উপর এমন অচলা আস্থা যে এক এক সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয় সত্যই আমি দোষী না নির্দ্দোষ!

অটোগ্রাফ

স্বর্গে আজ বড় ধুম—ভারি ব্যস্ততা; সকলেই যুগপৎ উৎকণ্ঠ ও উগ্রকণ্ঠ! কিন্তু কেউ স্পষ্টভাবে জানে না কেন এ ব্যগ্রভাব; জিজ্ঞাসা করিলে উচ্চদরের একটা হাসি হাসিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে বোকা বানাইয়া দেয়।

দৈনিক কাগজগুলা আজ একমাস হইল স্বর্গীয়দিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে; আয়োজন চাই, আড়ম্বর চাই; কোনখানে কিছু ত্রুটী হইলে স্বর্গের দুর্ণাম—অতএব সকলে অবহিত হও। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তারাও জানে না কেন এ ব্যস্ততা!

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের চতুঃশক্তির বৈঠক বসিয়া গিয়াছে; প্রত্যেকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, তার সেক্রেটারী তস্য সেক্রেটারী উপ সেক্রেটারিদের, ভিড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি চারজন উহ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—ইনি মহামানব।

বিষ্ণু বলিলেন—যুগাবতার।

মহেশ্বর বলিলেন—কল্কি অবতার।

ইন্দ্র বলিলেন—বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার সময়টা গুরুগৃহে অন্যকাজে ব্যয় করায় কিছুই বলিতে পারিলেন না! এমন গম্ভীর হইয়া রহিলেন যেন ওঁদের কারো কথাই ঠিক নয়।

এমন সময়ে স্বর্গের সিংহদ্বারে তুরী-ভেরী, কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল বাঁশী, কাঁসি, খোল, করতাল মায় জগঝম্প বাজিয়া উঠিল। যার জন্য সভা তিনিই আসিয়া পড়িয়াছেন, কাজেই সভার আর প্রয়োজন নাই—চতুঃ-

শক্তি সেক্রেটারি, উপসেক্রেটারি শ্রেণীর সুদীর্ঘ লাঙ্গুল বহন করিয়া সিংহ-দ্বারের দিকে যাত্রা করিলেন!

সিংহদ্বারে বিষম ভিড়। সকলে জিরাফ-কণ্ঠ হইয়া উঁকি মারিতেছে; সকলেই পার্শ্ববর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কে, কেন, কোথায়, কি?

এমন সময় সকলে দেখিল—যথার্থই তিনি আসিয়াছেন। ক্ষীণ দেহ কবিদের ভাষায় তনুলতা (লতা যদি কেবল সচল হইত) পায়ে খুর-অলা জুতো (স্বভাবের অভাব কৃত্রিম উপায়ে মেটানো হইয়াছে)! গায়ে স্বচ্ছ বস্ত্র (ক্যালিকো মিলের তৈরী)। চুল বব্‌ড করিয়া ছাঁটা (একসঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চুলের ভার বহন করিতে ঐটুকু মস্তক সক্ষম নয়)! মুখে ইন্দ্রজিৎ হাসি ও চোখে সূর্য্য-চন্দ্রজিৎ চশমা! হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ! (এমন যে মহিলা তার কি ভ্যানিটি থাকিতে পারে, ওটা বোধ করি মিথ্যা বলিয়াই ঠাট্টা করিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ বলা হয়।) পিছনে একটি রোঁয়ায় ভর্ত্তি কুকুর। (কুকুর ছাড়া কেউ কি স্বর্গে যাইতে পারে—যুধিষ্ঠিরের কথা ভাবিয়া দেখুন।)

তিনি বলিলেন—দেবগণ! আমি বাঙ্গালিনী।

ব্রহ্মা বলিলেন—আর পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। পুরাণে আপনার কথা আছে।

বিষ্ণু বলিলেন—আমরা কৃতার্থ।

মহেশ্বর বলিলেন—অবশ্যই।

ইন্দ্র বলিলেন—কিছুই বলিলেন না। তাঁর গুরুগৃহের কথা মনে পড়িয়া গেল।

ব্রহ্মা বলিলেন—বাঙালিনী, আপনার আগমনে চরিতার্থ, দেবগণ কৃতার্থ, নন্দনবন আজ নন্দিত যথার্থ—(বক্তৃতার বাকি অংশ ভুলিয়া যাওয়ার রিপোর্ট করা গেল না।)

বিষ্ণু বলিলেন—স্বাগতম্।

মহেশ্বর বলিলেন—অবশ্যই।

ইন্দ্র বলিলেন—(এবারে তিনি সত্যই বলিলেন) বলুন বাঙ্গালিনী আপনার কি চাই। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, অমরত্ব, দেবত্ব, সব আপনার পদতলে।

বাঙালিনী কোন উত্তর না দিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একখানি ছোট খাতা আর একটি ফাউন্টেন পেন খুলিয়া ইন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—আর কিছু চাই না—কেবল একটি অটোগ্রাফ!

ইন্দ্র স্বাক্ষর করিলেন।

বিষ্ণু স্বাক্ষর করিলেন!

ব্রহ্মা স্বাক্ষর করিলেন।

মহেশ্বর স্বাক্ষর করিলেন।

সেই হইতে স্বর্গের তেত্রিশ কোটি অধিবাসী অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে মাতিয়া উঠিল—স্বর্গে ও ছাড়া আর কোন কাজ নাই, চিন্তা নাই!

ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর চতুঃশক্তি এখন কেবল অটোগ্রাফ স্বাক্ষর করিতেছেন—অন্যদিকে মন দিবার তাঁদের সময় নাই।

এদিকে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, প্রলয়, প্লাবন, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও গদ্য কবিতা রচনা চলিতেছে।

তার কারণ চতুঃশক্তির সমস্ত শক্তি অটোগ্রাফ বিতরণে নিঃশেষে নিযুক্ত।

সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী

অবশেষে সিন্ধবাদ তাহার অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী আরম্ভ করিল? সে বলিতে লাগিল যে আমি ও আমার ভাই হিন্দবাদ দুইখানি জাহাজ সাজাইয়া যাত্রা করিলাম। বসোরা নগর ত্যাগ করিয়া আমরা পারস্যো-পসাগরে পড়িলাম, এবং ক্রমে আরব সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আরব সাগর দিয়া ক্রমাগত কয়েকদিন দক্ষিণ দিকে চলিবার পরে একটি নারিকেল কুঞ্জের মত সিংহল দ্বীপ চোখে পড়িল। সিংহল অতিক্রম করিয়া ভারতমহাসাগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোত্তরে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস চলিবার পরে হিন্দুস্থানের উপকূল দৃষ্ট হইল। আমি সর্ব্বদা নাবিকের কাছে বসিয়া থাকিতাম এবং কোন নূতন দেশ দেখা গেলেই তাহার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ ভাবে জানিলাম যে পশ্চিমে উৎকল, কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশ, আর পূর্ব্বে নাপ্পিভোজী ব্রহ্মদেশ—আর যে দেশে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে, তাহা এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী বঙ্গদেশ। এইরূপ অদ্ভুত নাম কখনও শুনি নাই; নাবিক বলিল—সে দেশের লোকেরা আরও অদ্ভুত! সে আরও বলিল যে ঐ দেশে গেলে লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য জানে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা কি করে? সে বলিল তাহারা পল্লীচর্চ্চা প্রত্নচর্চ্চা করিয়া জীবন ধারণ করে। আমি এইদেশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কয়েক দিন পরে আমাদের জাহাজ দুইখানি একটি সুবৃহৎ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দেশের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তীরে নামিয়া বুঝিলাম সত্যই এমন দেশে কখনো ইহার পূর্ব্বে আসি নাই।

আমরা সকলে অবাক হইয়া গেলাম, ইহারা কি মানুষ না অন্য কোন জাতীয় জীব! হিন্দবাদ ও আমি শহরে প্রবেশ করিলাম। এ দেশের অধিবাসীদের দেখিতে মানুষের মতই; হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ মস্তক সবই আছে; মস্তিষ্ক আছে কিনা তাহা সব সময়ে মস্তক দেখিয়া বুঝা যায় না বলিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাদের গাত্র আগা-গোড়া ভেড়ার চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত; কাজেই একটি ভেড়া দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিলে যেমন দেখিতে হয় ইহারাও অনেকটা তেমনি।

আমি হিন্দবাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরে হিন্দা—ইহারা মানুষ না ভেড়া?

হিন্দা বলিল—বোধ হয় মানুষ, কিন্তু শীতের তীব্রতার জন্য ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়াছে। আমি বলিলাম—সে কি করে, গরমে আমরা ঘামিয়া মরিতেছি, শীত কোথায়?

ইহা শুনিয়া হিন্দা বলিল—তাও তো বটে!

সে আরও বলিল—ইহাদের জিজ্ঞাসা করা যাক্ না!

তখন আমরা অগ্রসর হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় আপনারা কি মানুষ?

সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এমন অপমান আমাদের এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই! আমরা মানুষ নই!

আমরা নরম হইয়া বলিলাম যে আমরা বিদেশী মানুষ, কাজেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি।

সে খানিকটা শান্ত হইয়া বলিল আমরা মানুষ নই। তোমরা ঐ প্রশ্ন এ দেশের কাহাকেও করিও না—কারণ এ দেশের সব চেয়ে বড় গালি হইতেছে কাহাকেও মানুষ বলা। শুনিয়াছি এই রঙ্গদেশের বাহিরে যে ভূখণ্ড আছে তাহাতে একপ্রকার অসভ্য জীব বাস করে তাহাদেরই নাম মানুষ। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, রাজনীতি নামে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে; তাহারা ঈশ্বর নামে এক উপদেবতায় বিশ্বাস করে; অন্যের স্ত্রীকে তাহারা সম্মান করে; পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করা তাদের মধ্যে নিন্দনীয়, এমন কি কোন বস্তু বলিয়া লইলেও তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। আমরা ঐরূপ অসভ্য নই, আমাদের মধ্যে যাহারা গর্হিত আচরণ করে তাহাদের আমরা 'মানুষ' বলিয়া গালি দিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রগতিপন্থী শুনিয়াছি তাহারা অত্যন্ত গোপনে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকে।

আমরা বিনীতভাবে বলিলাম যে এতক্ষণে আমাদের বোধোদয় হইল, কিন্তু আপনাদের সম্যক ইতিহাস জানিতে বাসনা; কোথায় গেলে জানিতে পারিব?

সে বলিল এই পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইবে—উহা এ দেশের কেতাবখানা—সেখানে খোঁজ করিও, এ দেশের পুরাতত্ত্ব জানিতে পারিবে। আমরা দুই জনে কেতাবখানার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

কেতাবখানায় গিয়ে বঙ্গদেশের ইতিহাস ঘাঁটিয়া যাহা উদ্ধার করিলাম তাহা এইরূপ।

খৃষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে হিন্দুস্থানে নবাগন্তুক জাতি-সমূহ আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একদল বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া এক অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। প্রায় একমাস এই জটিল অরণ্যের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরিয়া যখন তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে, তাহারা একদল ভেড়ার সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহারা এই গড্ডালিকাকে অনুসরণ করিয়া সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু তাহারা ভেড়ার দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাণে বাঁচিল ও এমন স্বর্গতুল্য দেশে আসিয়া পৌঁছিল, সেইজন্য এই মেষপালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ভেড়াগুলিকে মারিয়া নিজেরা সেই চর্ম্ম পরিধান করিল। (বাহুল্য হইলেও বলিয়া রাখি, ভেড়ার মাংস তাহারা নষ্ট করিল না, আহার করিয়া ফেলিল; বঙ্গদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহা প্রধান লক্ষণ)। তারপর হইতে এই মেষচর্ম্ম আর কখনো তাহারা ছাড়ে নাই। ফলে হইল এই যে কালক্রমে বহু সন্তান সন্ততি পরম্পরায় এই মেষচর্ম্মকেই তাহারা নিজেদের চর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তাহারা নিজেদের একজাতীয় ভেটক (ভেড়া) ভাবিতে লাগিল; এক সময়ে যে তাহারা মানুষ ছিল তাহা ভুলিয়াই গেল। এখন তাহাদের এই মেষচর্ম্মের প্রতি এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা যে কেহ তাহাদের মানুষ বলিলে বিষম অপমানিত বোধ করে। আমি হিন্দবাদকে বলিলাম, দেখ ইহারা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দবাদ বলিল—দাদা; এই মেষচর্ম্ম অত্যন্ত মূল্যবান্, এবারকার বাণিজ্যযাত্রায় এই বস্তু সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে। ইহাতে অত্যন্ত মূল্যবান্ পাদুকা হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহা কিরূপে সম্ভব!

সে বলিল—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চল না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।

তখন আমরা পরামর্শ করিতে করিতে শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ক্রমে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা উজির, কেহ বা নাজির, কেহ বা কোটাল! একদিন তাহারা ধরিয়া বসিল, তোমাদের দেশের কথা আমাদিগকে বল!

একজন প্রশ্ন করিল—আচ্ছা মানুষ কি রকম জীব? তাহারা তোমাদের মতই দ্বিপদ জীব না চতুষ্পদ?

আমি বলিলাম—মানুষ শৈশবে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ (লাঠি একখানা পা) বিশিষ্ট জীব। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ তাহাদের আদিপুরুষ ভেড়ার কৃপায় অতি সহজেই তাহারা চতুষ্পদ।

আর একজন প্রশ্ন করিল—শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সমান ইহা কিরূপে সম্ভব?

আমি বলিলাম কেন সম্ভব নয়? মানুষের মধ্যে কেহ বা গাড়ীতে চাপে আর কেহ বা সেই গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে। অসাম্য কোথায়?

পুনরায় প্রশ্ন হইল—সাম্য কাহাকে বলে?

উত্তর :—ধনীর গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মরিবার অধিকারকে সাম্য বলে।

তাহাদের মধ্যে একজন লেখক ছিল (লেখক মাত্রই সাহিত্যিক) সে আমার উত্তর লিখিয়া লইতে লাগিল।

প্রশ্ন :—মৈত্রী কাহাকে বলে?

উত্তর :—ধনীর বিলাসের জন্য দরিদ্রের খাজনা দিবার অধিকারেব নাম মৈত্রী?

প্রশ্ন :—স্বাধীনতা কি? কোন প্রসাধন দ্রব্যের নাম, না, মুদ্রা বিশেষেব নাম?

উত্তর :—(মনে মনে) মূর্খ, স্বর্গীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানো না। তাই তোমাদের এ দশা! (উচ্চস্বরে) রাজনীতিকদের খেয়ালে ও মূঢ়তায় পর রাজ্যের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিলে, অকাতরে, নির্ব্বিচারে

অকারণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরার যে মৌলিক অধিকার তাহারই নাম স্বাধীনতা।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা মাঝে মাঝে কড়ি-মধ্যমে ব্যা-ব্যা (মানব ভাষায় বাঃ বাঃ) করিতে লাগিল।

প্রশ্ন :—সত্য কি ?

উত্তর :—সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন :—সংবাদ পত্র কি ?

উত্তর :—মূর্খ যাহার লেখক, ধূর্ত যাহার সম্পাদক, গুণ্ডা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার সত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা (কপিধ্বজ) ; চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌন তত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা তাহাই সংবাদ পত্র।

প্রশ্ন :—কবিতা কে ? অবশ্যই কোন বারাঙ্গনার নাম ? তাহার বয়স কত ?

উত্তর :—মানসিক কণ্ডুয়নের কাগজিক আত্ম-প্রকাশের নাম কবিতা।

প্রশ্ন :—তবে তাহার জন্য লোক এত পাগল কেন ?

উত্তর :—আমরা যে মানুষ।

প্রশ্ন :—মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে ?

উত্তর :—সংবাদপত্র দিয়া জাগরণ ; আহারের কালে বাড়ীর শিশু, মহিলা ও দাসদাসীদের বঞ্চিত করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ ; ব্যবসায়িক সততার নামে প্রবঞ্চনা ; বিকালে খেলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি মহৎ প্রতিষ্ঠানে গমন, সেগুলি বন্ধ থাকিলে দেশের কাজ করিবার জন্য সভা-সমিতিতে যোগদান কিন্তু চাঁদার খাতা বাহির হইলেই পলায়ন এবং মহৎ সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রাগমন, সংক্ষেপে ইহাই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন :—বিশ্বপ্রেম কি ?

উত্তর :—প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য না করিবার চিত্তাকর্ষী অজুহাত।

প্রশ্ন :—মিথ্যা কাহাকে বলে ?

উত্তর :—নিজের মুখে যাহা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং পরের মুখে যাহা শুনিলে ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব মনে জাগ্রত করে—তাহাই মিথ্যা।

প্রশ্ন :—রাজনীতি কি ?

উত্তর :—রাত্রের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য ব্যাক্‌ব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয়।

প্রশ্ন :—ধর্ম্ম কি ?

উত্তর :—নৈশ-ব্যসনের ক্লান্তি দূর করিবার উপায় ; এইজন্য অধিকাংশ ধর্ম্ম-চর্চ্চা, পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক ও উপাসনার সময় প্রাতঃকাল।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা একবাক্যে বলিল—আহা আমরা যদি মানুষ হইতাম।

আমি বলিলাম—ইহাতেই এত উৎসাহ! মনুষ্যত্বের দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কথা তো এখনো বলি নাই।

তাহারা বলিল—শীঘ্র বল।

আমি বলিলাম—সে দুটি গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—সে কি ?

উত্তর :—কোন পুরুষের গাঁঠে টাকাকড়ি আছে সন্দেহ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে নিপুণ আঙুলে তাহা খসাইয়া ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহের নাম গ্রন্থিচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—আর নীবিচ্ছেদ ?

উত্তর :—টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে (জ্ঞাতসারে হইলে অন্য নাম আছে) বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বিমোচনের নাম নীবীচ্ছেদ। এই দুইটি মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। যে মনুষ্যজাতি এ দুটিতে অনভ্যস্ত অন্য সব জাতি তাহাকে অসভ্য, অমানুষ, সংস্কৃতিহীন, সেকেলে, প্রাচ্য, পরাধীন, বুর্জোয়া বলিয়া থাকে।

তখন তাহারা একযোগে বলিল—তুমি আমাদিগকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও, আমরা গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ করিতে শিখিব—মনুষ্যত্ব যে এত লোভনীয় জানিতাম না। এমন কি এক একবার তাহা মেষত্বের অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমি গ্রন্থিচ্ছেদ শিখাতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাদিগকে মেষচর্ম্ম ছাড়িতে হইবে।

তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সে কি কথা। আমরা রক্সিলা জাতি, আমাদের আদিপুরুষ মহামেষ—এই মেষচর্ম্মের জন্যই আমরা টিকিয়া আছি; হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির মধ্যে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য তাহা এই মেষচর্ম্ম-প্রসূত, আমাদের মহাকবি জাতীয় সঙ্গীতে এই গণমনোভাবকে রূপ দিয়া দিয়াছেন "মানুষ আমরা নহি তো, মেষ।" সেই চর্ম্ম পরিত্যাগ করিব?

আমি বলিলাম তাহা হইলে গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিতে পারিলে না। কারণ গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা বিশেষ ভাবে মানুষেরই বিদ্যা, মেষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

কি আশ্চর্য্য! গ্রন্থিচ্ছেদের এমনই মহিমা যে তাহারা কিছুক্ষণ আলোচনার পরে এক দিনের জন্য মেষচর্ম্ম ছাড়িতে স্বীকার করিল।

আমি বলিলাম মানুষের সঙ্গে তোমাদের ঐক্য ঘনিষ্ঠ, কাজেই এক দিনেই তোমরা গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহারা সুখী হইয়া মেষচর্ম্ম ছাড়িতে গেল। আমি হিন্দবাদকে চোখ টিপিলাম, সে বলিল—তুমি ইহাদিগকে শিক্ষা দাও, ততক্ষণে আমি চর্ম্মগুলি জাহাজে তুলিয়া ফেলিব। শেষে আমার সঙ্কেত পাইলে তুমি গিয়া জাহাজে উঠিবে।

কিছুদিন পরে তাহারা মেষচর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এখন আর তাহাদের মানুষ ছাড়া কিছু মনে করিবার উপায় নাই। তাহারা বলিল—কই আমাদের গ্রন্থিচ্ছেদ শিক্ষা দাও।

আমি বলিলাম মনে কর—খাজাঞ্চী সাহেবের গাঁঠে টাকা আছে, তুমি উজীর সাহেব, এমনভাবে তাহা বাহির করিয়া লও, যেন সে বুঝিতে না পারে। (আমাদের দেশে খাজাঞ্চি সাহেব অন্যের গাঁঠ কাটে, তাহাকে মনে মনে জব্দ করিবার জন্য তাহার গাঁঠ কাটিতে বলিলাম।) উজীর সাহেব তাহার গাঁঠে হাত দিতেই খাজাঞ্চি ধরিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম—হইল না। ধরা পড়িলে চলিবে না। আবার চেষ্টা কর। উজীর সাহেব আবার চেষ্টা করিল। কখনো বা নাজির সাহেবকে বলিলাম যে তুমি কোটাল সাহেবের গাঁঠ হইতে অজ্ঞাতসারে টাকা বাহির করিয়া লও। তাহারা গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি তাহাদের উৎসাহিত করিয়া বলিলাম—যদিও তোমাদের হাত এখনো কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িয়া যাইতেছ, কিন্তু অচিরে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে। এই অল্পকালের মধ্যে তোমরা যে দক্ষতা লাভ করিয়াছ, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় বাহিরের প্রভেদ সত্ত্বেও তোমরা মূলত মানুষ! প্রতিদিন তোমরা যদি এক প্রহর ধরিয়া এইরূপে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিতে থাক—তবে একমাসের মধ্যেই গ্রন্থিচ্ছেদে, নীবীচ্ছেদে, বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায়, মিথ্যাভাষণে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। তাহারা আমার আশ্বাস বাণীতে আনন্দিত হইয়া গ্রন্থিচ্ছেদের মহড়া দিতে লাগিল—এমন সময় হিন্দবাদের সঙ্কেতধ্বনি বাজিয়া উঠিল—আমি তাহাদের অগোচরে পালাইয়া আসিয়া জাহাজে উঠিলাম, দেখিলাম হিন্দবাদ ভায়া কাজের লোক, বহু চর্ম্ম জাহাজে তুলিয়াছে। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

তাহারা আমাকে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে চামড়াগুলির সন্ধান করিল; দেখিল চামড়া নাই; তখন তাহারা বুঝিল চামড়াগুলি অপহরণ করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের একটা জলন্ত প্রমাণ দিয়াছি; তাহারা ছুটিয়া আসিয়া জাহাজ ঘাটায় দাঁড়াইল—কিন্তু জাহাজ তখন মাঝ নদীতে।

তাহারা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, এ কি করিলে, শেষে আমাদের মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে—আমরা কি করিয়া রঙ্গদেশে মুখ দেখাইব। মেষচর্ম্মই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, জগতে রঙ্গিলাজাতির বিশিষ্ট 'অবদান', তাহা গেলে আমাদের বাঁচিয়া কি লাভ, তাহা গেলে মরিয়াও যে আমাদের সান্ত্বনা নাই। হায় হায় শেষে তোমার মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়া আমরা মানুষ হইলাম!

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—দুঃখিত হইও না! তোমরা মানুষ হও নাই। বাহিরটা মানুষের মত হইলেই মানুষ হয় না—তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না! তোমরা চুরি জানো না, বাটপাড়ি জানো না, কাজেই তোমরা অর্থনীতি জানো না, তোমরা পরস্ত্রীহরণ জানো না, অন্যকে হনন করিতে জানো না, কাজেই রাজনীতি জানো না; তোমরা মনোভাব গোপন করিতে জানো না, মিত্রকে বিপদে ফেলিতে জানো না, কাজেই তোমরা ধর্ম্ম জানো না; তোমরা গাড়ী-চাপা দিয়া

দরিদ্রকে মারো না—তোমাদের মধ্যে সাম্য কই! তোমরা দরিদ্রের গলা টিপিয়া শিশুর দুধের কড়ি অপহরণ করিতে পারো না, তোমাদের মধ্যে মৈত্রী কই! তোমরা অসহায়কে নিজেদের খেয়ালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে কচুকাটা করিতে পাঠাও না, তোমাদের মধ্যে স্বাধীনতা কই! সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, বায়ু পিত্ত কফের মত মানব দেহকে সজীব করিয়া রাখে, তাহা না থাকায় তোমরা মানুষ কিরূপে! আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি তোমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, তোমরা মানুষ নও, এবং কখনো হইতে পারিবে না। মানুষ যে কাহাকে বলে হাতে হাতে তাহার প্রমাণ তো পাইলে, কেমন কৌশলে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া চামড়াগুলি লইয়া পলাইলাম!

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাদের মহাকবি যে বলিয়া গিয়াছে—

মানুষ আমরা নহি তো মেষ!

তাহার কি হইবে? লোকে বুঝিবে কেন? তাহারা আমাদের আকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া ঠাহর করিয়া রাখিবে। আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতই বা কোন্ মুখে গাহিব।

আমি বলিলাম, জাতীয় সঙ্গীতের জন্য ভয় করিওনা, কবি অত্যন্ত কৌশলে উহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে দৈবক্রমে মানুষ হইলেও তোমরা উহা অনায়াসে গাহিতে পারো, কেবল ঐ ছত্রটির মধ্যে যে 'কমা' আছে, তাহাকে একটু ঠেলিয়া আগের দিকে বসাইয়া দাও, তখন ছত্রটি হইবে—

মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

আমার এই পরম সান্ত্বনা বাক্যেও তাহারা শান্ত হইল না;—মেষ-চর্মের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তাহারা ঐক্যতানে কাঁদিতে থাকিল। কিন্তু জলের কল্লোলে, বাতাসের নিঃস্বনে তাহা আর শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। সিন্দবাদ আসিয়া বলিল—দাদা, এ যাত্রায় আমাদের বাণিজ্য ভালই হইল—এ সব চামড়া বেচিলে মোটা মুনাফা হইবে।

নর-শার্দ্দূল সংবাদ

আমি কমলাকান্তের মত আফিং খাই নাই, কিন্তু খাইবার ইচ্ছা ছিল। তাহাতেই এমন ঘটিল কি না কে বলিতে পারে? কি ঘটিল তাহা না জানিলে কেমন করিয়া আপনারা বিচার করিবেন! তবে আগে তাহা-ই মন দিয়া শুনুন।

আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল—বন্দুক হাতে একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে পাশেই একটা নিহত বাঘ; মানুষ বাঘটাকে শিকার করিয়াছে। আমি শুনিতে পাইলাম মানুষ ও বাঘটার মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে। আপনারা বলিবেন মরা বাঘ কেমন করিয়া কথা বলে! কিন্তু ছবির বাঘই বা কেমন করিয়া কথা বলিতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হয় তবে মরা বাঘই বা বলিবে না কেন? কিন্তু খুব সম্ভব বাঘটা মরে নাই—আধমরা হইয়াছিল মাত্র।

বাঘটা বলিল—আমাকে মারিলে কেন?

মানুষ উত্তর দিল তুমি যে পশু!

বাঘ—পশু তাহাতে কি হইয়াছে?

মানুষ—পশুমাত্রেই নীচ, মানুষ মাত্রেই মহৎ।

বাঘ—বিষয়টা লইয়া তর্ক চলিতে পারে কিন্তু এখন তাহা করিব না। অন্য প্রশ্নের সমাধান আগে করা যাক্—মহৎ নীচকে মারিবে ইহাতে মাহাত্ম্য কোথায়?

মানুষ—ও তুমি বুঝিবে না।

বাঘ—ওই তোমাদের এক কথা! বুঝিব না! কেন বলিতে পার? কিন্তু তোমরা যে সত্যই পশুর অপেক্ষা বড় ইহা তো তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় না!

মানুষ—কেন?

বাঘ—কেন কি? পশুকে তোমরা অনেক বিষয়ে আদর্শ মনে কর।

মানুষ—কি রকম?

বাঘ—এই দেখ না কেন—তোমাদের মধ্যে যাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ তাহাদের তোমরা নরসিংহ, পাঞ্জাবকেশরী, নরপুঙ্গব বলিয়া থাক। কাহারো দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে বল শ্যেনদৃষ্টি, কাহারো বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে জম্বুকের সঙ্গে তুলনা কর। তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডকে বল—বৃটিশসিংহ; শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বহু প্রচলিত নাম—ভল্লুক! এ সব তবে কি?

মানুষ—ওগুলা নেহাৎ রূপক।

বাঘ—অর্থাৎ তর্ক এড়াইয়া যাইবার একটা ছুতা মাত্র!

মানুষ—তর্ক করিতে আমি খুব রাজি আছি। মানুষে তর্ক করিতে ভীত এমন অপবাদ কেহ আজো দিতে পারে নাই। যাহাতে তর্কের কিছু নাই এমন একটা প্রশ্ন করি! তোমরা মানুষ মারো কেন?

বাঘ—মানুষ মারি কারণ মানুষ আমাদের খাদ্য। তোমরা বাঘ ভালুক মারো, বাঘ ভালুক কি তোমাদের খাদ্য? কেন, চুপ করিয়া থাকিলে কেন? আমাদের মানুষ মারিবার একটা কারণ আছে, তোমাদের তো সে কারণ নাই!

মানুষ—মানুষ তোমাদের খাদ্য একথা কে বলিল?

বাঘ—কে বলিল তাহা জানি না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমরা মানুষ খাইয়া আসিতেছি—উহাতে আমাদের একটা কায়েমী সত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মানুষ—ইহা অন্যায়।

বাঘ—অন্যায় হইলে সে অন্যায় ভগবানের। ও তোমরা বুঝি আবার ভগবান মানো না। কি মানো ডারউইন সাহেবকে? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও—শক্ত অশক্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে কি না!

মানুষ—তুমি কিছু কিছু বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি!

বাঘ—করিব না! বহু জন্মজন্মান্তর মানুষ খাইতে খাইতে কিছু মনুষ্যত্ব আয়ত্ত হইয়াছে বই কি?

মানুষ—তাহা যদি হইয়া থাকে আমার কথাগুলা বুঝিতে পারিবে। মানুষ পশুর অপেক্ষা বড় এই জন্য যে সে কেবল নিজের জন্য ভাবে না পশুর জন্যও ভাবিয়া থাকে।

বাঘ—দু-একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও—কথাটা বড় গভীর মনে হইতেছে।

মানুষ—দেখনা কেন—আমরা পশুদের আরামের জন্য পিঁজরাপোল সৃষ্টি করিয়াছি; চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি, সি-এস্-পি-সি-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, এমন কি রাজপথের পাশে পাশে তৃষিত পশুর জন্য জলাধার তৈরী করিয়া দিয়াছি।

বাঘ—তোমার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু এখনো তোমার গুলিটা পাঁজরায় বিঁধিয়া আছে, লাগিতেছে।

মানুষ—হাসি পাইতেছে কেন?

বাঘ—পাইবে না? এমনভাবে কথাগুলি বলিলে যেন মানুষের সব দুঃখ দূর করিয়াছ, এখন উদ্বৃত্ত শক্তি দিয়া পশুর দুঃখ দূর করিতে লাগিয়া গিয়াছ।

মানুষ—তুমি নেহাৎ পশু।

বাঘ—তোমাকে অপমান করিবার জন্য গালি দিবার প্রয়োজন নাই, অত্যন্ত সত্য কথাটা বলিলেই চলিবে—তুমি নেহাৎ মানুষ! রাগ করিও না শোন! মহিষের বা গরুর গাড়িতে অতিরিক্ত মাল চাপাইলে পোষাক-পরা কর্ম্মচারী আসিয়া গাড়োয়ানকে লইয়া টানাটানি করে এবং অবশেষে কিছু পয়সা (তোমরা বোধ হয় ইহাকে ঘুষ বল) লইয়া ছাড়িয়া দেয় দেখিয়াছি। ইহাতে পশুর দুঃখ তো কমেই না বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়ে।

মানুষ—কেন?

বাঘ—কারণ ওই ঘুষের পয়সাটা ওয়াশীল করিয়া লইবার জন্য পশুটাকে আরো বেশী করিয়া খাটায়। কিন্তু বাপু রিক্সাতে দুইজনের জায়গায় পাঁচজন চাপিলে তো রিক্সাওয়ালাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা তোমরা কর নাই।

মানুষ—ইচ্ছা করিয়াই করি নাই।

বাঘ—কেন?

মানুষ—রিক্সাওয়ালা মানুষ, স্বাধীন জীব, আর পশু পশুমাত্র, তাহার স্বাধীন-সত্তা বলিয়া কিছু নাই—নিজের ইচ্ছার মালিক সে নিজে নয়! কাজেই তাহাকে রক্ষা করিবার ভার মানুষের উপর।

বাঘ—একটিপ নস্য দিতে পার ?

মানুষ—নস্য লইবার অভ্যাস আমার নাই।

বাঘ—মানুষ যে স্বাধীন আর পশু পরাধীন এ কথা কে বলিল ?

মানুষ—কে আবার বলিবে ?

বাঘ—আমি বলিতেছি শোন। মানুষই পরাধীন—পশুর নিজের ইচ্ছার মালিক নিজে।

মানুষ—এ-যে উল্টো কথা।

বাঘ—কিন্তু সত্য কথা। তবে শোন। দুপুরবেলা রাজপথে গাড়ি টানিতে টানিতে ক্লান্ত হইলে মহিষ রাজপথে পড়িয়া যায়—গাড়োয়ানে গুঁতা মারে, টানাটানি করে, কিন্তু সে নিজের ইচ্ছার মালিক বলিয়াই আর ওঠে না, দিব্যি পড়িয়া থাকে। আর রিক্সাওয়ালা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেও তাহার নিস্তার নাই। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে উঠিয়া আবার গাড়ী টানিতে হয়।

মানুষ—কারণ, সে স্বাধীন।

বাঘ—না, কারণ সে পরাধীন। তাহার উপরে একটি পরিবারের ভার; তাহার ক্লান্ত হইলে চলিবে না, ঘামিলে চলিবে না, বসিয়া পড়িলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক ঐ যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া পয়সা কামাই করিতেই হইবে, ইহার মধ্যে স্বাধীনতা কোথায় ? পশুকে পরিবার পালন করিতে হয় না—কাজেই নিজের মালিক সে নিজে। মানুষকে পরিবার পালন করিতে হয়, নিজের মালিক সে নিজে নয়, অপরে। এখন কথাটা বুঝিলে ?

মানুষ—তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আবার তর্ক করিতে হইল দেখিতেছি। এযাবৎকাল মানুষ জাতিহিসাবে পশুকুলের উপরে যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে তাহারই অভিশাপে তোমাদের এই দণ্ড। তোমরা স্বাধীন হইয়াও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেছ না। প্রথমে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম যে তোমরা পশুকে বড় মনে কর বলিয়াই তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সিংহ, ব্যাঘ্র, করী প্রভৃতি বল। আসল কথা কি জানো, বহুজন্মের আচরণগত

পাপে তোমরা পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়াছ, কাজেই ঐ বিশেষণগুলি সত্যই তোমাদের প্রাপ্য—উহাতে অন্যায় কিছুই নাই।

মানুষ—তুমি লজিক পড় নাই, ইতিহাস জানো না, অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে পারিব না! কিন্তু আবার বলিতেছি তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আর তোমরা কৃতঘ্ন।

মানুষ—কেন?

বাঘ—পশুরা তোমাদের উপকার করে আর তোমরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেল—ইহাকে তো তোমাদের ভাষাতে কৃতঘ্নতা-ই বলে।

মানুষ—ইহার উত্তর তো আগেই দিয়াছি তোমরা নীচ!

বাঘ—তা-ই বটে!

মানুষ—বিস্মিত হইলে কেন?

বাঘ—হইব না! পশুরা মদ খাইয়া নেশা করে না, তোমরা কর; পশুরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী নষ্ট করে না, তোমরা কর; পশুরা অকারণে হত্যা করে না; তোমরা কর; পশুদের জন্য নিরস্ত্রীকরণ সমিতি করিতে হয় না, তোমাদের জন্য করিয়াও লাভ হয় না; পশুরা ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষ্যে নিরীহ, নিরস্ত্র জাতিকে ধ্বংস করে না, তোমরা কর; পশুরা বাণিজ্য-বাদ নামে নূতন এক ধরণের ডাকাতির নাম শোনে নাই—তোমরা তাহার সৃষ্টি করিয়াছ, পশুরা সভ্যতাপ্রচার উপলক্ষ্যে অপরের দেশ অধিকার করে না, তোমাদের মধ্যে যাহারা করে তাহারা বীর পুরুষ; পশুরা সংবাদ-পত্র চালনা উপলক্ষ্যে মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে ছড়াইয়া দেয় না, তোমাদের মধ্যে উহার নাম জর্ণালিজম্; তোমাদের মনে এক কথা, মুখে আর এক কথা—পশুরা কথাই বলিতে পারে না; তোমাদের সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই বিশেষ একটা দণ্ডনীয় অপরাধ পাশবিক বলিয়া আখ্যাত—আর কিছুদিন এইরূপ প্রচার চলিলে পশুরা ইহা তোমাদের কাছ হইতে শিখিয়া লইবে—এবং বলিবে 'I thank the jew for teaching me the word.'

মানুষ—তোমরা সংবাদপত্র পড় না কি ?

বাঘ—যতজন সংবাদপত্র পড়ে তাহার অধিকাংশই পশু।

মানুষ—সত্যই তোমার নিকটে অনেক কিছু শিখিবার আছে। চল, তোমার গুলিটা বাহির করিয়া দিই।

বাঘ—ও বুঝিয়াছি। গুলি মারিয়া প্রাণের যে-টুকু বাকী আছে, সে-টুকু ওষুধ ও ছুরি দিয়া শেষ করিয়া দিতে চাও। কিন্তু তার প্রয়োজন নাই, নিজেদের অস্ত্রকে এত ব্যর্থ মনে করিয়া দুঃখ করিও না—গুলিতেই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি মরিলাম।

এই বলিয়া বাঘটা মরিল—মানুষটা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নর-শার্দ্দূল সংবাদের এইখানেই সমাপ্তি।

নির্ব্বাণ

রাজার আজ কয়েক দিন হইল বড়ই চিন্তা। দীর্ঘ জটাধারী এক নাগাসন্ন্যাসী কয়দিন আগে রাজপুরীতে আসিয়াছিলেন, রাজার বিশেষ অনুরোধে খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—রাজকুমার সিদ্ধার্থ শীঘ্রই সংসার ত্যাগ করিবেন। তিনি রাজা হইবেন না বটে তবে রাজাধি-রাজের ন্যায় সম্মানিত হইবেন। দীর্ঘ জটাধারী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাজার চিন্তা যাইতেছে না। রাজকার্য্যে তাঁহার মন নাই, আহার-নিদ্রায় তিনি বীতরাগ—নির্জ্জনে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতেছেন।

রাজপুত্রেরও মনের অবস্থা বড় সুবিধার নয়. এই অল্প বয়সেই সংসারটার ফাঁকি তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে বিধাতা-পুরুষ কৌশলী ঘৃত-ব্যবসায়ী ; সংসারে অতি অল্প পরিমাণ সুখের সঙ্গে প্রচুর মাত্রায় দুঃখ মিশাইয়া কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ইহাকে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছি। অধিকাংশ লোকই ঠকিতেছে। সংসারকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া অবশেষে অজীর্ণ ও অম্লরোগে ভুগিতেছে।

কিন্তু তাঁহার কাছে বিধাতার ভেজাল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাজপুত্র ঠকিবার পাত্র নহেন। ছেলেবেলায় সেই আহত হাঁসটাকে দেখিয়া তাঁহার খট্‌কা লাগিয়াছিল বটে, তবে প্রাণীরা চিরজীবী নয়! আসলের পিছনে সুদের ন্যায় জীবনের পিছনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারপরে কিছুদিন কথাটা ভুলিয়া ছিলেন। প্রথম যখন বিবাহ করিলেন—মনে হইল, তবে বোধ হয় তাঁহারই ভুল; সংসারটা সত্য সত্যই বুঝি বিশুদ্ধ গব্যঘৃত। কিন্তু বেশিদিন এভাব থাকিল না, আবার দু-চারটি অধ্যাত্মিক উদ্গার উঠিল, রাজপুত্র বুঝিলেন—ইহাতে ভেজাল আছে।

বিশেষ, কয়েকদিন হইতে এই ভাবের বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে, পদে পদে সংসারের ফাঁকি চোখে পড়িতেছে। সেদিন বাগানে বেড়াইতে ছেলেবেলার মার্ব্বেল খেলিবার গর্ত্তটা চোখে পড়িল। অমনি তিনি ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কে বলিল, এতটুকু গর্ত্তে এতখানি নীতিতত্ত্ব নিহিত আছে? তাঁহার মনে হইল, সংসারটা এমনি শত শত নৈতিক অধঃপাতের কূপে পরিপূর্ণ। তবে যে শাস্ত্রে বলে গোষ্পদে মানুষ ডুবিয়া মরে তাহা একেবারে মিথ্যা নয়। আর একদিন তাঁহার শিকার করিবার ধনুকখানি চোখে পড়িল; তিনি শিহরিয়া উঠিলেন মনে হইল—তিনিও অমনি আসক্তির রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ইলিশ মৎস্যের মত বাঁকিয়া গিয়াছেন। মায়াপাশ ছিন্ন হইলেই সরল ভাব ধারণ করিবেন। শেষে এমন অবস্থা হইল, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই একটা তত্ত্বকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পান। ঢেঁকি, কুলা, ধামা, হাতা, খুন্তি, পিঁড়ি সকলের মধ্যেই নীতিকথা উগ্রভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীটাকে তাঁহার সুবৃহৎ একখানা বোধোদয়ের মত বোধ হইল। দৃশ্য জগতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপদ আরো বেশী। অন্ধকারের মধ্যে শত শত সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে বৈরাগ্যের পথে চোখ মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। রাজকুমার প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পত্নীকে ফাঁকি দিয়া কিছু বেশী পরিমাণে সুধা পান করিলেন। নেশার ঝোঁকে তাঁহার মনে হইল, সংসারটা বেবাক মায়া; মনে হইল তাঁহার দুইখানা আধ্যাত্মিক ডানা গজাইয়াছে; ছাদের উপর হইতে লাফ দিবার চেষ্টায়

ছিলেন ; লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সেদিনের ব্যাপার দেখিয়া পত্নী সুধার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া রাখিতেন। রাজপুত্র বুঝিলেন—ভেজাল, ভেজাল, সর্ব্বত্রই ভেজাল। সাধনার পথে নারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা। তিনি সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন—রথ প্রস্তুত কর ; আমি নগরে ভ্রমণে বাহির হইব।

২

পুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইবে শুনিয়া রাজা পরম আহ্লাদিত হইলেন, তবে বুঝি পুত্রের মতিগতি ফিরিল। তিনি তখনি নগরপালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রাজপুত্র যে পথে যাইবে সে পথে যেন দুঃখের কোন লেশ না থাকে। কোটালের যষ্টি যাদুকরের যষ্টি না হইলেও তাহার দ্বারা অকালে অস্থানে হাসি বিকশিত করিয়া তুলিতে সে অভ্যস্ত ; এমন সময়ে মাঝে প্রায়ই করিতে হয়। নগরের পূর্ব্বগামী পথে হাসির ব্যবস্থা সে করিল। প্রত্যেককে পাঁচ 'দ্রম্ম' মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার করিয়া হাজার জন লোক ভাড়া করা হইল, তাহারা পথের দুই পাশে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া রহিল। রাজপুত্র বাহির হইলেই হাসিতে আরম্ভ করিবে। পাছে তাহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, সেজন্য প্রত্যেকের পিছনে একজন করিয়া যষ্টিধারী প্রহরী মোতায়েন করা হইল! নিন্দুকেই শুধু বলিয়া থাকে যে, লাঠিতে কেবল কাঁদায় ; প্রয়োজন হইলে লাঠির আঘাতে হাসানও চলে। সহরের সে অঞ্চল হইতে কাণা, খোঁড়া, দুঃখী, দুঃস্থদের তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

রাজপুত্র রথে বাহির হইয়াছেন ; হাজার জন 'দেখন-হাসি' হাজার জোড়া দন্ত-পঙক্তি বাহির করিয়া হাসিতেছে। তিনি এই বাধ্যতামূলক দন্ত-প্রদর্শনী দেখিয়া বুঝিলেন—জগৎ আনন্দময়। বিধাতা যে মানুষকে দাঁত দিয়াছেন, হাস্য করাই তার লক্ষ্য, রাজপুত্রকে দেখিলে হাস্য করাই তার উদ্দেশ্য, আহার করা নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু সৌভাগ্যবশত রাজকীয় দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ নয়, নতুবা তিনি দেখিতে পাইতেন—মাঝে মাঝে প্রহরীর লাঠির

গুঁতা পিঠে পড়িতেছে, এবং হতভাগ্য পৃষ্ঠের মালিক কাঁপিতে কাঁপিতে হাসিতেছে।

রাজপুত্র চলিয়াছেন, কোথাও কোন বৈকল্য নাই, কেবল হাসি, গান, বাঁশী, হাসি আর হাসি! এমন সময়ে—ওকে? ও কি? পথের প্রান্তে ও লোকটা কে? এই হাসির ধ্রুপদের মধ্যে তাল কাটিয়া ও লোকটা কে প্রবেশ করিল? রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ওই লোকটা কে? ও কেন হাসির ঐক্যতানে যোগ দেয় নাই? দৃষ্টি উদাস, গতি উদাসীন, মুখ আসক্তিহীন, বেশ ম্লান, কিন্তু একদা যেন সৌখীন ছিল—ও লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, ও লোকটা বেকার?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে আবার কি? উহা ওর বংশগত, না সকলেরই হইতে পারে?

সারথি বলিল—সত্য কথা বলিতে কি কুমার, উহা ওর জন্মগত নয়, সকলেরই এমন অবস্থা হইতে পারে। রাজার ঘরে না জন্মিলে আপনিও বেকার হইতেন, আবার আপনি যদি নিজেই রথ হাঁকাইতে শেখেন তবে আমাকেও বেকার হইতে হইবে।

তিনি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেকার—কি করিলে হয়?

সারথি বলিল—তার চেয়ে বলুন কি না করিলে হয়? লোকটাকে আমি চিনি। গৌতমের চতুষ্পাঠির ছিল সেরা ছাত্র। ওরকম মেধাবী ছাত্র এ অঞ্চলে ছিল না। গৌতমের নীবার ধান্যের ক্ষেতে আগ্রহাতিশয্যে এত বেশী জল সেচন করিয়াছিল যে, অবশেষে ধানে পোকা লাগিয়া গিয়াছিল। তবুও গৌতমমুনি ওর উপরে রাগ করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরীক্ষায় ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখন বৃত্তিহীন! তাই ওর এই দশা।

রাজপুত্র—এই বেকারের পরিণাম কি?

সারথি—হয় ত রাজদ্রোহ করিবে, নয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, নয় বিবাহ করিবে।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্! সারথি, রথ ফিরাও।

বিবেক-বিদ্ধ রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন—রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

পাছে রাজপুত্র সংসার ত্যাগ করে সেই জন্য স্নেহময়, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পুত্রের মঙ্গলকামী পিতা বাছা বাছা নটী আমদানী করিলেন—তাহারা সর্ব্বদা বাজপুত্রকে ঘিবিযা থাকিবে। সৌন্দর্য্য, যৌবন ও বিলাসেব প্রাচীরে এত টুকুও ফাটল না থাকে—যাহার ভিতর দিযা বৈরাগ্যের শীতবায়ু প্রবেশ করিতে পায়।

৩

রাজপুত্র পরদিন আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। নগরের পশ্চিম দিকের পথটাকে ভাল করিয়া সাজান হইল; আগেব দিনের চেয়ে কড়া পাহাবা বসিল, যেন অবাঞ্ছিত কেহ না আসিয়া পড়িতে পারে। পথের দুই ধারে দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদেব দাঁড করাইযা দেওয়া হইল; তাহারা বিচিত্র বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইযা মূর্তিমান বিজ্ঞাপনের মত শোভা পাইতে লাগিল।

যথা সময়ে রথে কবিয়া রাজকুমার বাহির হইলেন; যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করুন না, কেবল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সৌন্দর্য্য। পূর্ব্বদিনের আকস্মিক অভিজ্ঞতা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, তিনি সারথির দিকে তাকাইয়া মুগ্ধভাবে বলিলেন—সারথি, সংসার কত সুখের! তবে যে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দারিদ্র্যের কথা পড়ি, সেটা বুঝি উপন্যাস।

এমন সময় পথের এক পাশে—ও লোকটা কে? মুখে চোখে চকিত ভাব, গতি সন্ত্রস্ত, ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে মৃগশিশুর মত ভীত তাহার অবস্থা, খোলা ছাতি এদিকে ওদিকে মেলিয়া সর্ব্বদাই যেন নিজেকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছে? লোকটা কে? এই ঐশ্বর্য্যের মহাকাব্যের মধ্যে লোকটাকে একটা মারাত্মক ছাপার ভুলের মত দেখাইতেছে, তাই ত লোকটা কে?

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা ঋণী!

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋণ কাহাকে বলে?

সারথি—শোধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও শোধ করিবার অঙ্গীকার করিয়া টাকা লওয়াকে ঋণ বলে।

বিস্মিত রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন,—আমাদের কি ঋণ আছে?

সারথি—রাজপুত্র, রাজাদের ঋণের নাম জাতীয় ঋণ। যে রাজার রাজ্য ও জাতীয় ঋণ যুগপৎ না বাড়িতে থাকে সে রাজাই নয়!

রাজপুত্র—এখন ইহার পরিণাম কি?

সারথি—হয় জেল, নয় উন্মাদাগার, নয় সাহিত্যসেবা।

রাজপুত্র গম্ভীর হইয়া আদেশ করিলেন—রথ ফিরাও।

আগের দিনের ও আজিকার যুগল অভিজ্ঞতা মিলিয়া তাঁহার মানসাকাশের অর্দ্ধেক যেন অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

মর্ম্মাহত পিতা খবর শুনিয়া নটীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন।

৪

পরদিন রাজপুত্র নগরের উত্তরগামী পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন; পথের দুইদিকে সুন্দর দেহধারী সুপুরুষগণ দণ্ডায়মান; রাজপুত্র দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন,—সংসারে সুখ না থাকুক—স্বাস্থ্য আছে, প্রফুল্লতা আছে, যাহা হৌক, মন্দর ভাল। এমন সময়ে ফিরিবার মুখে দেখিতে পাইলেন, একজন মানুষ, প্রায় তাহাকে অমানুষ বলিলেই চলে।

বলিচিহ্নিত কপাল, শুষ্কগণ্ড, কোটরগত চক্ষু, শীর্ণ অধর, আধ-পাকা দাড়ি, কেবল উদ্ধত নাকটা উগ্র জয়ধ্বনির মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! ক্ষীণ দেহ, পদে পদে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত।

ভীত রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, ওই প্রেতোপম লোকটি কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা কেরাণী।

রাজপুত্র—কেরাণী কাহাকে বলে?

সারথি—যাহার আত্মহত্যার নাম চাকুরী।

রাজপুত্র—লোকটাকে প্রায় অন্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; কি করিয়া হইল?

সারথি—টাকার হিসাব রাখিতে রাখিতে।

রাজপুত্র—তাহার এতই যদি টাকা তবে এ দুর্দ্দশা কেন?

সারথি—টাকা ওর নিজের নয়।

রাজপুত্র—তবে কাহার?

সারথি—কাহার, তা আমিও জানি না—ও লোকটাও জানে না—কাহার টাকা, কিসের টাকা, কেন রাখা হইতেছে, কবে কি প্রকারে খরচ হইবে—উহার তাহা জানিবার উপায় নাই, ও কেবল অন্ধকার বদ্ধ ঘরে বসিয়া অঙ্কের পরে অঙ্ক পাত করিয়া গণনা করিয়া যাইতেছে; গণনা করিতে করিতে করিতে চক্ষু অন্ধ, স্বাস্থ্য নষ্ট, মন নিরানন্দ হইতেছে, অবশেষে হয় তো একদিন টাকার গাদার উপরে পেটের ক্ষুধা লইয়া হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়িয়া মরিবে। উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজন ওখানে আসিয়া বসিবে। ইহাই ইহার জীবনের—কিম্বা সত্যকথা বলিতে কি—মরণের ইতিহাস।

রাজপুত্র—তবে শুনিয়াছি, আইনের চক্ষে সকলেই সমান আইন উহাকে রক্ষা করে না কেন?

সারথি—সমান বলিয়াই তো রাজার এবং ওই লোকটার দুইজনেরই ভিক্ষা করা নিষেধ; ফুটপাতে শুইয়া থাকা নিষেধ; আত্মহত্যা করা নিষেধ।

রাজপুত্র নীরব রহিলেন। সারথি বলিয়া যাইতে লাগিল—যেন রাজা সর্ব্বদাই ভিক্ষা করিতে উদ্যত—কেবল আইনের ভয়ে পারিতেছেন না, যেন ফুটপাতে না শুইলে তাঁহার ঘুম আসে না, অথচ আইন বাদী; যেন আত্মহত্যা ছাড়া তাঁহার দুঃখের হাত হইতে মুক্তি নাই—কিন্তু ন্যায়ের দণ্ড উত্থিত।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্, রথ ফিরাও।

রাজপুত্র সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন—সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবল বেকার ঋণী ও কেরাণীতে পূর্ণ। জীবনের ইহাই তো পরিণাম, তবে এ সংসার ত্যাগ করা ভাল কিন্তু ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, কোন নূতন জীবনকে তিনি গ্রহণ করিবেন? সারা রাত্রি জাগিয়া এই চিন্তা তিনি করিয়াছেন।

পরদিন পুনরায় তিনি নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন—এবার দক্ষিণগামী পথে। আগে তিন দিন পথ-সজ্জায় প্রচুর খরচ হইয়াছে অথচ সে-পরিণামে ফল হয় নাই দেখিয়া এবার আর পথ সাজানো হয় নাই। তবে স্বভাবতই নগরের দক্ষিণ অঞ্চল সুসজ্জিত। রাজপুত্র সংসারের ভাল-মন্দ যাহা কিছু দৃশ্য দেখিতে চলিলেন। তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল —সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে—কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কোন আশ্রমকে গ্রহণ করা উচিত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার সংসার ত্যাগ করা হইতেছে না।

এমন সময়ে অদূরে—ওই কে যায়? তিনি চমকিয়া উঠিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ও লোকটা কে? মুখে হাসি, চোখে চশমা, মাথায় কেশদাম ও সীঁথি, গালে পাউডার ও অধরে সিগারেট, স্কন্ধে ভূলুণ্ঠিত চাদর, কোঁচায় যেন ধুলা ঝাঁট দিতেছে, জুতা জোড়া এত উজ্জ্বল যেন মুখ দেখা যায়, আর দুইপাশে তাহার অনুরূপ তরুণীগণ নানা বাদ্যযন্ত্র বহন করিতেছে, কাহারো কাহারো হাতে সুধার পাত্র। ওই লোকটা কে? দেয়ালে দেয়ালে ওই যে বিভিন্ন অবস্থার চিত্র উহা যেন ইহারই, চিরযৌবনরূপী এই লোকটি কি কন্দর্প?

সারথি বলিল—না রাজপুত্র, লোকটা ফিল্মষ্টার।

রাজপুত্র যেন আপন মনেই বলিলেন—কে বলিল—সংসারে সুখ নাই। এতদিন পরে রাজপুত্র যেন সুখের সন্ধান পাইয়াছেন।

সারথি বলিল—রাজপুত্র, সিনেমা অ্যাক্টরই আজকাল সমাজের আদর্শ। ছেলেরা উহারই মত করিয়া বই পড়িতেছে না, যুবারা উহারই মত করিয়া

জামা পরিতেছে, মেয়েরা সিনেমা-অভিনেত্রীদের মত করিয়া বস্ত্র পরিতেছে অর্থাৎ প্রায় না-পরিতেছে, সেই রকম করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সেইরূপ—

'ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'

আদর্শকে পালন করিতেছে। উহারাই এ যুগের অবতার। এ জীবনে দুঃখ নাই, জরা নাই, বার্দ্ধক্য নাই, শোক নাই, ঋণ নাই, স্বাধীনতার খর্ব্বতা নাই, ইচ্ছার প্রতিরোধ নাই, বোধ হয় মৃত্যুও নাই। কেবল হাসি, বাঁশী, গান, যৌবন, বসন্ত আর বঁধু, কেবল সখা আর সখী, তুমি আর আমি, আর কেবল—তা তা থৈ থৈ।

সারথির বর্ণনা শুনিয়া রাজপুত্রের একবার সন্দেহ হইল—সে বোধ হয় সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। রাজপুত্রের মনে হইল যে, এতদিনে দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় পাওয়া গেল।

রাজপুত্র বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আবার বন্ধন!

সেইদিন গভীর রাত্রে রাজপুত্র একাকী সংসার ত্যাগ করিলেন; সকলে ভাবিল রাজপুত্র কোথায় গিয়াছেন! তিনি সোজা দক্ষিণঅঞ্চলের পবিত্রারণ্য নামক সিনেমা কোম্পানীতে গিয়া যোগ দিলেন। এখনো তিনি নাম ভাঁড়াইয়া সিনেমায় অভিনয় করিতেছেন। এখন তিনি একজন বিখ্যাত ষ্টার কিন্তু মনে কি শান্তি পাইয়াছেন? নিকটবর্ত্তী সিনেমা অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

জি-বি-এস
ও
প্র-না-বি

আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। যে-সংবাদপত্র দেশ চালায়, আমি তাহাকে চালাই, অতএব কম লোক নই। পুরাণে আছে দধীচি মুনি অস্থি দিয়াছিলেন, তাহাতে বজ্র গড়িয়া ইন্দ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অনেক দৈত্য মরিয়াছিল। এখন, কোন্ পাহাড়ে হয় বাঁশ, তারা দিতেছে মর্ম্মাস্থি, টিটাগড় কাগজের কলে স্থূলভবজ্র গড়া হইতেছে, কিন্তু এবার আর দৈত্য মরে না, কারণ তাহারাই এই বজ্রের নিক্ষেপক। আমরা প্রত্যহ সকালে (সোমবার ছাড়া) সংবাদপত্রের বজ্র দেশময় নিক্ষেপ করিতেছি, আর কত নিরীহদের বিবাহ ভাঙিতেছে, কত বন্ধুর প্রণয় ভাঙিতেছে, কখনও দেশের লোক কাঁদিতেছে, কখনও ক্ষেপিতেছে। আমরা বড় কম লোক নই। ওদিকে পাহাড়ে বাঁশের বন ধ্বংস হইতেছে, বৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসিয়া নদী নালা বন্ধ হইতেছে, সারাদেশ অনুর্ব্বর হইতেছে। আর এদিকে মানুষের মন সেই বাঁশের প্রেতাত্মার তাড়নে ক্ষিপ্ত, মত্ত, শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। বাঁশ, মরিয়াও একি তোমার প্রতিশোধ!

কিন্তু সম্প্রতি মুস্কিলে পড়িয়াছি। আমরা সবাই অবশ্য ইংরেজী কাগজ হইতে অনুবাদ করিয়া খবর ছাপাই, তবে গোলদীঘির সংযোগী কাগজ কিনিয়া অনুবাদ করে, একটু তাড়াতাড়ি হয়; আমরা কাগজ চাহিয়া লইয়া অনুবাদ করি, দেরী হইয়া যায়; পিছাইয়া পড়িতেছি। সম্পাদক মহাশয় তাড়া দিতেছেন।

তাহা ছাড়া, এত নূতন খবর পাইবই বা কোথায়? একদিনের বাসি খবর পাঠকদের আর রুচে না। এত যুদ্ধ, এত বিমানধ্বংস, এত আত্মহত্যা পাই কোথায়? সত্য কথা বলিতে কি পৃথিবীর লোকের আত্মবিসর্জ্জনের ভাব তেমন আর যেন উগ্র নয়। এখন ভরসা ইউরোপের গোটা চার পাঁচ ডিক্টেটার; তাঁহারাই এখন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাইয়া সংবাদপত্রের

প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে পারেন। আমরা ভারতীয়েরা খবরের কাগজ পড়িবার জন্যই জন্মিয়াছি, তাহাতেও ইউরোপ বাদ সাধিলে নাচার।

আমি কম লোক নই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় আমার চেয়েও বড়, তাঁহার কড়া হুকুম নূতন সংবাদ চাই।

কি করি। একবার ভাবিতেছি একটা রিপোর্ট আগেই লিখিয়া রাখিয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরি। কিন্তু সে সংবাদ যে ছাপা হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিব! অতএব ভাবিতেছি,—মাকড়সা যেমন করিয়া নিজের রস দিয়া জাল বুনিয়া তুলে, তেমনই করিয়া চিন্তা-রসের দ্বারা সংবাদ বয়ন করিব। কবির আশ্বাস মনে পড়িল—"ঘটে যা তা সত্য নহে, যা ভাবিবে সেই সত্য—"

চিন্তার আবেগে সংবাদ আসিল না, ঘুম আসিল।

* * * *

কে যেন পিঠের উপরে হাত রাখিয়াছে, ধাক্কা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি এক সাহেব। চমকিয়া উঠিলাম, সাহেবকে দূরে দেখাই অভ্যাস, একেবারে এত কাছে? দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণ; চুল অল্প, দাড়ি বিস্তর, দুই-ই সাদা; চোখের ভুরু-জোড়া কপালের প্রান্তে উপরের দিকে বাঁকানো; নাকটা ঘুষির মত উত্থিত; মুখে অদ্ভুত হাসি; লোকটা যেন হাসি দিয়াই পৃথিবীকে দেখে—চোখ দিয়া নয়।

সংবাদপত্রের লোকের মনে প্রথমে যেকথা আসে তাহাই আসিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, পুলিশের লোক?

সাহেব বলিল, আন্তর্জাতিক পুলিশ। আমার লেখা পড় নাই।

বুঝিলাম সাহেব এদেশে নবাগত; কারণ আমরা লিখি বটে, কিন্তু পড়ি এ অপবাদ স্বয়ং পুলিশেও দেয় না। আমার মনের ভয়ও ভাঙিয়া গেল, সাহেব লেখে! সে আবার কি কথা? এ দেশে কোন সাহেবকে কখনও লিখিতে তো শুনি নাই!

সাহেব আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, আমিও সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলাম।

এখন?

এখন নাটক লিখি।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, সাহেব আমার চেয়েও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। একটা প্রকৃতিস্থ লোক কতখানি বিপন্ন হইলে তবে নাটক লিখিতে সুরু করে। হঠাৎ তাহার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইল, সাহেব নিশ্চয় Alms House-এর সভ্য।

সে বলিল, আমার সঙ্গে এস, নূতন খবর যদি চাও।—বলিয়া সে হিড়হিড় করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

ইস, কি কড়া হাত!

এক সময়ে ঘুষি-খেলার অভ্যাস ছিল।

এখন?

প্রয়োজন হইলে এখনও পারি।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সাহেবর অনুসরণ করিলাম।

*   *   *

একটা আদালতের মত বাড়ির সম্মুখে খুব ভিড়, ঢুকিয়া দেখি আদালতই বটে, বিচার চলিতেছে। উঁচু আসনে বিচারক বসিয়া ঘুমাইতেছে। পাশেই পেস্কার নীচু একটা চেয়ারে বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে, বোধ হয় ইষ্টনাম জপিতেছে। আসামীর কাঠগড়ায় জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুকজাতীয় একটা লোক, পরে বুঝিলাম ভিক্ষুকই বটে।

আসামীর উকীল বলিতেছে, হুজুর, আমার মক্কেল অতিশয় নিরীহ, সাধু-সচ্চরিত্র লোক, সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সমাজের কোন হানি সে করে নাই, অন্যের ধনের প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, রাষ্ট্রের আইন সে ভঙ্গ করে না। সমাজের আইন সে মানিয়া চলে। সে চোর নয়, বদমায়েস নয়, বিপ্লবী নয়, দাগী নয়, এমন কি সাহিত্যিকও নয়, সামান্য একজন ভিখারী মাত্র। দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র অপরাধ, কিন্তু সে অপরাধের জন্য দায়ী কে? আর যে-ই হউক, আমার মক্কেল নয়।

সরকার পক্ষের উকিল আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হুজুর দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় অপরাধ; অন্য সব অপরাধের মূল দারিদ্র্যে! দারিদ্র্যের জন্যই চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা,

আত্মহত্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সামাজিক অশান্তি; দারিদ্র্যের জন্যই রোগ এবং রোগের বিস্তার; এমন কি সাহিত্যের মূলও দারিদ্র্যে।

আসামী পক্ষের উকিল একবার মুখ খুলিয়াছিল, কিন্তু সরকারী উকিলের বাক্যের নায়েগ্রা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, হুজুর একবার শুনুন—

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিলেন, তুমি কি ভাব আমি ঘুমাইতেছি? অত চীৎকার না করিয়া ধীরে কথা বল। সে আবার টেবিলে মাথা রাখিয়া নিদ্রার ভঙ্গিতে বোধ হয় সব শুনিতে লাগিল।

সরকারী উকিল গর্জিয়া চলিল, হুজুর, দারিদ্র্যই মানুষের original sin; দারিদ্র্যই জীবনে মৃত্যু, দেবতা ও মানবের ভেদ ওই দারিদ্র্যের তারতম্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য সরাইয়া লইলে কালই দেবতারা এ উহার পকেট কাটিতে সুরু করিবে। আবার দরিদ্র্যকে ঐশ্বর্য্য দিন, সে আপনার আমার মত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত নাগরিক হইয়া উঠিবে। নিখিল পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্যই সমাজকে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে পলে পলে নীচের দিকে টানিতেছে, রোগের দিকে, কুশিক্ষার দিকে, অপরাধের দিকে, দুরতিক্রম্য মৃত্যুর দিকে। গ্রীক-সভ্যতার ধ্বংসের মূলে গ্রীক সমাজের ক্রীতদাস সম্প্রদায় ও তাহাদের দারিদ্র্য; রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূলও ওই একই স্থানে।

আসামীর উকিল বলিল, আমার বন্ধু যদি সাম্যবাদী হন, তবে ধন-বিভাগ করিয়া আমার মক্কেলের সঙ্গে সমান হয় না কেন?

বাদীপক্ষের উকিল বলিল, আমি কেন তাহার সমান হইতে যাইব? বরঞ্চ সে আসিয়া আমার সমান হউক, আপত্তি কি! আমি তাহার সমান হইলে পৃথিবীতে আর একটি দরিদ্র বাড়িবে, সে আমার সমকক্ষ হইলে জগতে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাড়িবে!

আসামীর উকিল বলিল, শুধু সম্ভ্রান্ত নাগরিক নয়, একজন উকিলও বটে।

আমরা দুই জন দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। সাহেব বলিল, ইহারা আমার নাটক পড়িয়াছে দেখিতেছি, আমাদের দেশে আমার নাটক হয়?

আমি বলিলাম, আমরা এখনও বর্গী, আলিবাবা, মোগল-পাঠানের যুগে আছি। ইংরেজী নাটক করিবার ফুরসৎ আমাদের কোথায়?

আসামীর উকিল বলিতে লাগিল, হুজুর, হইতে পারে যে দারিদ্র্য অশেষ দোষের কারণ,—কিন্তু সেজন্য আমার মক্কেল দায়ী নয়—কারণ দারিদ্র্য ও দরিদ্র ব্যক্তি এক নয়!

বাদীপক্ষের উকিল বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ধর্ম্মাবতার,—দারিদ্র্য এক প্রকার ব্যাধি এবং বিশেষ ছোঁয়াচে ব্যাধি। দারিদ্র্য ও দরিদ্রে ভেদ করিব কি উপায়ে—? দরিদ্রকে ছাড়িয়া দারিদ্র্য কোথায় পাওয়া যায়? ছোঁয়াচে ব্যাধি হইলে রোগীকে, যে রোগী যতই প্রিয়পাত্র হউক না কেন, যেমন স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয়, দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা তাহার বিষস্পর্শে সমাজ বিষাক্ত, কলুষিত, বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব আমি প্রার্থনা করি, সমাজের নামে, রাষ্ট্রের নামে, সমগ্র মানব জাতির নামে, এই ব্যক্তির উপরে আইনের চরম দণ্ড দান করিয়া সুবিচার করা হউক।

বিচারক মাথা তুলিয়া বলিল, আপনারা ভাবিবেন না আমি ঘুমাইতে-ছিলাম। গভীর চিন্তা ও গভীর নিদ্রার বাহ্যিক লক্ষণ এক রকম; আমি চিন্তা করিতেছিলাম মাত্র। পেস্কার বাবু—

পেস্কার বলিল, হুজুর ভাবিবেন না, আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলাম। ইষ্টমন্ত্র জপ ও আইনের উপধারাগুলির আলোচনা বাহ্যত একই রকম দৃষ্ট হয়; আমি উপধারাগুলির আলোচনা করিতেছিলাম মাত্র।

বিচারক রায় লিখিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে রায় পড়িল, দারিদ্র্যাপরাধ নিবন্ধন এই ব্যক্তিকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হউক, এবং এক বৎসর পরে এই ব্যক্তি যদি মাসিক একশত মুদ্রা আয় না দেখাইতে পারে, তবে ইহাকে পুনরায় আদালতে উপস্থিত করা হউক।

রায় শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ কোথায় আসিলাম! ইহা কি সনাতন ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষে দারিদ্র্য তো দোষের নয়, বরঞ্চ সে দেশে কে কত দরিদ্র হইতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা চলিতেছে! সাহেবটি মোটেই বিস্মিত হয় নাই,—সে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল চল অন্যত্র যাওয়া যাক।

একটা বাড়ীর সম্মুখে ভিড় জমিয়াছে। বাড়ীর দরজা আলো ও ফুলে

সাজানো। আমরা দুইজনে ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, বোধ হয় কাহারও জয়ন্তী হইতেছে।

সে বলিল, সে আবার কি?

আমি বলিলাম,—দেখ তোমরা যতই সভ্য বলিয়া গর্ব্ব কর না কেন, এখনও কোন কোন বিষয়ে পিছাইয়া আছ। জয়ন্তী মানে বড়লোকের সম্বর্দ্ধনা।

—সে তো মরিবার পরে করে।

আমি বলিলাম, আমরা মরিবার পরে মনে রাখি না, তাই আগেই করি!

সভায় ঢুকিয়া দেখি, মঞ্চের উপরে এক প্রবীণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সভাপতি, গলায় গলকম্বলের মত একরাশি মালা। আর পাশেই একটা লোক। কিন্তু লোকটা কে? কানে বিড়ি গোঁজা; চোখ দুটা লাল, চুল রুক্ষ, রোমাঞ্চিত দাড়ি; গায়ে আজানুলম্বিত সূক্ষ্ম পাঞ্জাবী, পরণে বোধ হয় লুঙ্গিই। ওই লোকটারই কি সম্বর্দ্ধনা!

সভাপতি উঠিয়া সভ্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ, আজ আপনারা এই মহাত্মার সম্বর্দ্ধনার জন্য সমবেত। ইনি এত স্বনামধন্য যে ইঁহার—পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। রজত-জয়ন্তীর কমিটির সম্পাদক একখানি মানপত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে মহিলাগণ একটি সঙ্গীত করিবেন।

সভাপতি মহাশয় চেয়ার গ্রহণ করিলে মহিলাগণ গান ধরিলেন—

বাতায়ন পথে যাতায়াত তব,
নহ তুমি নহ সমীরণ,
তস্কর বলে নিন্দুক যত
মনোচোরে বলে কবিগণ।
তোমার পরশে খোলে সিন্দুক
(পরের ছত্রটি গোলমালে বুঝিতে পারিলাম না)
হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙো অর্গল
সারানিশি করি জাগরণ।

সঙ্গীত ও করতালি থামিলে সম্পাদক মহাশয় কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া মানপত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

মহাত্মন্,

তোমাকে আমি সমগ্র জাতির নামে আদরে আহ্বান করিতেছি। তুমি যুগপৎ জাতির রুদ্ধচিত্ত ও বদ্ধতালা খুলিয়াছ; তুমি যুগপৎ জাতির হৃদয়-মন্দিরে ও ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ, তুমি যুগপৎ বাতায়ন ও দ্বারপথে প্রবেশ করিতে পার,—তুমিই ধন্য।

হে দেব,

দারিদ্র্যকে আমরা ঘৃণা করি; ঐশ্বর্য্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। নিরীহ-ভাবে দরিদ্র হইবার অপেক্ষা উগ্রভাবে তস্করবৃত্তিও শ্রেষ্ঠ।

হে বীর,

দারিদ্র্য প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে টানিতেছে—তুমি সেই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য যে-বৃত্তিকে বরণ করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় বীরের যোগ্য বটে। তুমি একাধারে মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়।

হে আদর্শবাদী,

আদর্শের জন্য যাহারা দুঃখবরণ করিয়াছে, তুমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবন ফুটপাত ও কারাগারের মধ্যে দোদুল্যমান। তুমি যুগপৎ এই দুইকেই জয় করিয়াছ। তোমার হস্ত চুম্বক হইতেও প্রবল, কারণ তাহা স্বর্ণ ও রজতকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তোমরাই রজত জয়ন্তী সার্থক।

হে ভাগ্যবান্,

স্বার্থক চৌর্য্যেরই নাম বীরত্ব। তুমি তস্করবৃত্তিতে ধরা পড়িয়া কারাগারে গেলে তোমাকে ঘৃণা করিতাম। কিন্তু যে হেতু তুমি নৈশ-অধ্যবসায়ে জানালার শিক ভাঙিয়া সিন্দুকের তালা ভাঙিয়া মালিকের মাথা ভাঙিয়া দিয়া ও পুলিশের আইন ভাঙিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ, কাজেই তুমি বীর, তুমি বীরোত্তম!

হে তস্করর্ষি,

তোমাকে রজত-জয়ন্তী সভার পক্ষ হইতে একটি সামান্য উপহার দিতেছি, কিন্তু ইহার প্রভাব সামান্য না হইতেও পারে। ভারতীয় সিঁধকাঠি অতি প্রাগৈতিহাসিক ধরণে প্রস্তুত; বৈজ্ঞানিক-যুগে তাহা প্রায় অচল; ইউরোপের কাছে এই আদিম সিঁধকাঠির জন্য আমরা মাথা নত করিয়া আছি।

তোমাকে আমরা ইউরোপীয় ধরণে রচিত সিঁধকাঠি উপহার দিতেছি। ইহার শক্তি প্রায় অলৌকিক, ইহার লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না, ইহা নানা নামে প্রখ্যাত। ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স, ডিরেক্ট ও ইন্‌ডিরেক্ট ট্যাক্সেশন্‌, কাষ্টম্‌স ডিউটি, হোমচার্জ, সুপার ট্যাক্স, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড, শিলিং রেশিও, টেরিফওয়াল, অটোয়া চুক্তি প্রভৃতি অসংখ্য ইহার নাম। হে প্রভু তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের কলঙ্ক দূর কর।

সম্পাদক মহাশয় মানপত্র পাঠ শেষ করিয়া একটি ভেল্‌ভেটের কৌটায় ভরা সিঁধকাঠি লোকটির হাতে দিলেন। করতালিতে কানে তালা লাগিয়া গেল।

সভাপতির আদেশে মহিলাগণ পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত থামিলে দেখা গেল লোকটি নাই। খোঁজ পড়িয়া গেল। এদিকে সভাপতি দেখিলেন তাঁহার পকেটের নিম্নার্দ্ধ নাই, সম্পাদকের আণ্ডার ওয়ারের পকেটটিও অন্তর্হিত; তখন 'ধর ধর' রব পড়িয়া গেল।

এতক্ষণ আমাদের কেহ লক্ষ্য করে নাই, এইবার অনেকে তাকাইতে লাগিল। সাহেব বলিল, গতিক ভাল নয়, বাইরে চল।

বাহিরে আসিলাম। সাহেব বলিল, সবাই যেরূপ তাকাইতেছে, মার-ধর করিতে, পারে, চল।

আমি বলিলাম আমাদের কি হাত নাই?

সে বলিল পা-ও-তো আছে।

বেশ, লাথিই মারিব।

সে বলিল, নির্ব্বোধ, লাথি মারিবে কেন? পালাও।

আমি বলিলাম, পলাইবার চেয়ে সত্য কথা বলিব।

সাহেব হাসিয়া উঠিল, মূর্খ, সত্য কথা বলিয়া জগতে কেহ স্বস্তি পাইয়াছে? সে আশা ছাড়।

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, তা বটে তোমরা তো একবার যীশুকে সত্যবাদিতার জন্যে পেরেক ঠুকিয়া মারিয়াছিলে। বোধ হয় এবার আসিলে আবার মারিবে।

সাহেব বলিল, না, যীশুর আর ভয় নাই। লোকটা বেশ নাম করিয়াছে।

এবার আসিলে, সে 'নাইটেড' হইতে পারে। সার্ যীসাস ক্রাইষ্ট। মন্দ শোনায় না! আমরা প্রথমে লোককে দণ্ড দিয়া দমাইয়া দিতে চেষ্টা করি, শেষে যখন তাহার খ্যাতি আর চাপিয়া রাখা যায় না তখন 'নাইটেড' করিয়া ফেলি। সত্য কথা কি যীশুর খ্যাতি এখন আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবার আসিলে সে 'নাইটেড' কেন পীয়ার-ও হইতে পারে। ব্যারন অব বেথেলহাম! কেমন শুনাইতেছে?

কয়েকটা লোক আমাদের দিকেই আসিতেছিল; তাহা দেখিয়া সাহেব লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; আমি ক্ষুদ্র শক্তিতে ছুটিলাম। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সাহেবের নামটি তো জানা হয় নাই; চীৎকার করিয়া বলিলাম, সাহেব তোমার নামটি তো বলিলে না? দেখিতে পাইলাম, সাহেব একখানি কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। আর বলিল, আজকার বর্ণনাটা তোমাদের কাগজে লিখিও, আর কিছু না হউক নূতন হইবে। কাছে গিয়া কার্ডখানা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে—জর্জ বার্নার্ড শ!

বাঘ্‌দত্তা

রাণুর সঙ্গে রজত রায়ের আজ তিনমাস ধরিয়া পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে, কিন্তু কিছু সুবিধা হইতেছে না। উভয় পক্ষ ধনী, বিবাহে কোন বাধা নাই, তবুও। রজত ইতিমধ্যে তিনবার মোটর ও চার বার বাসা বদল করিয়াছে, সাধনা অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে, সিদ্ধির দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আসল কথা, প্রত্যেকের একটি করিয়া মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে হাত না-পড়া পর্য্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই মর্ম্ম এত অবারিত যে হাত দিতেই সেখানে পড়ে। দু-এক জনের মর্ম্ম সত্যই রহস্যময়, আমাদের রাণু সেই দলের। রজত কি ছাই এত কথা বোঝে,

না তাহার ভাবিবার সময় আছে! সে নিয়ত আসে যায়, রাণুর সঙ্গে গল্প করে, গান শোনে, চা খায়; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মুখ গম্ভীর করিয়া মোটর হাঁকাইয়া বাড়ী ফেরে। অবশেষে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রজতের ব্যারিষ্টার পিতা তাহাকে শুভবিবাহের এক মাসের নোটিশ দিলেন। শুনিয়া রজত তৃতীয়তম মোটর হাঁকাইয়া রাণুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণুর কাছে খবর গেল। রজত বসিয়া টেবিলের বই লইয়া নাড়িতে লাগিল। হাঁ, একটা কথা অনাবশ্যক মনে করিয়া বলি নাই, বিশেষ, শুনিলে হয়ত রাণুর উপরে পাঠকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর গোপন করিয়া ফল নাই, রজতের হাতে এখনই তাহা ধরা পড়িবে। রাণু মহাভারত পড়ে পয়ারেবাঁধা খাস কাশীদাস গ্রন্থ।

বই নাড়িতে নাড়িতে রজত একখানি কাশীদাসী মহাভারত আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বহু অধ্যয়নের চিহ্ন তাহার মার্জ্জিনে। তাহাতে ছোট বয়সের মোটা অক্ষর ও বয়সের ছোট অক্ষর সবই আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দেখিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পাতায় লেখা আছে, "উঃ, অর্জ্জুন কত বড় বীর। নিশ্চয় অনেক বাঘ সে মারিয়াছে।" আবার, আর এক পতায় ভীমের বক রাক্ষস বধের ছবির তলায়,—"ভীম না জানি কত বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে।" এক, দুই, তিন! এক মূহুর্ত্তের মধ্যে রজতরঞ্জনের মনে একটা দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! এমন দিব্য-দৃষ্টি লাভ জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। রজত মহাভারত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত বসিল। রাণু প্রবেশ করিতে সে বলিয়া উঠিল—রাণু আমায় দিন পনের ছুটি দিতে হবে!

কেন?

একবার সুন্দর বনে যাব।

রাণু ঠাট্টার সুরে বলিল, জমিদারী দেখতে বুঝি,—নায়েবরা খুব চুরি করছে!

রজত বলিল, হাঁ, জমিদারীও দেখা দরকার আর ঐ সঙ্গে গোটা-কয়েক বাঘও মারব!

'বাঘ'। রাণু চমকিত হইয়া উঠিল। রজত আড়চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিল!

আপনি বাঘ মারতে পারেন? কই আমাকে ত বলেন নি?

রজত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, হামেশাই ত মারছি, কত বল্‌ব। আমি যে দু-বেলা ভাত খাই, তা-ও ত তোমাকে বলি নি?

রাণু বিস্মিত ভাবে বলিল, কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় না যে আপনি বাঘ মারেন।

রজত চেয়ার হেলান দিতে দিতে বলিল, আমাকে দেখে কার কি মনে হবে সেজন্য কি আমি দায়ী?

আপনি ক'টা বাঘ মেরেছেন?

হবে পঞ্চাশ ষাটটা।

তার মধ্যে রয়াল বেঙ্গল কটা?

রজত হাসিয়া বলিল, রয়াল বেঙ্গল ছাড়া ত আমি অন্য কিছু মারিনে।

রাণু এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার বসিয়া পড়িল।

রজত এতক্ষণ বসিয়াছিল, এবার দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল চলি তবে।

না, না, একটু বসুন, চা খেয়ে নিন।

চা হইল, জলযোগ হইল। রজত চা পান করিয়া বুঝিল আজকার চায়ে চিনির সঙ্গে রাণুর অনুরাগ মিশিয়াছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল, কি বল রাণু, তোমার জন্য একটা বাঘ আনব না কি?

রাণু বিস্মিত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, বেশ মজা হবে, বেশ মজা হবে।

রজত ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, জ্যান্ত না মরা?

রাণু ভীতভাবে বলিল, জ্যান্ত? না, না, সে হবে না।

আচ্ছা তবে মরাই আনব, এই বলিয়া রজত উঠিয়া পড়িল।

রাণু দুয়ার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল, একবার থামিল, একবার ইতস্ততঃ করিল, একবার কাশিল, তার পরে বলিয়া উঠিল, না-হয় বাঘ শিকারে নাই গেলেন।

রজত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণু লজ্জাজড়িত উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, তবে একটু সাবধানে থাকবেন। কবে আসবেন?

দিন পনর মধ্যে বলিতে বলিতে রজত আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল। রজত আজ রাণুর চোখে এমন একটি আশ্বাসভরা দীপ্তি এবং সিক্তপ্রায় আঁখিপল্লবের ভঙ্গী দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে সে বুঝিল বহুদিন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া দূরে দীপের আলো দেখিয়া কলম্বসের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল আর কি সান্ত্বনা পাইয়াছিল সেই হতাশ নাবিক সমুদ্রের জলে সদ্যভগ্ন বৃক্ষপল্লবের সাক্ষাতে।

দিন পনর পরে একদিন বিকালে রাণুদের বাড়ীতে রজতের মোটর আসিয়া থামিল। রজত লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাঁচ-সাত জন লোকের সাহায্যে টানিয়া নামাইল প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাণুর এতদিন উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল; দেখিল সত্য সত্যই তাহার বাঘ আসিয়াছে, একেবারে খাঁটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রাণু বিস্ময়ে, ভয়ে, গর্ব্বে, উল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে মাপিয়া দেখিল বাঘটা নাক হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত পাকা নয় ফুট! রজত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, রুমালে রক্ত কিসের? আপনার?

রজত হাসিয়া বলিল, বাঘের।

রাণু ছোঁ মারিয়া রুমাল কাড়িয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল; রজত তাহাকে অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে কি হইল জানি না। কিন্তু যখন রজত বাহির হইয়া আসিল তাহার মুখে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের গর্ব্ব ও তৃপ্তি।

রজত রাণুর বাপের কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তিনি তাহার করমর্দ্দন করিলেন। পরের দিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। রাণু রজতের বাগ্‌দত্তা বধূ।

বিবাহের দিন পয়লা বৈশাখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত প্রত্যহ আসে, গল্প করে, চা খায়, রাণুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ী ফেরে সেদিন

বাঘ শিকারের গল্প হইতেছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি গাছে উঠে বাঘ মার?

রজত সিগারেট টান মারিয়া বলিল, প্রথমে তাই করতাম, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মারি!

রাণু শিহরিয়া উঠিল।

আচ্ছা ক'টা গুলিতে বাঘ মরে?

একটা! দেখ নি বাঘটার দুই চোখের মাঝখানে গুলির দাগ!

রাণু দেখিয়াছে বটে।

অনেক রাতে রজত উঠিয়া গেল। রাণু যাইবার সময় তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে আর বাঘ মারিবে না। কিন্তু রজত কি প্রতিজ্ঞা করিতে চায়! শিকার না করিতে পারিলে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি! অবশেষে অনেক অনুযোগ, অনুরোধ, অভিমানের পরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া রজত প্রতিজ্ঞা করিল। রাণুর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল, রজত সত্যই সত্যই তাহাকে ভালবাসে নহিলে এত বড় ত্যাগস্বীকার করিবে কেন?

রাণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শিকারের কাহিনী, সুন্দরবনের গভীর অরণ্য; পালে পালে হরিণ, ইতস্তত বাঘ; যেখানে-সেখানে অজগর সাপের দল। তার মধ্যে একাকী বন্দুকধারী বীরপুরুষ। উঃ তার কল্পনা বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন স্বামী-সৌভাগ্য তার হইবে সে কখনই ভাবে নাই। রাত এগারটা বাজে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল; দেখিল রজত একখানি বই ফেলিয়া গিয়াছে, আধুনিকতম একখানা কন্টিনেনটাল উপন্যাস! রাণু বইটি লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইল। বইখানা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কি মন বসে! প্রথমেই দুই রুগ্ন যুবক-যুবতীর চা-পানের কাহিনী! কোথায় সুন্দরবনে বাঘশিকার, আর কোথায় চা-পানের গল্প! নাঃ, জীবনে যদি কোথাও রোমান্স থাকে তবে তাহা ওই সুন্দরবনে। রাণু বই ফেলিয়া দিল। পাতার মধ্য হইতে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। বোধ হয় রজত পাতায় চিহ্ন রাখিয়াছে মনে করিয়া রাণু কাগজখানা তুলিল, দোকানের বিল রজতের নাম দেখিয়া রাণু পড়িল, লেখা আছে—Supplied

to Mr. Rrajat Rsnjan Roy, a Royal Bengal tiger measuring nine feet head to tail for Rs. 350 only less advance Rs. 100---Rs. 250 only.

হাঁ, দোকানের বিলই বটে। একেবারে সাহেবী দোকানের ম্যানেজারের অস্পষ্ট নাম-সহিটি পর্য্যন্ত নির্ভুল। বিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাণুর মগজের মধ্যে এক ঝলক দিব্যদৃষ্টি খেলিয়া গেল এবং সে ভারি একটি স্বস্তি অনুভব করিল।

ইহার পরে ঘটনা সংক্ষেপে। পাঠক ভাবিতেছেন বিবাহ ভাঙিয়া গেল। বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। রাণু কোন দিন সে বিলের কথা রজতকে জানায় নাই। রজত মাঝে মাঝে শিকারে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। রাণু তাহাতে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিত। সে নয় ফুট দীর্ঘ বাঘটার মাথা রাণুর বসিবার ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইল। রানু তাহার তলায় লিখিয়া দিল—যতো-ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। রজত চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও আবার কি?

রাণু বলিল, ও একটা সখ!

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল ওটা বোধ হয় রাণুর একটা মহাভারতীয় সংস্কার।

নগেন হাড়ীর ঢোল

ডুম্, ডুম্, ডুম্ · ডুম্, ডুম্, ডুম্ ··আঃ, কান ঝালাপালা হইয়া গেল। রাত নাই, দিন নাই কেবলই কি ঢোলের বাজনা ভাল লাগে! সকালে, বিকালে, দুপুরে,—হাটে, বাজারে, পথে—সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কেবল ঢোলের শব্দ! গাঁয়ের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। না হয় সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—তাই বলিয়া কি কারো কাজকর্ম্ম নাই—আর নিষ্কর্ম্মা লোকেই এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে সারাদিন বসিয়া তাকে ঢোলের শব্দ শুনিতে হইবে!

সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না—সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলি—কখন কার দরকার হয়!

গাঁয়ের নাম জোড়াদীঘি—এক সময়ে মস্ত গ্রাম ছিল—এখন থাকিবার মধ্যে ঐ নামটি আছে। তখনকার কালে আদমশুমারির ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আদমি এতই ছিল যে উপকথার শিয়ালের কুমীরের ছানা দেখানোর মত এক জনতাকে সাতজনা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইত না।

গাঁয়ে জেলে ছিল এমন পঞ্চাশ-ষাট ঘর, নদী মরিয়া গেল, জেলেরা ঘরবাড়ী বেচিয়া বড় নদীর ধারে উঠিয়া গেল; পঞ্চাশ-ষাটখানা শূন্য ভিটা শীতের রোদে নদীর চরে একপাল কাছিমের মত পড়িয়া রহিল।

আট দশ ঘর ছুতোর ছিল—কতক মরিল, কতক জাতব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া চাষবাস ধরিল, কতক অন্য গাঁয়ে উঠিয়া গেল।

কামার ছিল চার-পাঁচ ঘর—জোড়াদীঘির জাঁতি ও কাটারি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। নদী মরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে তারা এমন দুর্বল হইয়া পড়িল যে হাতুড়ি চালাইবার ক্ষমতা আর তাদের রহিল না; প্রথমে হাতুড়ি গেল, তারপরে হাত গেল,—ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; বোধ হয় এখন তারা গোপনে শুধু সিঁধকাঠি তৈয়ারী করিয়া থাকে—গাঁয়ে বড় সিঁধেল চোরের উপদ্রব।

ধোপা কাপড়কাচা ছাড়িয়া চৌকিদারী চাকরী হইল; নাপিতের আর জাতব্যবসা করিয়া চলে না—সে বেগুন ও কলার চাষ আরম্ভ করিল, গাঁয়ের লোকে দাম দিতে গোলমাল করে দেখিয়া গোয়ালা ভিন্ গাঁয়ে দই ক্ষীর বেচিতে লাগিল—ইহা দেখিয়া গাঁয়ের কয়েকজন লোক অপমানিত বোধ করিয়া এক দিন রাত্রে তাকে ধরিয়া মারিল—পরের দিন সে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নাজিরপুর চলিয়া গেল।

গ্রামের জমিদারের অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল, কিন্তু নদীর সঙ্গেই সব যোগ—নদী মরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা মরিতে লাগিল—জমি পলাতক পড়িতে লাগিল—খাজনা অনাদায় হইল—ক্রমে জমিদারির ক্ষীণ স্রোত শনৈঃ শনৈঃ মহাজনের সিন্দুক-সঙ্গমের অভিমুখে চলিল—এখন তার শুধু নামটা

আছে, আর আছে পৈত্রিক প্রকাণ্ড বাড়ী—চুণকামের অভাবে প্রতি বছর তার মুখ আরও একটু করিয়া কালো হইতেছে।

গ্রামের এ অবনতির জন্য দোষ কার?

সকলে একবাক্যে বলে—অদৃষ্ট! কিন্তু পদ্মায় নাকি কোথায় একটা প্রকাণ্ড পুল বাঁধা হইয়াছে—দুই ধারে পাথর ঢালিয়া পাহাড়-প্রমাণ উঁচু করা হইয়াছে, জোড়াদীঘির নদীর মুখ পুলের উজানে—সেখানে মস্ত চড়া পড়িয়াছে—দেখিতে দেখিতে পঁচিশ বছরের মধ্যে নদী শুকাইয়া গেল। আমরা জানি গ্রামের ধ্বংসের মূলে ঐ পুল—লোকে বলে অদৃষ্ট—কি জানি হইতেও পারে—এদেশে সবই সম্ভব!

এবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি জন্য গাঁয়ে লোক সারাদিন ঢোলের শব্দ সহ্য করে। আগে অনেক ঘর হাড়ী ছিল—তারাই বাজানদারের কাজ করিত। একবার বৈশাখ মাসে কলেরা লাগিল, (পল্লী-অঞ্চলের ছয় ঋতুর প্রভেদ ছয় ব্যাধির দ্বারা বোঝা যায়) হাড়ী-পাড়া সাফ হইয়া গেল—কেবল রমেশ হাড়ীর ছয় বছরের নাবালক ছেলে আর স্ত্রী বাঁচিল। ছেলেকে সঙ্গে করিয়া রমেশের স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—এ দশ বছর গাঁয়ে ঢুলি ছিল না—পালপার্ব্বণের সময় লোকে বিপদে পড়িত—অনেক বেশী খরচ করিয়া অন্য গ্রাম হইতে ঢুলি আনিতে হইত।

হঠাৎ আজ কয়েক দিন হইল রমেশ হাড়ীর ছেলে নগেন গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সে আর মামার বাড়ী থাকিতে রাজী হইল না।

প্রথমে প্রতিবেশীরা তাকে চিনিতে পারিল না—তাদের দোষ দেওয়া যায় না, ছয় বছরের ছেলে দশ বছর পরে ফিরিলে চেনা সহজ নয়। নগেন আত্মপরিচয় দিল, প্রতিবেশীদের রমেশকে মনে পড়িয়া গেল—শুধু তাই নয়, সকলেই সহসা নগেনের মুখে, চোখে, হাবভাবে, কথা-বার্ত্তায় রমেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। কেহ বলিল—রমেশই যেন ষোল বছরের হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিল—হাজার লোকের মধ্যেও তাকে রমেশের ছেলে বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। নগেন প্রতিবেশী-

দের দৃষ্টিশক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিল—কিন্তু জানিত না আরও বিস্ময় তাহার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

নগেনের মা জোড়াদীঘি ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যাইবার সময়ে তৈজস, খান-দুই তক্তপোষ, একটা কাঠের সিন্দুক এবং একটা ঢোল প্রতিবেশীদের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল—নগেন সেই পৈতৃক সম্পত্তিগুলি দাবি করিতেই প্রতিবেশীদের নানা রকম অনিবার্য্য কাজ মনে পড়িয়া গেল—তারা মূঢ় নগেনকে ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

তারপরে নগেন তাগিদ আরম্ভ করিল,—হাঁটাহাঁটি করিল কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু নশ্বর তৈজসপত্র আর ফিরিয়া পাইল না। তার সবচেয়ে লোভ ছিল ঐ সিন্দুকটার উপরে—বহুদিন সে মার মুখে পৈত্রিক সিন্দুকের কথা শুনিয়াছে; তার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সিন্দুকটার মধ্যে তার পিতার সারা জীবনের সঞ্চয় রহিয়াছে—একবার তাহা পাইলে তার আর অভাব-অভিযোগ থাকিবে না।

তিনু ধোপার (এখন সে চৌকিদার) বাড়ীতে সিন্দুকটা ছিল; নগেন দাবি করিতে সে স্পষ্ট বলিয়া দিল হ্যাঁ একটা কাঠের বাক্স ছিল বটে ওইখানে প'ড়ে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না—বোধ হয় উই ইঁদুরে কেটে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সংসারের কোন বস্তুই অবিনশ্বর নয়, এই ঘটনায় নগেন তার প্রথম প্রমাণ পাইল—সে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সংসারে সবাই অসাধু নয়। মোতি ছুতোর একদিন বিকাল বেলা একটা ঢোলের খোল আনিয়া নগেনকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তার মা যাইবার সময়ে এই খোলটা তার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল—এত দিন সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; এ দায়িত্ব আর সে বহন করিতে পারে না—যার জিনিষ সে গ্রহণ করুক। এই বলিয়া সে অতি জীর্ণ উইয়েকাটা ঢোলের কাষ্ঠ-গোলকটি নগেনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল—নগেন খোলের ফাঁকের ভিতর দিয়া নদীর ওপারের ঢালু মাঠের বাবলা বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন সে খোলটা ঘাড়ে করিয়া জমিদার-বাড়ীতে গিয়া জমিদার তারানাথ বাবুর কাছে আত্মপরিচয় দিল। তারানাথবাবু রমেশকে জানিতেন

নগেন ফিরিয়া আসাতে তাঁর এক ঘর প্রজা বাড়িল, কিছু আয়বৃদ্ধি হইল, মানসাঙ্কে বিদ্যুতের মত ইহা খেলিয়া গেল; তিনি তাকে ঘর তুলিবার জন্য সাহায্য করিলেন—আর ঢোলকটা চামড়া দিয়া আচ্ছাদন করিয়া লইবার জন্য নগদ পাঁচসিকা তার হাতে দিলেন।

নগেন লক্ষ্মীপুরের হাটে গিয়া খোলাটাকে পালিশ করিয়া রং করাইয়া লইল; মুচি দিয়া চামড়া লাগাইল—আর পালকের সাজ পরাইয়া ঢোলকটাকে একেবারে নূতন করিয়া ফেলিল। তারপরে সগৌরবে সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। গায়ের লোক নগেন হাড়ীর ঢোল দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক এত দিনে গাঁয়ের বাজনার অভাব দূর হইল।

২

নগেন হাড়ীর ঢোলের অবিরাম বাজনায় গাঁয়ের লোকে বিরক্ত হইলেও এই সব নানা কারণে সকলে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

হরিচরণ জোড়াদীঘির একজন জালহীন জেলে, চাষবাস করিয়া খায়। অন্য জেলেরা গ্রাম ছাড়িয়া গেল, হরিচরণ যাইতে পারিল না; লোকের কাছে সে বলিয়া বেড়াইল, সাতপুরুষের ভিটা কি ত্যাগ করা যায়! আসল কথা অন্য রকম: হরিচরণ গাঁজা খায়, জোড়াদীঘি ছাড়া আবগারির দোকান আশপাশের গাঁয়ে নাই, কাজেই সেই জোড়াদীঘি ছাড়িতে পারিল না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে সে বাজারে আবগারির দোকানের দিকে যায়—ফিরিবার সময়ে তুরীয় অবস্থায় ফেরে; এখন, বাজারের পথের পাশেই নগেন হাড়ীর ঘর। সেদিন সন্ধ্যায় হরিচরণ বাজার হইতে ফিরিতেছে, এমন সময় তার কানে গেল—ঢোলের ডুম্, ডুম্, ডুম্। হরিচরণ ঢোলের তালে তালে বলিয়া উঠিল—ডুম্, ডুম্, ডুম্; এক বার, দুই বার, তিন

বার। নগেন রাগিয়া গিয়া নিষেধ করিল—জেলেরা পো ঠাট্টা ক'রো না বলছি। জালিকপুত্রের তখন চতুর্থ অবস্থা; সে উচ্চতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ডুম্‌, ডুম্‌, ডুম্‌।

নগেন দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল, নামিয়া আসিয়া ঢোলের কাঠি হাতে তার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—ফের ঠাট্টা?

হরিচরণ ঈষৎ রাগিয়া উত্তর দিল—তোর ঢোলে তুই যা খুশী বলিস, আমার মুখে আমি যা খুশী বলব, ঠেকায় কে!

ঠেকাই আমি—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ নগেন ঢোলের কাঠি দিয়া হরিচরণের পিঠে আঘাত করিল। অমনি যায় কোথা—দুই জনে হাতাহাতি বাধিয়া গেল; হরিচরণের বয়স বেশী, তাতে নেশাগ্রস্ত, সে পড়িয়া গিয়া আহত হইল; কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া দুই জনকে নিরস্ত করিল।

পরদিন গাঁয়ের লোকে ঘটনা শুনিয়া রাগিয়া গেল, কেহ বলিল—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা; কেহ বলিল—যত বড় ঢোল নয় তত বড় বোল। হরিচরণ পিঠের আঘাত স্মরণ করিয়া বলিল, যত বড় কাঠি নয় তত বড় ঘা। কিন্তু কেহ নগেনকে কিছু বলিতে সাহস করিল না সে জমিদারের অনুগৃহীত জীব।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জমিদারের প্রথম পৌত্রের জন্ম হইল; নগেনের বাজনা এর আগে কেবল দিনে চলিত, এবার অহোরাত্রব্যাপী হইয়া উঠিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত কর্তার নাতির ভাতে বাজাতে হবে না! তাই হাতটা সই ক'রে নিচ্ছি। বড়লোকের ব্যাপার, বাজনা খারাপ হ'লে লোকে বলবে কি?

হরিচরণের ঘটনাকেও লোকে প্রয়োজনের আশায় সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আর একটা ঘটনায় লোকের সে-আশাও ভঙ্গ হইল। রতন মুচির ঘর গাঁয়ের প্রান্তে; লোকটা ভালমানুষ অর্থাৎ জিনিষ লইয়া নগদ দাম দেয় এবং জুতা সারিয়া দিয়া পয়সার জন্য তাগিদ করে না। এ হেন রতনের একটি পুত্র-সন্তান হইল—গাঁয়ের লোক উল্লসিত হইয়া উঠিল, আশা করিল রতনের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ধারা তার পুত্রের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

নাতি জন্মিবার পর হইতে অদূরবর্ত্তী অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য ঢোলে নূতন নূতন বোল তুলিতে প্রয়াস করিত; ঢোলের সাহচর্য্যে তার সময় আনন্দে কাটিয়া যাইত, নিসঙ্গতা সে অনুভব করিত না!

৪

তারানাথবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কাছাকাছি একদিন জোড়াদীঘির বাজারে সোরগোল পড়িয়া গেল। জমিদারপক্ষ হইতে প্রথমে ব্যাপারটা চাপিয়া দিবার চেষ্টা হইল—বেসরকারী ভাবে টাকা দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার, সংক্ষেপে ঘুষ দিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই ফল ফলিল না; ক্রমেঘটনা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—মালেক জমিদারের পক্ষ হইতে লোক ও আদালতের পেয়াদা তারানাথবাবুর জমিদারি নীলাম করিতে আসিয়াছে।

তারানাথবাবু প্রতিপত্তিশালী লোক—সেজন্য অপর পক্ষে আয়োজনের ক্রুটি করে নাই; চার-পাঁচজন নিজ পক্ষের পাইক, দুই তিনজন চাপরাশধারী আদালতের পেয়াদা ও নিশানদার সঙ্গে ছিল। তারা বাজারের এক দোকানে ঘাঁটি গাড়িয়া একজন ঢুলীর সন্ধান করিতে লাগিল।

সকলেই জানেন যে এ সব ব্যাপারে ঢুলী ঘটনাস্থলে আসিয়া সংগ্রহ করা হয়, সঙ্গে করিয়া কেহ আনে না; আরও জানা উচিৎ যে অধিকাংশ সময়েই ঢুলীর উল্লেখ কাগজেপত্রেই হয়, বাস্তবে তার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে, বিশেষ যেখানে অপর পক্ষ প্রবল, পরে মামলা-মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে, সে-সময় ঢুলীকে বাস্তব রঙ্গমঞ্চে ডাক পড়ে; ঢুলী আসিয়া নগদ দক্ষিণা লইয়া আদালতের পেয়াদার মন্ত্র-আবৃত্তির সঙ্গে ঢোলে কয়েক ঘা দিয়া দিয়া যায়।

আদালতের পেয়াদা জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে ঢুলী আছে কি না?

সকলে সমস্বরে বলিল—হাঁ! নাম তার নগেন হাড়ী—

তিনু ধোপা (সম্প্রতি সে চৌকিদার) নগেনকে ডাকিতে গেল। যে-জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য আজ সে কয়েক মাস

হইল প্রস্তুত হইতেছে, তার সম্পত্তি নীলামের জন্ত ঢোল বাজাইতে হইবে শুনিয়া নগেন বলিল তাহার শরীর ভাল নাই, সে যাইতে পারিবে না।

তিনু ফিরিয়া গেলে অপর পক্ষের কর্ম্মচারী নগেনের বাড়ী আসিল। সে নগেনের সম্মুখে নগদ আড়াইটা টাকা রাখিয়া বলিল—ওহে বাপু একবার চল—বেশী কষ্ট করতে হবে না। ঐ বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার কয়েক বাজিয়ে দিলেই চলবে।

নগেন টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—যেদিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম হবে সেদিন ডেকো, বিনা-পয়সায় বাজিয়ে আসব।

অপর পক্ষের লোক রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আ মলো যা—ছোঁড়ার যে ভারি তেজ! ভালোয় ভালোয় যাবি তো চল—নইলে আদালতের পেয়াদা এসে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবে!

নগেন বলিল—যা তোর বাপকে ডেকে আন্।

অপর পক্ষের কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল—বোধ হয় তার পিতাকে আনিবার জন্তই।

ব্যাপার শুনিয়া আদালতের চাপরাশী লাল হইয়া উঠিল অর্থাৎ পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া লইল—খাকি জামার উপরে চাপরাশটা বাঁধিয়া লইল—এবং ব্রিটিশ আইনের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্তে সকলকে লইয়া নগেনের বাড়ীর দিকে চলিল।

সকলে নগেনের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল সে উঠানে দিব্য নিশ্চিতভাবে বসিয়া একখানা সান্‌কিতে করিয়া পান্তাভাত খাইতেছে।

চাপরাশী বলিল এই বেটা চল্ জানিস কোম্পানীর কাজ।

নগেন শান্ত ভাবে বলিল—চল যাচ্ছি। খেয়ে নি।

সকলে অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল কোম্পানীর কি মহিমা! যে-কাজ নগদ আড়াই টাকায় সম্ভব হয় নাই, তাহা পেয়াদার উপস্থিতি মাত্রেই সম্ভব হইল!

নগেন আহার শেষ করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিল—চল, কোথায় যেতে হবে।

চাপরাশী গর্জ্জন করিয়া বলিল—নে ঢোল কাঁধে নে।

নগেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলিল—ঢোল! ঢোল তো আমার নেই।

নাই! লোকটা বলে কি! সকলে চমকিয়া উঠিল।

তিনু বলিয়া উঠিল—পেয়াদা সাহেব মিথ্যা কথা! ঢোল ছাড়া ও বাঁচবে কি ক'রে? নিশ্চয়ই ওর ঘরের মধ্যে আছে।

পেয়াদার হুকুমে দু-তিন জন তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় ঢোল আছে।

কিন্তু কোথাও ঢোল পাওয়া গেল না। পেয়াদার হুকুমে ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল—কোথাও ঢোল নাই।

অবশেষে একজন মাচার নীচে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে! পেয়েছি! সে ঢোলটা টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু একি! সবাই অবাক্ হইয়া গেল। এ যে চামড়া-কাটা, খোল-ফাটা, পালক-ছেঁড়া, কাঠ চামড়া আর পালকের একটা স্তূপ। এই কি নগেনের বহু সাধের ঢোল!

পেয়াদা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এই বেটা তোর ঢোল কোথায়?

নগেন হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—উই যে! তার পরে বলিল চল কোথায় যেতে হবে।

অপর পক্ষের লোকেরা আশাভঙ্গ হওয়াতে চটিয়া বলিল—নে, নে ভাঙা ঢোল নিয়ে আর যেতে হবে না।

নগেন শান্তভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—যে-দিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম করবার দরকার হবে, সে দিন ডেকো, ভাল ঢোল নিয়ে যাব, পয়সা দিতে হবে না।

রাগে ও অপমানে পেয়াদার লাল পাগড়িটা খসিয়া পড়িয়াছিল, সে সেটাকে বাঁধিতে বাঁধিতে সঙ্গীদের বলিল—চল। নগেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—নেব বেটা তোকে দেখে!

নগেন বলিল—আর ঢোল তৈরী করলে তো!

সত্যই তারপর হইতে নগেন ঢুলি হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিল!

ভেজিটেব্‌ল বোম

আজ আমার এ দুর্মতি কেন হইল? সকাল বেলাতেই কেন নেশা করিয়া বসিলাম? সন্ধ্যাবেলাতে আমার আফিং খাইবার অভ্যাস, আজ কেন সকাল বেলাতেই খাইলাম? যদি নেশা করিলাম, কেন ঘরে পড়িয়া থাকিলাম না? কেন পথে বাহির হইতে গেলাম। আর যদি পথেই বাহির হইলাম কেন মত্তি গোয়ালিনীর বাড়ীর দিকে গেলাম না? কেন আমার অভ্যস্ত পা দুটি কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীর দিকে আমাকে লইয়া গেল না? আমাকে কেন কাউন্সিল-ভবনের সম্মুখে লইয়া আসিল?

একি দেখিলাম! জীবনে এ দৃশ্য আর দেখিব না! অফিঙের বাপেরও সাধ্য নাই যে এ দৃশ্য আমাকে আর দেখাতে পারে। আর আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী যদি এ দৃশ্য দেখিলাম তো তখনই মরিলাম না কেন? মরিতে লিখিতে গেলাম কেন?

দেখিলাম বাঙলার কাউন্সিল গৃহে ধীরে ধীরে, তোমরা ভাবিতেছ স্বর্ণ-প্রতিমা উদিত হইতেছে? না তাহা দেখি নাই, কাউন্সিল গৃহে প্রতিমা দেখাইবার মত শক্তি আফিঙের নাই। দেখিলাম ধীরে ধীরে পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ লোকেরা, দুর্দ্ধর্ষ ডিক্টেটাররা, জাঁদরেল সব সেনাপতিরা কাউন্সিল গৃহের কাছে সমবেত হইয়াছে।

দেখিলাম কালো শার্ট-পরা মুসোলিনী ও কটা শার্ট-পরা হিট্‌লার উমেদারের মত দণ্ডায়মান; জেনারেল ফ্রাঙ্কো (শার্টের কি রঙ হইবে এখনও ঠিক করিতে পারে নাই। আপাততঃ রক্তে লাল) ও লর্ড হালিফাক্স আর এক কোণে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। অদূরে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া, একটা ঘাসের বোঝা ঠেস দিয়া ষ্টালিন কড়া কড়া তামাকের পাইপ টানিতেছে আর মাঝে মাঝে সন্দেহের সঙ্গে কালো শার্ট ও কটা-শার্টের দিকে তাকাইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিক হইতে হন্ হন্ করিয়া ও কে আসিতেছে? লম্বা হেন লোকটা—মুখ শুকাইয়া চুপসাসিয়া গিয়াছে! চেনা চেনা চেহারা? কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম—ওমা এযে চেম্বারলেন সাহেব, বগলে

একটা ইংলণ্ডের ইতিহাস; একবার ষ্টালিনের দিকে চাহিয়া হাসিল—আবার ফ্রাঙ্কোর দিকে চাহিয়া হাসিল; ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল সে দুজনের দিকেই। একটা ষ্ট্যাচুর আড়ালে কে যেন চিনা বাদাম ভাজা খাইতেছিল, কাছে যাইতেই মুখে আঙুল দিয়া শব্দ করিতে নিষেধ করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই ইঙ্গিতে হিট্‌লারকে দেখাইয়া দিল; চেহারা দেখিয়া লোকটাকে ডক্টর ডস্‌নিগ বলিয়াই মনে হইল।

একটু পরে ইডেন-উদ্যানের দিক হইতে দুইজন লোককে আসিতে দেখিলাম; একজনের মুখ চাঁদের মত গোল, তবে চাঁদের কলঙ্ক নাই, গোঁপ-দাড়ী কিছুই ওঠে নাই; হাতে সকাল বেলাকার কাগজ ছিল, চেহারা মিলাইয়া লইলাম, লোকটা চিয়াং কাইশেক, তার সঙ্গী আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

এরা ছাড়া আরো অনেক লোক আছে, তবে তাদের দিকে বড় কেহ তাকাইয়া দেখে না; তারা সব ছোট শরীকের মালিক বা নায়েব—এদের মধ্যে হোজা ও হাইলে সেলাসীকে কেবল চিনিতে পারিলাম।

ভারি ভীড় জমিয়া গিয়াছে; কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া একটা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার চেহারা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; অনুসন্ধান করিবার জন্য পকেটে হাত চালাইয়া দিল—অন্যদিক দিয়া তার হাত বাহির হইয়া আসিল। তখন লোকটা হতাশ হইয়া আমার পিতার সম্বন্ধে একটা শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া ধাক্কা দিয়া আমাকে সরাইয়া দিল—আর একটু হইলেই মুসোলিনীর ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছিলাম!

অনেক জিজ্ঞাসা করার পরে যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই:—

ইউরোপের লোকেরা সম্প্রতি যুদ্ধ করা ছাড়িয়া দিয়াছে। দু' হাজার বছর তারা যুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছে যুদ্ধে কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না, যুদ্ধে মানুষ মরে, ব্যয় বহুত, খরচ পোষায় না; যুদ্ধ আজকাল বিলাসিতা মাত্র! বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয়-ধর্ম্মপ্রচারে যাহা সম্ভব হয় নাই, পকেটে টান পড়িতেই তাহা সম্ভব হইয়াছে, ইউরোপের লোকের বুদ্ধি, হৃদয় সব ওই পকেটে; তারা ধার্ম্মিক বটে কিন্তু তার চেয়েও বেশী হিসাবী।

কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেই তো আর সমস্যা ফুরায় না, সম্প্রতি মস্ত

এক সমস্যা ইউরোপকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে উত্তরমেরুর এস্কিমোদের খেলার ঝুনঝুনী কে বেচিবে এই লইয়া হিট্‌লার ও ষ্টালিনের মধ্যে মন কষাকষি বড় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। দু'জনেই বলিতেছে খেলিতে না পারিয়া এস্কিমোরা নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপাতে যাইতেছে, তাদের উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে ডিক্টেটারদ্বয় ঘুমাইতে পারিতেছে না। দু'জনের অনেক পরামর্শদাতা জুটিয়া গিয়াছে।

মুসোলিনী হিট্‌লারকে বলিল ওদের মাল জাহাজে যাইতেছে, তুমি এরোপ্লেনে পাঠাও আগে পৌঁছিবে। তাতেও ওরা যদি না কেনে তবে গোটাকতক বোমা ফেলিলেই চলিবে। ইউরোপের বাহিরে এখনো যুদ্ধে ফল পাওয়া যায় আবিসিনিয়ার কথা মনে করো।

চিয়াং কাইশেক ষ্ট্যালিনকে বলিল তোমাদের ঝুনঝুনির আওয়াজ জ্ঞানের স্বরলিপির মত ও'তে অনেক শিক্ষা হয়, ওরা নিশ্চয় কিনিবে! চেম্বারলেন উভয়কে বলিল—আগে এ বিষয়ে একটা কনফারেন্স বসানো যাক। তত দিন ওখানে কারোই বিক্রি করিতে গিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া তলে তলে নিজের দেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে এক জাহাজ ঝুনঝুনী লইয়া যাইতে সে হুকুম দিল। পথের মধ্যে ফ্রাঙ্কো সে জাহাজ ফুটা করিয়া দিয়াছে; চেম্বারলেন ও হালিফ্যাক্স সবচেয়ে উঁচু গলা করিয়া বলিতেছে, যারা অন্যায় ব্যবসা করিতে চায় তাদের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে।

সকলেই নানা রকম কথা বলিতেছে—যাদের লইয়া এত কাণ্ড, তাদের কথা কেউ ভাবিতেছে না: কারণ ঝুনঝুনী না কেনাতেই এস্কিমোরা সভ্য হইতে পারিতেছে না; তাদের সভ্য না করিলে ইউরোপের শান্তি নাই।

অবশেষে সকলে মিলিয়া ঠিক করিল কাউকে মধ্যস্থ মানা যাক! কিন্তু কে মধ্যস্থ হইবার উপযুক্ত লোক?

চেম্বারলেন বলিল—ইতিহাস পড়িয়া দেখ, আমরা চিরকাল জগতের মধ্যস্থতা করিয়া আসিতেছি; প্রয়োজন হইলেই আমরা কমিশন বসাইয়া থাকি। ভাবিয়া দেখ—আবিসিনিয়া লড়ায়ের সময় কেমন কমিশন বসাইয়া ছিলাম, ইটালীর হুঁকো কল্কে বন্ধ হয় আর কি। কিন্তু ইতিমধ্যেই

আবিসিনিয়ার জয় হইয়া গেল নতুবা কমিশন ঠিক ব্যবস্থাই করিত। এই বলিয়া আড়চোখে একবার মুসোলিনীর দিকে তাকাইল—'ইল-দুচে' রুমাল মুখে দিয়া আসিল।

চেম্বারলেন বলিতে লাগিল—আবার দেখ স্পেনের ব্যাপার লইয়া কেমন কমিশন বসাইয়াছি। অবশ্য ফ্রাঙ্কো ধীরে ধীরে জিতিতেছে, কিন্তু তাহা কি আমাদের দোষ?

ফ্রাঙ্কো হ্যালিফ্যাক্সের হাতে একটু চাপ দিল।

চেম্বারলেন—দেখিও আমরা চীন জাপানের যুদ্ধেও কমিশন না বসাইয়া ছাড়িব না।

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'নো কমিশন'।

চেম্বারলেন দেখিল জাপানের জেনারেল মিৎসুই।

জাপানীটার ব্যবহারে উপস্থিত সকলে অপমান বোধ করিল কিন্তু চেম্বারলেনের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অম্লানমুখে বলিল—কমিশন না হয়, কমিটি বসাইব; ইংরেজী ভাষা সেক্সপিয়াবের ভাষা—ও-তে শব্দের অভাব নাই।

জাপানীটা আবার বলিয়া উঠিল—'নো কমিটি'।

চেম্বারলেন—তবে নন্ ইণ্টারভেনশন।

মিৎসুই গর্জ্জন করিয়া উঠিল—'নো নাথিং!

হ্যান্দস অফ্ ইউ ইউরোপীয়ান!'

সকলে দেখিল বেগতিক, কিন্তু মনে মনে বেঁটে জাপানীটাকে ভয় করে, বলিল—আচ্ছা থাক; ওরা ইণ্টার্ণনেশন, ওদের মধ্যে গিয়া কাজ নেই!

সকলের উক্তি শুনিয়া চিয়াং কাইশেক শক্ত করিয়া ষ্ট্যালিনের জামার আস্তিন টানিয়া ধরিল।

ফলে এই দাঁড়াইল যে, কেহ ইংরেজের মধ্যস্থতা মানিতে রাজী হইল না। তখন সকলে ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীতে মধ্যস্থ হইবার যোগ্যতম লোক কে? কার রাজ্য নাই, কাজেই রাজ্য বিস্তারের আশা নাই? কার ব্যবসা নাই, কাজেই এস্কিমোদের মধ্যে ঝুনঝুনী বেচিবার আগ্রহ নাই?

কার অর্থ নাই, কাজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই? কে মূর্খ অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ? কে রুগ্ন অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? কে পরাধীন অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির স্বার্থকে বড় মনে করে?

তখন সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল এমন জাতি এ পৃথিবীতে একটা মাত্র আছে—বাঙালী। তাই আজ সকলে বাঙলার কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত —বাঙালী হিটলার ও ষ্ট্যালিনের মনোমালিন্য বিনা যুদ্ধে মিটাইয়া দিবে— বাঙলার গৌরবের চরমতম মুহূর্ত্ত সমাগত।

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী এই ভার আনন্দে গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, বোমা বন্দুক ছাড়া এ কাজ তিনি করিয়া দিবেন; সকলেই ভাবিতেছে না জানি কি প্ল্যান তাঁর মস্তিষ্কের হাত-বাক্সে সঞ্চিত আছে।

প্রধান মন্ত্রী একজন বড় ফুটবল খেলোয়াড়—তাঁর দল ইতিহাস প্রসিদ্ধ; সারা বাঙালা জয় করিয়া ফিরিয়াছে, কোথাও হারিতে হয় নাই; কাজেই তিনি ফুটবল খেলাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া মনে করেন; তিনি বলিলেন এই ফুটবল খেলার দ্বারাই জার্ম্মাণ-রাশিয়ার সমস্যা মিটাইয়া দিবেন। যুদ্ধেও হার জিত আছে, উপরন্তু খরচা রক্তপাত। ফুটবল খেলায়ও হারজিত আছে, এক সোডা লেমোনেডের খরচা ছাড়া অন্য খরচ নাই। রক্তপাত করিলে কিম্বা ফাউল করিলে মাঠ হইতে খেলোয়াড়কে বাহির করিয়া দিবেন। উভয় পক্ষই ফুটবলের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতে রাজি হইয়াছে।

যথা সময়ে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার দল খেলার মাঠে গিয়া দাঁড়াইল, একদলের কাস্তে, হাতুড়ি আঁকা লাল জার্সি; অন্য দলের স্বস্তিক আঁকা কটা জার্সি; একদলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ষ্ট্যালিন, অন্য দলের হিটলার একদিকে লাইন্সম্যান চিয়াং কাইশেক, অন্য দিকে মুসোলিনী; একদিকে গোলজাজ রুজভেণ্ট অন্যদিকে চেম্বারলেন; আর বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রেফারী। তিনি কব্জির ঘড়ি দেখিয়া হুইসিল বাজাইয়া দিলেন; জগতের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম পলিটিকাল ফুটবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

২

তোমরা ভাবিতেছ নেশার ঝোঁকে কমলাকান্ত মাথমুণ্ড কত কি বকিয়া যাইতেছে—সব মিথ্যা, সব কল্পনা! আমি তর্ক করিব না, তোমাদের কথাই মানিয়া লইলাম, সবই কল্পনা, নেশাখোরের প্রলাপ! ইউরোপ আজিও যুদ্ধ ছাড়ে নাই; বাঙলাদেশের মধ্যস্থতা আজিও কেহ স্বীকার করে না, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফুটবল খেলোয়াড় নহেন—সবই স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু নেশাখোরের একটা কথা শুনিবে কি? সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে কি? আমি বলিতেছি ইউরোপের যুদ্ধোদ্যম থামানো অসম্ভব নয়, এবং তাহা তোমরাই পার, তোমরা ডাল-ভাতখোর, কবিতা-লেখক, কলম-পেষক বাঙালী—যে জাতির মধ্যে কমলাকান্তরূপ পদ্ম ফুটিয়াছে! তোমরা হাসিতেছ বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ভাবিতেছ, এ নূতন আর একটা প্রলাপ! কিন্তু এ প্রলাপ নয়।

ইউরোপের শক্তিকে যদি অন্য কোন পথে পরিচালিত করতে পার, যদি তাহা কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকে তবে যুদ্ধের স্পৃহা তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই কমিয়া আসিবে; তোমরাও নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ও জাগিয়া জাগিয়া কমলাকান্তের মত নেশা করিতে পারিবে।

তোমরা ভাবিতেছ কি সেই উপায়? তবে বলি শোন। প্রতিবৎসর বাঙলাদেশ হইতে শত শত ছাত্র পড়িবার জন্য ইউরোপের নানাদেশে যায়। একটু চেষ্টা করিলেই তাদের দিয়াই এ-কাজ সম্ভব হয়। না ভয় নাই, বোমা, বন্দুক, প্রোপাগাণ্ডা ও-সব কিছুই নয়, কারণ ওসব ভারতীয় পন্থা নয়; ওসবে ইউরোপের সঙ্গে পারিবে না।

প্রত্যেক বাঙালী ছাত্র ইউরোপে যাইবার সময় কিছু করিয়া কচুরী পানার শুকনো শিকড় লইয়া যাইবে, আর ইউরোপে গিয়া নদী নালা বিল খাল ও হ্রদে তাহা ছাড়িয়া দিবে—এই সব কচুরী পানার শিকড় জল পাইয়া গাছ হইয়া গজাইবে; দু-চার বছর এই রকম করিলেই দেখিবে ইউরোপের নদী নালা বীল খাল ও হ্রদ, সমস্ত জলপথ কচুরী পানায় ঠাসিয়া

ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে! সে কচুরী পানার ব্যূহ ভেদ করিয়া নৌকা তো দূরের কথা, যুদ্ধ জাহাজও চলিতে পারিতেছে না!

তখন কি হইবে বলিতে পার? তোমাদের কল্পনা শক্তি নাই কি করিয়া বলিবে, আমি বলি মন দিয়া শোন। দেশের জলপথ পরিষ্কার করিবার জন্য মুসোলিনী তার কালো সার্ট লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; হিটলার তাঁর কটা সার্ট লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; ষ্টালিনের বিশ লক্ষ সৈন্য বিশ লক্ষ বেয়নেট ফেলিয়া লাগিয়াছে; জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট পরস্পরকে আক্রমণ ছাড়িয়া যুগপত কচুরী পানাকে আক্রমণ করিতেছে; ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট করিয়া কচুরীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে।

ওদিকে কচুরী পানায় রাইন নদী সবুজ, জার্ম্মাণীর কিলক্যানেল কচুরী পানায় ভর্ত্তি, যুদ্ধের জাহাজও বন্ধ! সুয়েজ খালে ঠাসা কচুরী; প্রাচ্যে আবার আফ্রিকা ঘুরিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু আসিবে কে? সব যে কচুরী পানার বিরুদ্ধে ক্রুজেডে নিযুক্ত! বাস্, এই স্বর্ণ সুযোগে (কিম্বা উদ্ভিজ্জ সুযোগ বলিলেও হয়) তোমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দাও—ইউরোপের সাধ্যও নাই তোমাদের ঠেকাইয়া রাখে!

কচুরী পানার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ইউরোপের লোকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, ক্রমে অস্ত্র শস্ত্রে, কামান বন্দুকে, এরোপ্লেন-জাহাজে মরিচা ধরিবে; অবশেষে তারা যুদ্ধ করা ভুলিয়া যাইবে।

ধীরে ধীরে কচুরী পানার প্রভাবে ইউরোপে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইবে, অজন্মা হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে—অনাহারে ইউরোপের লোক আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিবে—পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপিত হইবে।

হয় তো দেখিবে এমন দিন আসিবে যখন শত্রুদের দেশে এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ না করিয়া কচুরী পানার শিকড় বর্ষণ করা হইবে—নদীনালায় বিলখালে! এ বোমা এমন অহিংস, এমন উদ্ভিজ্জ যে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ইহাতে আপত্তিকর কিছু খুঁজিয়া পাইবেন না! সে দিন কি তোমরা কমলাকান্তর কথা মনে রাখিবে? কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে এই ভেজিটেব্‌ল বোম আবিষ্কারের কৃতিত্ব দান করিবে। জগতে এই রকমই হয়।

কি! কথাগুলি বিশ্বাস হইল না। তা' হইবে কেন? আমার যে বৈদেশিক ডিগ্রি নাই, আমার যে টাকাকড়ি নাই, আমার যে মুরুব্বি নাই! কি ইহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলে? প্রতিভাবানের প্রলাপ হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে! আজিকার স্বপ্ন আগামীকল্যকার বাস্তব! কী? ...এত বড় আস্পর্দ্ধা—বলিতেছি যে কমলাকান্ত নেশা করিলে কখনই এমন অদ্ভুত কথা বলিতে পারিত না। যে বলে যে কমলাকান্ত নেশাখোর নয়, সে অধঃপাতে যাউক। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বাঙালী মানুষ না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্ষণিক নেশাখোর।

রোহিণীর কি হইল?

রোহিণী মরে নাই; পিস্তলের আওয়াজে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। গোবিন্দলাল চলিয়া গেলে, কিছুক্ষণ পরে রোহিণী মূর্চ্ছা ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল গোবিন্দলাল নাই। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল ও যেদিক হইতে রাসবিহারী আসিয়াছিল, সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ চলিয়াও রাসবিহারীর দেখা পাইল না, তবু সে ফিরিল না; কারণ গোবিন্দলালের গৃহে যাইবার পথ বন্ধ।

রোহিণী চলিতে চলিতে রাসবিহারীর দেখা পাইল না, তবে রাসবিহারী এভিনিউয়ে আসিয়া পড়িল। সারা রাত্রি চলিয়াছে, সারা দিন চলিয়াছে, তাহার আর পা চলে না—সে পথের পাশে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ সে এভাবে বসিয়াছিল জানে না, হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার স্পর্শ পাইয়া চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতেই দেখিল এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তি; রোহিণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া নিজের কাহিনী বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভদ্রলোক তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—মহীয়সী নারী! আমি সব জানি। আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। তোমার

স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে আমি তোমারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। আসিয়াছ ভাল করিয়াছ।

রোহিণী দেখিল জগতে এখনো ভাল লোক আছে। একদিন গোবিন্দলালকে তাহার ভাল মনে হইয়াছিল কিন্তু এ ভাল, সে ভাল নয়; এ যে বয়স্ক ভাল। তাই সে বলিল—প্রভু—

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—নারী! আমি প্রভু নই, আমি দরদী, আমাকে শ্রীকান্ত বলিয়া ডাকিও—শ্রীকান্ত-দাও বলিতে পার।

রোহিণী গোবিন্দলাল-বিমোহিনী স্বরে [ব্যাকরণে ভুল হইল—তা হোক—বড় মিষ্ট শুনাইতেছে] ডাকিল—শ্রীকান্ত-দা—

শ্রীকান্তের মরিচা-পড়া হৃদয়-বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—অনেক দিন এভাবে কেহ তাহাকে ডাকে নাই।

রোহিণী বলিল—শ্রীকান্ত-দা যখন সবই জানো, কি আর বলিব। আমার জন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল—আমার নারীত্ব, আমার যৌবন যেন শিকায়-তোলা আচার, আহার শেষ হইয়া গেলে মনে পড়িল। এ ছাই লইয়া আর কি করিব!

শ্রীকান্ত বলিল—এ কি কথা বলিতেছ রোহিণী। হতভাগ্য গোবিন্দলাল তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি জগতে আর লোক নাই। তুমি কি জানো তোমারি মধ্যে কত সম্ভাবনা হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখক বঙ্কিম তাহা বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু এ হইতেছে আন্তর্জাতিক যুগ; যে-সব ধুরন্ধর লেখকগণ এ যুগে বর্ত্তমান, তাহারা কেহই তোমাকে অমনি ছাড়িয়া দিবে না!

রোহিণী তাহার পদপ্রান্তে নত হইয়া বসিয়া পড়িয়া—বলিল—আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।

শ্রীকান্ত বলিল—শোনো রোহিণী! প্রথমে তোমার মধ্যের মুকুলিত নারীত্বকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে; তখন সেই পূর্ণ বিকশিত নারীত্বের মকরন্দে দিগ্‌দিগন্ত হইতে ভ্রমর আসিয়া জুটিবে। ভাবিয়া দেখ সে কি আনন্দের দিন—তোমার এবং বাংলাদেশ উভয়েরই পক্ষে! বলিতে

বলিতে শ্রীকান্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে কি করিতে হইবে?

শ্রীকান্ত—প্রথমে তোমাকে ওই বঙ্কিমী নামটা ত্যাগ করিতে হইবে। এমন একটা নাম গ্রহণ কর, যাহার বলে অনায়াসে তুমি হিন্দুজাতির দুর্ভেদ্য সতীত্বের কেল্লায় প্রবেশ করিতে পার। মূঢ় হিন্দুরা পৌরাণিক যুগ হইতে যে নামটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, যাহার মধ্যে সতীত্বের আদর্শ ঘনীভূত, সেই নামটা তুমি গ্রহণ কর। দেখিবে নামীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্যক্তিত্বও বদ্‌লাইয়া যাইবে। আজ হইতে তুমি রোহিণী নও—তুমি সাবিত্রী!

রোহিণী বলিল—আমি সাবিত্রী! কিন্তু এখন কি করিব।

শ্রীকান্ত—এবার তুমি গিয়া এক মেসের ঝি হইয়া থাকো।

মেসের ঝি! সাবিত্রী আবার বসিয়া পড়িল।

শ্রীকান্ত—সাবিত্রী! স্বর্গের সিঁড়ির নিম্নতম কয়েকটা ধাপ বড়ই নোংরা, সামাজিক স্বর্গের নিম্নতম ধাপ ওই মেস্। একবার যদি তোমাকে মেসে ঢুকাইয়া দিতে পারি তবে আশা আছে একদিন সম্ভ্রান্ততম ঘরের গৃহিণী করিয়া বাহির করিতে পারিব। বিশেষ, মেসের মস্ত একটা সুবিধা, সেখানে একাধিক গোবিন্দলাল বিরাজমান, তারা তোমার ওই গোঁয়ার গোবিন্দলালের মত কথায় কথায় পিস্তল বাহির করিয়া বসে না। মুকুলের বিকাশের পক্ষে যেমন ভ্রমর, নারীত্বের বিকাশের পক্ষে তেমনি মেসের অধিবাসিগণ!

(হায়, সে মেসের সত্যযুগ গিয়াছে—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।)

* * * *

শ্রীকান্ত ও সাবিত্রী যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল তখন সাবিত্রী মাঝে মাঝে শ্রীকান্তের দিকে তাকাইয়া চোখ মারিতেছিল। অসদুদ্দেশ্যে নয়—রোহিণীর ও একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—নারী আমাকে পারিবে না; আমি অভয়া, কমললতা, রাজলক্ষ্মীর মত ধারালো ক্ষুরের উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়াছি, তবু পা কাটে নাই। কিন্তু মেসে গেলে আর ঝি-রূপে কিছুদিন থাকিলে দেখিবে তোমার

বঙ্কিমচন্দ্র-অবহেলিত নারীত্ব অকস্মাৎ তুবড়ি বাজির মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখ না কেন দ্রৌপদীও তো একবছর ছদ্মবেশে বিরাট-রাণীর দাসিত্ব করিয়াছিল!

অনেক বলিবার পর সাবিত্রী মেসে ঝি-রূপে যাইতে রাজি হইল। শ্রীকান্ত নিজের পরিচিত একটি মেসে তাহাকে চাকুরি ঠিক করিয়া দিল।

২

এই ঘটনার ছয়মাস পরে একদিন শীতের সকাল বেলা রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া শ্রীকান্ত খেজুরের রস পান করিতেছিল এমন সময়ে সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। শ্রীকান্ত অনেকদিন তাহাকে দেখে নাই, হঠাৎ তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি সাবিত্রী, ব্যাপার কি ?

সাবিত্রী বলিল—শ্রীকান্ত-দা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীকান্ত—সেজন্য তো তোমাকে প্রস্তুত থাকিতেই বলিয়াছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে এখনো উহাকে তুমি সর্ব্বনাশ বল! নারীত্বের বিকাশের পক্ষে উহা অত্যাবশ্যক।

সাবিত্রী বলিল—আপনি আসল কথা বুঝিতে পারেন নাই; আগে সব শুনুন, পরে যাহা হয় বলিবেন! এই বলিয়া সাবিত্রী তাহার মেসের ঝি-জীবনের কাহিনী আরম্ভ করিল।

মেসের মেম্বরগণ সকলেই ভদ্র, আমাকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করিত; অনেক সময় আমি ভুলিয়া যাইতাম যে আমি ঝি আর তারা আমার মালিক!

প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে দেখিতাম আমার ঘরে কে যেন সন্দেশ রাখিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা দেখিতাম সুগন্ধি তৈলের শিশি আমার ঘরে; দুপুরবেলা দেখিতাম ভাল শাড়ি কাপড় বিছানার উপরে রাখিয়া

দিয়াছে; রাত্রিবেলা বালিশের তলে টাকা কড়ি পাইতাম! প্রথমে কাহাকেও ধরিতে পারি নাই কে এমন চুরি করিয়া উপহার রাখিয়া যাইত! ক্রমে প্রকাশ পাইল, সতীশ বলিয়া একটি বাবু এসব কাণ্ড করিতেছেন। সতীশ-বাবুর বয়স অল্প, সুপুরুষ, বড়লোকের ছেলে, মনটি ভারি নরম।

একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে শুইয়া আছি—মাঝ রাত্রে আমার খাটের তলা হইতে সতীশবাবু বাহির হইয়া প্রেম নিবেদন করিলেন। (এইখানে শ্রীকান্ত চোখ বুজিয়া রসের গেলাসে চুমুক দিল) আমি আপনার সেই মন্ত্র ভুলি নাই, বলিলাম, সতীশবাবু মহৎ প্রেমের প্রাণ ব্যর্থতায়। আমাকে পাইলেই দেখিবেন পাওয়া হইল না, কাজেই আপনি ও পণ ত্যাগ করুন। কিন্তু শ্রীকান্ত-দা সতীশবাবু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি রোগের চিকিৎসা করেন না—লক্ষণের চিকিৎসা করেন। তিনি বলিলেন, সাবি! (মাইরি শ্রীকান্ত-দা, তার মুখে এই অর্দ্ধনামটি বেশ মিষ্টি শোনায়।) তোমার লক্ষণ যে প্রেমের। সে রাত্রিতে তিনি চলিয়া গেলেন। আবার পরের অমা-বস্যায় হাজির। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এতদিন পরে যে! তিনি বলিলেন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আমি, ঘন ঘন ঔষধ দেওয়া আমাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

কিন্তু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইলেও এখন তিনি ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করিলেন! মেসের মধ্যে কলঙ্ক রটিল। তাঁহাকে বলিলাম—কলঙ্ক রটিতেছে যে। তিনি উত্তর দিলেন—কলঙ্ক না থাকিলে প্রেমে সুখ কোথায়?

কিন্তু সতীশবাবু একা নন; আরো অনেক মেম্বার লুকাইয়া টাকা-কড়ি শাড়িগহনা দিতে আরম্ভ করিল; তাদের প্রেম ও উপহার দুই পরিত্যাগ করা উচিত নয় ভাবিয়া উপহারগুলি লইতে লাগিলাম। টাকায় শাড়ীতে অলঙ্কারে একবাক্স ভরিয়া গেল। বড়লোকের ছেলে গোবিন্দলাল অনেক দিয়াছিল বটে, আসিবার সময় আনিতে পারি নাই।

সতীশবাবু বলিতেন—চল সাবি! অন্যত্র যাওয়া যাক্। আমি বলিতাম, সতীশবাবু এই মেসেই আমার সাধনার স্থান—এই আমার স্বর্গের সিঁড়ি। কাল রাত্রে সতীশবাবু অনেকক্ষণ ঘরে ছিলেন—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—ভোরবেলা জাগিয়া দেখি আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে

শ্রীকান্ত বলিল—কুসংস্কার সাবিত্রী, কুসংস্কার। পৌরাণিক সাবিত্রী যে কুসংস্কারের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছে, আধুনিক সাবিত্রীর তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

সাবিত্রী—আপনি কি বলিতেছেন ?

শ্রীকান্ত—তোমার নারীত্ব অপহৃত হইয়াছে ? সাবিত্রী এত দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া বলিল—শ্রীকান্ত-দা নারীত্ব আর বিদ্যা একজাতীয়—যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে। আমি ওকথা বলিতেছি না।

শ্রীকান্ত—তবে তোমার কি অপহৃত হইল ?

সাবিত্রী—এতদিনের সঞ্চিত টাকা কড়ি, গহনাপত্র।

শ্রীকান্ত—চোর কে ?

সাবিত্রী—আমার মন-চোর সেই সতীশবাবু। তাঁহাকেও সকালবেলা হইতে পাওয়া যাইতেছে না।—ইহার চেয়ে গোবিন্দলাল অনেক ভাল ছিল।

ততক্ষণে শ্রীকান্ত সবটুকু খেজুর রস শেষ করিয়াছে। সে বলিল—কোন ভয় নেই সাবিত্রী ইহার নাম বাংলা দেশ—হৃদয়রাজ্যের চৌমাথার মোড়ে ইহার অবস্থান। একটি পথ না হইলে অপর পথ আছে। তোমাকে আমি সিনেমায় ঢুকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। দেখিবে যে সে পথ মেসের পথের চাইতে অনেক সরস, সহজ ও সার্থক, মানে অর্থময়।

শ্রীকান্তের চেষ্টায় সাবিত্রী সিনেমায় অভিনেত্রী রূপে প্রবেশ করিল।

৩

তারপর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাবিত্রীর চাক্ষুস দেখা হয় নাই, কিন্তু দেওয়ালের প্রাচীরে যত্র তত্র সাবিত্রীর ছায়ামূর্ত্তি বিজ্ঞাপিত। শ্রীকান্ত তাহার সাজসজ্জা, কিম্বা সত্য কথা বলিতে গেলে সাজসজ্জার অভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছে. সাবিত্রীর অন্তরের (এবং দেহের) সুপ্ত নারী প্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

সেদিন শ্রীকান্তের মনটা ভারি খারাপ—সে একা বসিয়া বসিয়া স্পেন্সারের Date of Ethics-এর মধ্যে হরিদাসের গুপ্তকথা রাখিয়া পড়িতেছিল—এমন সময়ে সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকান্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল—একি সাবিত্রী! তোমার এই চেহারা, যেন কুড়ি বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। —ব্যাপার কি?

সাবিত্রী বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল—অনেক কষ্টে বলিল—শরীরে আর কিছু নাই শ্রীকান্ত-দা! নারীত্ব বিকাশের সাধনায় মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত গেল। এ কোথায় পাঠাইয়াছিলে? মেস্ যদি স্বর্গের সিঁড়ি হয়, সিনেমা কি তবে নরকের খিড়কি দরজা!

শ্রীকান্ত—কি হইয়াছে?

সাবিত্রী—বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু না বলিয়াই বা কি করি? কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছ?—বাত, গেঁটে বাত!

শ্রীকান্ত হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিয়া চলিল—নাচিতে নাচিতে পায়ের জয়েণ্টগুলোতে গেঁটে বাত ধরিয়াছে; সিনেমার ম্যানেজার ও প্রযোজকগণ না খাইতে দিয়া মেদ শুকাইবার ছলে হাড়শুদ্ধ শুকাইয়া ফেলিয়াছে বোধ হয় যক্ষ্মায় ধরিয়াছে।

শ্রীকান্ত—টাকা কড়ি পাইয়াছ তো?

সাবিত্রী—খাতায় পত্রে পাইয়াছি, এক পয়সাও আদায় করিতে পারি নাই। ইহার চেয়ে যে সতীশবাবুও ভাল ছিলেন? এখন কি করি।

শ্রীকান্ত বলিল—তাইতো তোমার রূপ ও যৌবন দুই-ই গিয়াছে। নারীত্ব বিকাশের ব্যবসায়ে ওই দুইটিই প্রধান মূলধন! এখন তুমি একেবারে দেউলে।

সাবিত্রী—সেই জন্তেই সিনেমা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমার গতি কি।

শ্রীকান্ত ভাবিতেছিল, এই কি সেই রূপ, যাহা বারুণী পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের তরল আয়নায় নিমজ্জমান দেখিয়া গোবিন্দলালের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহার তুলনায় হতভাগিনী ভ্রমর উপেক্ষিত

হইয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহা দেখিয়া অভয়া-কমললতা-রাজলক্ষ্মী অবজ্ঞাকারী শ্রীকান্তের বৈরাগ্য-কন্‌ক্রিট মনও ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল?

সাবিত্রী বলিল—বলুন শ্রীকান্ত-দা এবার আমি কি করি?

শ্রীকান্ত বলিল—সাবিত্রী! এক পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া তোমার জীবনের অভিযান স্বরু হইয়াছিল আর পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া তাহা শেষ কর। ওই দেখ 'লেক'। এই বলিয়া শীর্ণ আঙুল দিয়া ঢাকুরিয়া লেক দেখাইয়া দিল।

সাবিত্রী ক্ষণকাল আত্ম-সংবরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ কোথায়? তিনি আমার জন্য পিস্তলের গুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর তুমি করিতেছ লেকের ব্যবস্থা! পিস্তলের গুলি রাগের মাথায় লোকে ছোঁড়ে, আর তুমি দিব্য ঠাণ্ডা মেজাজে লেকের জল দেখাইয়া দিতেছ; আমার বঙ্কিমচন্দ্রই ভাল। শুনিয়াছিলাম বাংলাদেশ বঙ্কিমের পরে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু কোন দিকে?—লেকের দিকে?—বহুপূর্ব্ব বিবেচিত স্বার্থপরতার দিকে?—স্বর্গের সোপানে দুই ধাপ উপরে তুলিয়া গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে পতনের দিকে? ইহার চেয়ে যে বঙ্কিমচন্দ্রই ভাল। আমি তোমার ঘর ছাড়িলাম কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়িব না। বাংলা দেশের সিংহদ্বারের এক প্রান্তে বসিয়া থাকিব—আমাকে ঘরে তুলিতে পারিবে না, কিন্তু যাতায়াতের পথে আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। আর যখন মরিব, আমার সমস্যাকে রাখিয়া যাইব! সে ভূতের মত তোমাদের আশা আনন্দ আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ কালো ছায়াপাত করিবে—মাঝে মাঝে তোমরা শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিবে—দেখিয়া আমি পরলোকে হাসিতে থাকিব। আমার প্রতিনিধির মত এই সমস্যা থাকিবে—শ্রীকান্তের ভরসায় নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পুনরভ্যুত্থানের ভরসায়। যতদিন তাঁর আবির্ভাব না হয় আমি বাংলাদেশের সিংহদ্বারের প্রান্তে প্রহর গুণিয়া বসিয়া থাকিব।—এই বলিয়া দৃপ্ত সাবিত্রী প্রস্থান করিল। শ্রীকান্ত ডাক দিল—এই রতন তামাক দিয়ে যা!

উতঙ্ক

কোন এক কলেজে আমার এক বন্ধু অধ্যাপক। মাঝে মাঝে তাহার কাছে যাই—অধ্যাপকদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে, মুখচেনা পরিচয় সকলের সঙ্গেই আছে।

সেদিন কলেজে গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি ক্লাসে গিয়াছেন, কাজেই অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দর্শন-Cum-ধর্মনীতির অধ্যাপক নাকে প্রচুর পরিমাণে নস্য ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন—নাঃ, আজকালক'র ছাত্রদের না আছে পড়াশুনায় মন, না আছে তেমন গুরুভক্তি!

এই বলিয়া পাশের অধ্যাপকের দিকে মুখ ফিরাইতেই দক্ষিণা বাতাসে যেমন ফুলের পরাগ ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তীব্র নস্যের গুঁড়া ভদ্রলোকটির নাকে গিয়া ঢুকিল।

তিনি সশব্দে হাঁচিয়া উঠিলেন—হ্যাঁচ্চ।

কিন্তু এই তুচ্ছ বাধাতে বিব্রত হইবার লোক পূর্বোক্ত অধ্যাপক নন; তিনি পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—কিহে মনে আছে তো আরুণি, উতঙ্ক, ওদের কথা।

ভদ্রলোক আর একটি হাঁচি দিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা, বোধ করি উতঙ্ক ও আরুণির কথা মনে পড়িয়া অসমাপ্ত হাঁচিটা রুমালে চাপিয়া দিলেন।

বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ধৌম্য, পরাশর, জাবালির ন্যায় আদর্শ গুরু—কেবল উপযুক্ত শিষ্যের অভাবেই প্রতিভার স্ফূর্তি হইতেছে না।

২

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সেই অধ্যাপকবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানা বাজারের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম একজন যুবক বন্ধুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত কপালে ঠেকাইবার সময় তাহার

বাজারের দোদুল্যমান ঝুলির মধ্যে সোয়া সের বেগুন ও কিঞ্চিৎ পলাণ্ডু তুলিতেছিল।

বন্ধু শুধাইলেন—খবর কি?

ছাত্রটি বলিল—স্যার, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের সাব্‌সট্যান্সটা একটু যদি……

বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব রচনা সার্থক হইয়াছে—নতুবা বাজার করিয়া ফিরিতে এমন জিজ্ঞাসার উদ্ভব সম্ভব হইত না।

বন্ধু বলিলেন—আর এক সময়ে হবে।

ছাত্রটি নমস্কার করিবার সময়ে নাকের কাছে সোয়া সের বেগুনের থলিটি পুনরায় দোলাইয়া বলিল—আজ্ঞে, তাই হবে।

কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

বন্ধু একবার পিছন ফিরিয়া লইয়া বলিলেন—আর বল কেন? ছেলেটা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যখন তখন যেখানে সেখানে পাঠ্য-বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলে বসে। সেদিন দেখি ফুটবল খেলার মাঠে কখন পাশে এসে বসেছে। বলে কিনা স্পোর্টস সম্বন্ধে Essay আসতে পারে—তাই খেলা দেখতে এসেছে। সারাক্ষণ ধরে কেবলি জিজ্ঞাসা করে—স্যার, কয়েকটা Point বলে দিন। খেলা দেখা একদম মাটি করে দিল!

আমি বলিলাম—সেজন্য দুঃখ কর কেন? তোমরাই তো সেদিন দুঃখ করছিলে যে আজকাল আর উতঙ্কের মতো ছাত্র পাওয়া যায় না।

বন্ধু বলিলেন—যা বলেছেন। আমরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে ওকে উতঙ্ক বলেই উল্লেখ করি।

তারপর বন্ধুর কাছে উতঙ্কের জ্ঞানস্পৃহার অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। সে যুগের উতঙ্ক ইহার কাছে অনেক কিছু শিখিতে পারিত।

উতঙ্ক প্রফেসারদের রুমে কোন প্রফেসারকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ দেয় না।

মনে করুন অ-বাবু পর পর তিন পর্ব ক্লাস করিয়া আসিয়া পাখা খুলিয়া দিয়া বসিয়াছেন অমনি স্মিতবদন উতঙ্ক আসিয়া বলিল—স্যার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই কবিতাটা।

অ-বাবুর তখনি মনে পড়িয়া গেল জীবন বীমার কিস্তি দিবার আজ শেষ তারিখ, তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহাতে উতঙ্কের দুঃখ নাই জ্ঞানের বিষয় যেমন অনন্ত, প্রফেসারও তেমনি অনেক।

সে র-বাবুর কাছে গিয়া বলিল—স্যার, গীতার এই শ্লোকটা একবার দেখুন।

র-বাবুর বাড়ীতে গোরু আছে। তিনি গোরুর জন্য স্বহস্তে আড়াই হাজার খড় কুটিয়া কলেজে আসিয়াছেন, তখনও গো-প্রীতির ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই! তিনি জামার সাড়ে তিন পকেট (পাঞ্জাবীর ৩টা, ফতুয়ার ১টা ছোট) খুঁজিয়া চশমা পাইলেন না, কাজেই গীতার শ্লোকটি আর—

উতঙ্ক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আচ্ছা থাক, আর এক সময়ে হবে।

সে গুটি-গুটি ইতিহাসের অধ্যাপক বি-বাবুর দিকে রওনা হইল।

বি-বাবু উতঙ্ককে দেখিয়াই জগতের যত গাম্ভীর্য্য মুখমণ্ডলে লিপ্ত করিয়া বসিলেন।

উতঙ্ক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—স্যার, বাড়িতে সব খবর ভালো তো?

বি-বাবু বাড়ির অদ্ভূত উদ্বেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—বড় খারাপ, এখনই যেতে হবে।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সেদিন আর তাঁহার ক্লাস লওয়া হইল না। বি-বাবু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—বাড়িতে গিয়াই একখানা ক্যাজুয়াল লীভের দরখাস্ত পাঠাইয়া দিতে হইবে।

এদিকে উতঙ্ক ক্রমে গণিত, অর্থনীতি প্রভৃতির অধ্যাপকদের বিব্রত করিয়া দর্শন-Cum-ধর্মনীতির অধ্যাপকের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক বলিল—স্যার, শঙ্কর—

তাহার কথা আর শেষ হইতে পারিল না। দার্শনিক অধ্যাপক ফুকারিয়া উঠিলেন—আছে, আছে, সব আছে।

এই বলিয়া পকেট হইতে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দর্শনের প্রবন্ধ

বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন আর উতঙ্ক ঠায় দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

যেমন গুরুর উৎসাহ, তেমনি শিষ্যের ধৈর্য! আড়াই ঘণ্টা পরে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে গুরু শুধালেন—কেমন?

উতঙ্ক বলিল—ভালোই। তবে আপনি যে শঙ্করের কথা বললেন—

অধ্যাপক রাগিয়া বলিলেন—ইউরোপের পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দাও। এক শঙ্কর ছাড়া দ্বিতীয় শঙ্কর নেই—অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

উতঙ্ক বলিল—সে কি স্যার, শঙ্কর যে এখনো বেঁচে আছে—আমাদের খেলার সেক্রেটারি শঙ্কর ঘোষ।

অধ্যাপক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—(স্বকীয় ভাষা এবং রোমশ বক্ষ:স্থল বাহির হইয়া পড়িল)—খেল্‌বা, খেল্‌বা, কিছু তো বোঝবা না। বোঝবা কেম্‌নে! অহোহ ইণ্ডিয়ান কাল্‌চারটার বেবাক্ নাশ করে ফেল্‌লা; ওহে দাও তো একটিপ নস্য!

একবার এ পাশে তাকাইলেন—কেহ নাই, ওপাশে তাকাইলেন—কেহ নাই, সম্মুখে কেহ নাই, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। গুরু-শিষ্য সংবাদের মাঝখানে অন্যান্য অধ্যাপকরা প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—কেবল পিছনে অনুতপ্ত উতঙ্ক নম্রশিরে দাঁড়াইয়া আছে।

৩

উতঙ্ক আন্তঃকলেজ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় এমন কলেজ নাই যেখানে তার গতিবিধি না আছে। এমন অধ্যাপক নাই যার কাছে একাধিকবার সে না গিয়াছে; পাছে ভুল হয় তাই একখানি নোটবুকে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বাড়ীর ঠিকানা টুকিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। অবশেষে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট উতঙ্ক খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা

তো আর ছাত্রবেতনে পরিচালিত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের স্বল্প বেতনের অধ্যাপক নন—তাঁহাদের যেমন মেদ তেমনি মেধা, যেমন বিদ্যা তেমনি বেতন, যেমন দায়িত্ব তেমনি দেনা, যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমনি বাড়ির উচ্চতা —সংক্ষেপে তাঁহারা জাতিগঠনে নিরত—আর কলেজের অধ্যাপকরা তো কেবল ছাত্র পাস করায়; ধিক্। অবশ্য সেই ছাত্রদের পরীক্ষার ফি-র উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অস্তিত্বের নির্ভর।

এ হেন সরস্বতীর বড মন্দিরে উতঙ্ক একদিন গিয়া উপস্থিত হইল। পাখা খুলিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় এক অধ্যাপক টান হইয়া পডিয়া ছিলেন —অধ্যাপনা ও ভোজনান্তে তিনি সাতিশয় ক্লান্ত।

উতঙ্ক বলিল—স্যার,—

অধ্যাপক বলিলেন—কি, চাঁদা নাকি?

উতঙ্ক বলিল—না ব্লেকের সেই কবিতাটা—

—কোন্ কলেজের ছাত্র?

কলেজের নাম শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেম—বি. এ. পাস করে এখানে এসে ভর্তি হয়ো, তখন দেখা যাবে।—এই বলিয়া তিনি পাশ ফিরিলেন, বলিষ্ঠ সেগুন কাষ্ঠের চেয়ার মচ্, মচ্, করিয়া উঠিল।

ছাত্র-সমাজে উতঙ্কের অসীম প্রতিষ্ঠা। কোন কলেজের ধর্মঘট করিতে হইলে ছাত্ররা উতঙ্ককে Requisition করে। উতঙ্ক কলেজে ঢুকিতেই অধ্যাপকরা আতঙ্কে পলায়ন করে, কলেজ আপনি ছুটি হইয়া যায়—Strike successful হয়।

পরীক্ষা আসিয়া পডিয়াছে—বাংলাদেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নূতন পটল ও পরীক্ষার suggestion চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। পথের মোড়ে হকারেরা রেস ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার Tip হাঁকিতেছে। পিতারা রেসের ও পুত্রেরা পরীক্ষার Tip সংগ্রহ করিতেছে। উভয় দলেরই ভবিষ্যৎ সমান উজ্জ্বল!

এই সময়ে—কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকের মৃত্যু হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় সজ্ঞানে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল—আমরা অনেকে সঙ্গে গেলাম। গঙ্গাজলে অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় তিনি ইষ্টনাম জপ করিতেছেন। যে-কোন মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এমন সময়ে দেখিলাম উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া উতঙ্ক আসিতেছে। বেচারী নিশ্চয় অধ্যাপকের কাছে নানা ভাবে ঋণী—হয়তো দেখিতে পাইবে না আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আর এমন ছাত্র-প্রিয় অধ্যাপক, ছাত্ররা কেনই বা না ছুটিবে!

আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম—এখনো আছেন, ভয় নেই।

উতঙ্ক বলিল—নাঃ ভগবান আছেন!

উতঙ্ক কাছে আসিয়া শুধাইল—কোথায়?

দেখাইয়া দিলাম।

অধ্যাপকের তখন শেষ মুহূর্ত। উতঙ্ক কাছে যাইতেই সকলে অবচেতন ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে অধ্যাপকের মুখের কাছে নত হইয়া বসিল। তিনি তখন রামনাম জপ করিতেছিলেন,

উতঙ্ককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধাইলেন—কি?

উতঙ্ক বলিল—স্যার, ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতাটা—ওই যে সেই লণ্ডন, ১৮০২—ওটার কিছু Suggestion?

আমরা সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলাম। অধ্যাপকের মুখ ঈষৎ ফাঁক হইল, যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু ওষ্ঠাধর আবার বন্ধ হইল, চক্ষুতারকা স্থির হইয়া গেল—প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

উতঙ্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—Too late! Too late! তারপর সখেদে নিজের মনে বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল—

"Professor thou shouldst be living at this hour! Students have need of thee!"

সকলে তাহার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইল; কিন্তু আমি মনে মনে বলিলাম—ধন্য উতঙ্ক তোমার জ্ঞানস্পৃহা! তোমার উদাহরণ দেখিয়াই বাঙালী অধ্যাপকদের চৈতন্যের অর্ধচন্দ্রোদয় সম্ভব হইয়াছে।

গণক

এপ্রিল মাসের কলিকাতা শহর। দুপুরের রোদে রাস্তার পিচ গলিয়া জুতার ছাপ বসিয়া যাইতেছে। পথে লোকজন নাই। ট্রাম-বাসের চলাচল কমিয়া আসিয়াছে; মাঝে মাঝে একখানা জলঢালা ট্রামগাড়ি লাইনের উপর জল ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছে—তৃষিত কুকুরটা আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। পথের পাশের জলের কলের সঙ্কীর্ণ ছায়াতে একটা কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। রোদের দিকে চাহিলে চোখে জ্বালা ধরিয়া যায়।

এমন সময়ে ওই লোকটি কোথায় চলিয়াছে? নিশ্চয় কোন গুরুতর বিপদে পড়িয়াছে, নহিলে শখ করিয়া কে পথে বাহির হয়! হয়তো বাড়ীতে ব্যাধি আঁটিয়া উঠিয়াছে, কিংবা হয়তো হঠাৎ মনে পড়িয়াছে বেলা ৩টার মধ্যে জীবনবীমার কিস্তি দাখিল করিতে না পারিলে তামাদি হইবে; নতুবা এহেন অবস্থায় কে বাহির হয়!

লোকটা কাজে আসিলে দেখা গেল মুখে শঙ্কার ছাপ নাই, বরঞ্চ একটা লাভলোলুপ কৌতূহলের ভাব। সে ভেজা গামছাখানি মাথা হইতে নামাইয়া মুখটা মুছিয়া লইল; গামছা যেমন দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যাইতেছে—তেমনি আবার দেখিতে দেখিতে ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে লোকটি থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; মুখের প্রসন্নতা কোথায় গেল! অদূরে কার দিকে তাকাইয়া দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল? ব্যাপার কি? অদূরে আর একজন লোক ভেজা গামছা মাথায় এইদিকে আসিতেছে।

দ্বিতীয় লোকটি কাছে আসিয়া পড়িলে প্রথম ব্যক্তি শুধাইল—কি ইস্কুল পালিয়ে নাকি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—একরকম ভাই, 'এই আসছি' বলে সরে পড়েছি। আপনি?

প্রথম ব্যক্তি বলিল—আর বল কেন ভাই? বাড়িতে কঠিন ঘ্যামো, কিছুতেই বেরুতে দেয় না; শেষে ডাক্তার ডাকবার নাম করে, বুঝলে কিনা!

—চলুন, চলুন। নইলে আবার সেই টেকো-টা এসে পড়বে।

প্রথম বলিল—কিন্তু সেই দাঁতপড়াকে ঠকাবে কি করে? এতক্ষণে দুই হাজার গুণে ফেলেছে।

—তবে তাড়াতাড়ি চলুন।

তখন দুইজনে পরস্পরের মিলনে অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে এবং টেকো ও দাঁতপড়ার ভয়ে শঙ্কিত মনে চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই কলের ছায়ায় শোয়া কুকুরটা হঠাৎ তাদের চোখের দিকে তাকাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে গিয়া ট্রামের খুঁটির ছায়াতে দণ্ডায়মান কর্পোরেশনের একটা ষাঁড়ের পেটের তলের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল।

২

পাঠক, এই দুই ব্যক্তিকে চেনো কি? চেনো না! পরীক্ষাজীবী বাংলাদেশের একটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গেলে চঞ্চল হইয়া ওঠে।

প্রথমে ঠেলাগাড়িওয়ালারা চঞ্চল হয়—রাশি রাশি বেঞ্চি টেবিল বহন করিবার আশায়; তারপরে দপ্তরীরা, কেরানীরা, অফিসের বাবুরা,—নানা রকম প্রয়োজনে; আদালতের উকীলেরা—পরীক্ষাগৃহে 'গার্ড' দিবার জন্য (উকীলদের নিন্দা করিতেছি না; শাস্ত্রেই বলিয়াছে পুরুষস্য ভাগ্যং। বাঙালীর অদৃষ্টের দুই মেরু, দারোয়ানী ও মন্ত্রিত্ব; একটু অদল বদলে কত প্রভেদ); তারপরে অভিভাবকদের দল, পরীক্ষকের দল, সবশেষে ছাত্রের দল, পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র নম্বর জানিবার জন্য উমেদারের দল; তাহারা প্রায়ই নিরাশ হয় না—যদিচ পরীক্ষার নম্বর বলিবার হুকুম নাই—তাহা strictly confidential; কিন্তু পরীক্ষকরা মর্মজ্ঞ, তাঁহারা জানে যে strictly confidential মানেই 'অসঙ্কোচে বলিয়া দিবে'—এবং একেবারে অন্তিমদৃশ্যে ঢাকুরিয়া লেকের মাছের দল—পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যখন

ফেল করা সন্তান-সেনার দল ঝাঁকে ঝাঁকে লেকে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করে—'যোগাতে মাছের খাদ্য'।

সম্প্রতি একটি নূতন দল সৃষ্টি হইয়াছে—এঁদের নাম গণক। পরীক্ষার খাতা দেখা হইয়া গেলে ইঁহারা নম্বরগুলি মিলাইয়া দেখেন, যোগফলে ঠিক আছে কিনা। খাতাপ্রতি দক্ষিণা হয়তো আধ পয়সা কি পৌনে এক পয়সা। কিন্তু এমনি ইংাদের অধ্যবসায় যে তিলে তাল করিয়া কেহ দেড়শ,' কেহ দুইশ' টাকা রোজগার করেন! বাঙালী এখনো নিজের জাতীয় বীরদের না চিনিয়া বৃথা রবার্ট ব্রুস প্রভৃতি বিদেশীর নাম করিয়া থাকে।

এই গণকদের অসাধ্য বলিয়া কিছু নাই। কাঠফাটা রোদ, গভীর রাত্রি, মুমূর্ষুর শয্যা, ইস্কুলের বিধান কিছুতেই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে না। যারা হেড এগজামিনারেব বাডির কাছে থাকে তারা বোধ করি নিজেদের স্বর্গের অধিবাসী মনে করে। তেল মাখিতে মাখিতে ক-বাবু আসিয়া বলিলেন—স্তার, এই একবার এলাম। আছে নাকি কাগজ? আছে? দিন, দু' পুঁটলী গুণে যাই।

দু' পুঁটলী গুণিয়া, তৈলাক্ত মস্তক স্নিগ্ধ করিয়া সস্নিগ্ধ গোয়ালার দুধের বিলের কিছুটা সুরাহা করিয়া ক-বাবু গঙ্গাস্নানে প্রস্থান করিলেন।

খ-বাবু বড়বাজার হইতে কিছু 'খট্টমলের' কিনা ছারপোকার অঙ্কুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইবামাত্র সেগুলি তিনি নিজের শয্যায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—এতদিনে তাহারা সাবালক হইয়া দংশন শুরু করিয়াছে; মাঝরাতে খ-বাবুকে ঘুম ভাঙাইয়া জাগাইয়া দেয়। তিনি এলার্ম ঘড়িতে বিশ্বাস করেন না—হাজার হোক তা মানুষের তৈয়ারী—আর এ একেবারে স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টি। খ-বাবু হেড এগজামিনারের বাড়িতে আসিয়া কড়া নাড়িয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করিয়া গণনায় বসিলেন। মেয়ের বিবাহের টাকা জমাইতেছেন। মেয়ে সদ্যোজাত। সে কালক্রমে তিলে তিলে তিলোত্তমা হইবে, অমনি সেই সঙ্গে বছরে বছরে গণনার টাকা তিলে তিলে তাল হইয়া উঠিবে। খ-বাবু গণিতের এম. এ.; বি. এ.-তে অর্থ-নীতিতে অনার্স পাইয়াছিলেন।

৩

ইত্যবসরে প্রথম বাবু ও দ্বিতীয় বাবু (এখন বাবু বলা যাক) হেড এগজামিনারের বাড়িতে পৌঁছিয়া অস্ত্রাগারে (অর্থাৎ যে ঘরে পরীক্ষার খাতা থাকে) গিয়া পৌঁছিলেন। টেকো ও দাঁতপড়া আসে নাই দেখিয়া এবং অগণিত অনেক খাতার স্তূপ দেখিয়া দু'জনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দু'জনে ছুটিয়া গিয়া যতগুলি সম্ভব (এঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়) পুঁটলী লইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রথম বাবুর বয়স ষাট, দ্বিতীয় বাবুর পঞ্চাশ।

দু'জনে নিঃশব্দে মনে মনে গণনা করিয়া চলিলেন; ৩ আর ২ পাঁচ আর ৪ নয়, আর ৩। সাড়ে বার ইত্যাদি।

এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে শব্দ হইল—চুন না সুরকি?

দু'জনে চমকিয়া উঠিলেন—লোক নাই, কথা বলে কে?

এক মুহূর্ত্ত পরে সু-উচ্চ খাতার প্রাচীরের মধ্যে মানুষের মাথা জাগিয়া উঠিল। দু'জনে বিস্মিত ক্রোধের সঙ্গে দেখিলেন দাঁতপড়া।

প্রথম বাবু শুধাইলেন—কি বলছিলেন?

—বলবো আর কি। আপনাদের কথা শুনে মনে হলো বুঝি পাওনাদার এসেছে। জানেন তো একখানা বাড়ি করেছি। চুন আর সুরকি-ওয়ালারা তাগিদ করছে—হঠাৎ মনে হলো তাদেরই কেউ বুঝি এসেছে।

দ্বিতীয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কত খাতা গুণলেন?

—কত আর? মোট দেড় হাজার!

দেড় হাজার শুনিয়া প্রথম বাবু এত বড় হাঁ করিয়াছিলেন যে চোয়ালের হাড় আর স্বস্থানে নামিতে চায় না।

দ্বিতীয় বাবু শুধাইলেন—মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে, এসেছেন কখন্?

—সেই সকাল সাড়ে চারটায়।

—খেলেন কি?

খাবো আর কি? চারটে চিঁড়ে আর কিছু গুড় চাদরে বেঁধে এনেছিলাম—তাই।

প্রথম বাবুর চোয়াল এতক্ষণ যথাস্থানে নামিয়াছে। তিনি শুধাইলেন —অত সকলে ওঠেন কি করে?

—কি আর বলবো। কর্পোরেশনের স্ক্যাভেঞ্জারদের একজনকে বলে রেখেছি, বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবার সময়ে ডেকে দেয়!

দাঁতপড়ার দুটি ভূতপূর্ব দাঁতের অবকাশ দিয়া কথার অনেকটা অংশ বায়ুরূপে বাহির হইয়া যায়, সব বোঝা যায় না, তবে যেটুকু বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় তিনি একজন 'স্থপারম্যান'।

দাঁতপড়া বলিল—আরে শুনেছেন সুখবর! টেকো আর আসবে না!

দুইজনে কোরাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন? কেন?

—কাল রাতে পড়ে গিয়ে তার দুই পা ভেঙে গিয়েছে, মাথায় চোট লেগে ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছে।

টেকো আর আসিতে পারিবে না, তাহার দিক হইতে আর অর্থ-ক্ষয়ের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, দুইজনে সত্যই তাহার জন্য সমবেদনা বোধ করিলেন।

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। বোধ করি নূতন খাতার স্তূপ আসিয়াছে মনে করিয়া সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহারা বাহিরে গিয়া দেখিল অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি হইতে জন চার লোক টেকোকে সযত্নে টানিয়া বাহির করিতেছে। একজন নার্স তাহার মাথায় বরফের থলি ধরিয়া আছে আর একজন ডাক্তার তাহার নাড়ি ধরিয়া দণ্ডায়মান।

দাঁতপড়ার দল জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

টেকো আর্তস্বরে বলিল—কাগজ গুণতে এলাম।

—কি সর্বনাশ!

—আপনি যে আহত।

টেকো বলিল—সেই জন্যই তো অ্যাম্বুলেন্সে আসতে হলো।

দাঁতপড়া বলিল—শুনেছি আপনার ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে গিয়েছে।

টেকো বলিল—আরে খাতা গুণতে কি ব্রেন লাগে!

ডাক্তার বলিল—ব্রেন দিয়ে মাথার খুলির খানিকটা জায়গা মিছামিছি ভর্তি করে রাখা হয়েছে।

টেকো বলিল—তবে ব্রেন একেবারে নষ্ট হয়নি। এই দেখুন না ওই থার্মোফ্লাস্কে করে ভরে নিয়ে এসেছি। দরকার হলে ব্যবহার করবো।

তারপর সে ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, ব্রেন বেরিয়ে যাবার পর থেকে মাথা বেশ হাল্‌কা বলে মনে হচ্ছে।

তখন সকলে মিলিয়া টেকোকে ঘরে ঢুকাইল। টেকো মেঝের উপরে শুইয়া পড়িয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া খাতা গুণিতে লাগিল ৩ আর ৫ আট আর ২॥ সাড়ে দশ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বাবু প্রথম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে চুপ?

প্রথম বাবু তবু নিরুত্তর।

তখন তাকাইয়া দেখে প্রথম বাবুর বিস্ময়ের হাঁ এত বড় হইয়াছে যে আবার চোয়াল আটকাইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বাবু বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এদিকে যে বিপদ।

ডাক্তার বলিল—আমার রোগী এখন তখন, অন্যদিকে মন দেবার সময় আমার নেই। আপনারা বরঞ্চ কোন ছুতোরের কাছে যান—হাতুড়ি ঠুকে ঠিক করে দেবে।

তখন অগত্যা দুইজনে প্রথম বাবুর অবাধ্য চোয়ালের একটি ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে মুমূর্ষু টেকো ২ আর ৩ পাঁচ আর ৭॥ সাড়ে বার করিয়া খাতা গুণিয়া চলিল!

সঙ্গীরা ভাবিতে লাগিল ধন্য কর্তব্যজ্ঞান!

অর্থ-পুস্তক

কিছুদিন হইল অজীর্ণ ও দারিদ্র্যে ভুগিতেছি।

বন্ধুরা বলিল—ঔষধ খাও।

চিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ লইলাম, মূল্য দিলাম। ঔষধ খাইলাম, বলা বাহুল্য অজীর্ণ সারিল না এবং দারিদ্র্য বাড়িল।

পাঠক, তুমি বলিবে যে ভুল ঔষধ খাইয়াছি! কিন্তু না, ঔষধ ঠিকই হইয়াছিল—নচেৎ অজীর্ণ বাড়িবে কেন?

অজীর্ণ ও দারিদ্র্যের গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমে পড়িয়া যে অবস্থাবীর মুখে ভাসিয়া চলিয়াছি সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া এক স্বপ্ন দেখিলাম—স্বপ্নে এক দেবীর আবির্ভাব হইল।

আমি শুধাইলাম—মাতঃ, তুমি কে?

দেবী বলিলেন—বৎস, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ভালো করিয়া দেখ।

ভালো করিয়া দেখিয়া চিনিলাম—ইনি দেবী সরস্বতী। পঞ্জিকার পাতায় বীণাবাদিনীর যে মূর্তি দেখা যায় একেবারে ঠিক সেই মূর্তি। মায় সেই ধবধবে সাদা হাঁসটি পর্যন্ত।

আমি বলিলাম—মাতঃ, অপরাধ লইও না—প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই।

তিনি বলিলেন—তোমার আর দোষ কি? ইস্কুলে কলেজে তো আমার চর্চা কর নাই। না চিনিবারই কথা।

আমি বলিলাম—কলেজের দোষ দিও না, ততদূর পৌঁছাইতে পারি নাই।

তার পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—তা আপাতত আমার কাছে কেন জানিতে পারি কি?

তিনি বলিলেন—বৎস, তোমার দুঃখে মন বড় বিচলিত হইয়াছে—তাই আসিয়াছি।

আমি পুনরায় শুধাইলাম—মাতঃ, দীনের নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা কর—একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি তো কখনো তোমার সাধনা করি নাই—তবে এমন অযাচিত কৃপা কেন ?

দেবী বলিলেন—বৎস, তুমি আমার সাধনা কর নাই বলিয়াই তোমাকে আমি স্নেহ করি। আমার বড় বড় সাধকগণ যে পরিমাণে কালি আমার গায়ে নিক্ষেপ করে এ রকম আর কিছু দিন চলিলেই 'সব কাল হো যায়গা'।

এমন সময় দেবীর হাঁসটা শব্দ করিয়া উঠিল।

অমনি দেবী বলিলেন—এই দেখ, আমার বাহনটির দশা দেখ। আমার সাধকগণ উহার পালক ছিঁড়িয়া লইতে লইতে উহাকে দেউলে করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যে এ-সব কর নাই তাহাতে তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা হইয়াছে—তোমার দুঃখের সমাধান করিয়া দিতে আসিয়াছি।

আমি পুলকিত হইলাম।

দেবী বলিলেন -শোন চিকিৎসকেরা বলিয়াছে—তোমার আসল ব্যাধি অজীর্ণ। তাঁহারা অজীর্ণের চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমার মূল ব্যাধি দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের ঔষধ পড়িলেই অজীর্ণ সারিবে।

আমি বলিলাম - দেবতারা যে অন্তর্যামী এতদিনে তাহা বিশ্বাস হইতেছে—নহিলে এমন রহস্য কে আর উদ্ঘাটন করিতে পারিত ?

তখন তিনি বলিলেন—বৎস, এবার যাহা বলিতেছি - মন দিয়া শোন। দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ কর।

—পুস্তক ! ! !

দেবতারা শুধু অন্তর্যামী নহেন, পরিহাসরসিকও বটেন !

অন্তর্যামী আমার মনের কথা বুঝিলেন। বলিলেন—বৎস, অর্থপুস্তক লেখ—দারিদ্র্য দূর হইবে।

এই পর্যন্ত বলিয়া দেবী মিলাইলেন—স্বপ্নভঙ্গ হইল।

* * * *

পরদিন সকালে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম - ব্যাপার কি ? ভাবিলাম একবার স্বপ্নতত্ত্বটি ডাক্তার গিরিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিকালবেলা ডাক্তারের বাড়ির দিকে যাইবার সময়ে পার্শিবাগানের মোড়ে একখণ্ড কাগজ উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পড়িল !

এ কি কাকতালীয় যোগ ! না—কার্যকারণ যোগ ! এ যে অর্থপুস্তকের একখানি পাতা।

ডাক্তারের বাড়ি আর যাওয়া হইল না ! তখনই বাড়ি ফিরিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাতাটিকে আদর্শ করিয়া অর্থ-পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

তারপরে দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, বিকাল নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—কেবল অর্থ-পুস্তক লিখিয়া চলিয়াছি অর্থাৎ স্কুলের বইয়ের অর্থ লিখিয়া চলিয়াছি।

পাঠক, তোমাকে কিঞ্চিৎ নমুনা না দিয়া পারিতেছি না—এই স্বপ্নাদ্য ঔষধ তোমার কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে। মনে রাখিতে চেষ্টা করিও—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীয়ে এল বান।" এই দুরূহ ও বহু-তথ্যপূর্ণ ছত্রটিকে অর্থ-পুস্তকের সুদর্শন চক্রযোগে কেমন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি দেখ।

বৃষ্টি—মেঘ হইতে পতিত জলধারা বিশেষ

পড়ে—পতিত হয়

টাপুর টুপুর--পাতার উপরে জল-পতন শব্দ

নদেয়—নদীতে ; নদীয়াতেও হইতে পারে

এল—আগত হইল

বান—বন্যা ; বর্ষায় কূলব্যাপী জলরাশি।

পাঠক, দেখিলে তো ! কিন্তু এখনও সব দেখ নাই—আরও বিস্ময় জমা আছে। এইবার 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দেখ :

"ইহা বর্ষার কবিতাও হইতে পারে। আবার ভক্তিধর্মের প্লাবনে নদীয়ার অবস্থার বর্ণনাও হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে 'বৃষ্টি' অর্থ 'চোখের জল' ; চোখের জল পড়িয়া পড়িয়া নদীয়ায় বন্যা উপস্থিত হইল।"

পাঠক, এই অর্থ লিখিত না হইলে কি বাঙালীর ছেলে কবিতাটি

বুঝিতে পারিত! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—আমার অর্থ-পুস্তক পড়িবার আগে বাঙালীর ছেলে 'বৃষ্টি' কি জানিত না—'টাপুর টুপুর' কি জানিত না। আর ওই বহুপ্রচলিত ছত্রটিতে যে এত ভক্তিতত্ত্ব লুকানো ছিল তাহাই বা কে জানিত! ধন্য আমি! ধন্য আমার লেখনী! এক একবার নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নেহাৎ শরীর-সংস্থান বাম।

এখন আমার দরজায় প্রকাশকদের মোটরগাড়ি সর্বদা দণ্ডায়মান। তিনটি মুদ্রাযন্ত্র আমার অর্থ-পুস্তক ছাপিয়া সময় পায় না। হাজার হাজার ক্যান্‌ভাসার আমার বই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে।

আমার দারিদ্র্যব্যাধি সারিয়াছে, কাজেই অজীর্ণও আর নাই। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞান বলে, শক্তির ক্ষয় নাই—রূপান্তর আছে। সুতরাং আমার অজীর্ণ ও দারিদ্র্য বাংলার সুকোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে গিয়া চাপিয়াছে। আমি অর্থ-পুস্তকের প্রকৃত অর্থ এতদিনে আয়ত্ত করিয়াছি।

সরল থীসিস রচনা-প্রণালী

অনেক দিন পরে পথে হঠাৎ রামতনুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম —এ কি রামতনু, এতদিন দেখি নি, কোথায় ছিলে?

সে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল—আজ্ঞে না, একটু কাজ ছিল।

কাজ! তবে বোধ হয় বিবাহ করিতে গিয়াছিল!

বলিলাম—কি বিবাহ নাকি?

সে বলিল—আজ্ঞে, না, একটা ডিগ্রির চেষ্টায়।

অবাক হইলাম—রামতনু আবার কি ডিগ্রি লাভ করিবে!

আটবার চেষ্টা করিয়া এম. এ. পাস করিয়াছে সে।

—ডিগ্রি? কি ডিগ্রি বাপু?

সে বলিল—আজ্ঞে, পি-এইচ্. ডি.।

অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—পি-এইচ্. ডি, হোমিও?

লজ্জিত রামতনু বলিল—আজ্ঞে না, ডক্টর অব্ ফিলজফি।

—দিল কে?

—বিশ্ববিদ্যালয়।

একেবারে বসিয়া পড়িলাম। মাটিতেই বসিতাম, কিন্তু পাশে একখানা বেঞ্চি ছিল, টলিতে টলিতে গিয়া তার উপরে বসিলাম। রামতনু বোধ হয় মনে করিল আমি তাহার বিদ্যার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যার ধাক্কা কিনা জানি না, বিস্ময়ের ধাক্কা যে লাগিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনে পড়িল রামতনুর মতো নিরেট মূর্খ আমি দুটি দেখি নাই। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম. এ পাস করিতে যে ছয় বছর লাগে রামতনু তাহাকে বিশ বছরে পরিণত করিয়াছে। ইস্কুলে সে কয় বছর অধ্যয়ন করিয়াছে সে ইতিহাস আমার অজ্ঞাত। এখন তাহার বয়স চল্লিশের উপরে। সেই রামতনুর পি.-এইচ্. ডি. ডিগ্রিলাভ! নাঃ জগতে বিস্ময়ের অন্ত নাই দেখিতেছি।

রামতনুকে পাশে বসাইয়া তাহার ডিগ্রিলাভের ইতিহাস জানিয়া লইলাম।

রামতনু এ রহস্য প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা রাখিতে পারিলাম না—সাধারণের, বিশেষ ডিগ্রি-লাভার্থীদের হিতার্থে প্রকাশ করিলাম—আশা করি ইহাতে বাঙালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের প্রভূত উপকার হইবে।

আমি [রামতনু] এম. এ. পাস করিয়া দেখিলাম যে একটা পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি না পাইলে জীবনই বৃথা; চাকরি তো দূরের কথা, কেহ বসিতেও বলে না। কিন্তু ডক্টরেট্ লাভ করা সহজ নয়। অবশেষে গুরুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমাকে কেহ শিষ্য করিতে রাজি হয় না। কেহ বিদ্যার অভাব বলে, কেহ বুদ্ধির অভাব বলে, কেহ টাকার অভাব বলে!

একজন পরামর্শ দিল ডক্টরেটের পরিবর্তে মাথার চুল পাকাও, লোকে বিজ্ঞ মনে করিবে। আর একজন বলিল—আমেরিকা হইতে টাকা দিয়া একটা ডিগ্রি আনাইয়া লও! শ্যামবাজারের খুড়ো বলিল—আরে ছাই, গবেষণা শুরু করিয়া দাও। মাথা-মুণ্ডু যাহা মনে আসে লিখিয়া যাও। পুরু কাগজে ছাপিয়া ভালো করিয়া বাঁধাও, সোনার জলে নাম লিখিয়া দাও; এমন কিছুদিন করিতে থাকো, অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় তোমার বিদ্যার নর্দমা বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় ডক্টরেট্ দিয়া তোমাকে থামাইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু লিখিব কি? অবশ্যই ভুল লিখিব—কিন্তু ভুল লিখিতে হইলেও কিছু লিখিতে হইবে—তাই বা পাই কোথায়?

প্রায় যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা। একেবারে চারি চক্ষের মিলন। গুরু-শিষ্য পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল।

তিনি বলিলেন—ডক্টরেট্ চাও?

তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

তারপরে আরম্ভ করিলেন—বৎস, আরামতনু (এই উপসর্গটি আমার গুরুর দান) শোন, জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই; জ্ঞান সৃষ্টি করিতে হয়। যেমন ইঁট দিয়া নানা রকমের ইমারত তৈয়ারি করা যায়, তেমনি বর্ণমালার সমাবেশে জ্ঞান-জগতের সৃষ্টি। আশা করি তুমি বর্ণমালা জানো, কাজেই জ্ঞানও তোমার আয়ত্ত। এখন কেবল উপযুক্ত গুরুর অভাব।

আমি জানাইলাম যে তাঁহাকে পাইয়া তো সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—তোমার যে শুধু গুরুর অভাব পূরণ হইয়াছে তাহা নয়, আমারও উপযুক্ত শিষ্যের অভাব মিটিয়াছে।

তারপর তিনি সেই ধূমাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমাকে 'সরল থীসিস্ রচনা-প্রণালী' শিক্ষা দিলেন! নীহারিকা হইতে যেমন নক্ষত্রের সৃষ্টি, সেই ধূম হইতে আমার জ্ঞানের ধ্রুবনক্ষত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—থীসিস্ রচনা-প্রণালীর কয়েকটি মূলসূত্র আছে। প্রথম, থীসিস্‌কে যতদূর সম্ভব নীরস করিবে। ইহাতে কত সুবিধা দেখ;—সাধারণ

পাঠক ইহা পড়িবে না, আর যত কম লোক পড়িবে তত তোমার ফাঁকি ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম। তারপরে দেখ—পরীক্ষকগণও তোমার নীরস মরুভূমি তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্ম দ্রুত পাতা উল্টাইয়া যাইবেন, কাজেই সাপ, ব্যাঙ কি আছে লক্ষ্য করিবার সময় পাইবেন না। আবার দেখ, থীসিস্ যত বেশি শুষ্ক হইবে তত তোমার সম্বন্ধে পরীক্ষকের ধারণা উচ্চ হইবে, কারণ জ্ঞান জিনিসটা সহজ নয়! সাত্ত্বিকজ্ঞান শুষ্ক হরীতকীর মতো—কঠিন শুষ্ক, নীরস, কটু; শাঁস আছে কি নাই, থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটা বিচি!

দ্বিতীয়—থীসিস্‌কে যত পারো দীর্ঘ করিবে। বাল্যকাল হইতে লোকে শুনিতে আরম্ভ করে যে জ্ঞানসমুদ্র অপার, এমন কি স্বয়ং নিউটনও নাকি তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। নিরেট পাঁচ শ' পাতার টাইপ-করা ফুলস্কেপ কাগজের একটা পিরামিড দেখিলে এমন কোন্ দুঃসাহসী পরীক্ষক আছে যাহার হৃৎকম্প না উপস্থিত হইবে!

তৃতীয়—মনে রাখিবে শাস্ত্রের চেয়ে ভাষ্য সর্ব্বদা বড় হয়। অতএব একছত্র লিখিয়া অন্তত ত্রিশছত্র তাহার ফুটনোট দিবে। ছোট, বড়, মাঝারি, নানা রকম টাইপ দিয়া, নানা ভাষায় ফুটনোট থাকে থাকে নামিয়া গেলে আপনিই পরীক্ষকের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিবে। আর যদি কোন অরসিক সত্যই পড়িবার চেষ্টা করে, তবে বেশি দূর পড়িতে পারিবে না, কারণ ওই ক্ষুদে বর্জ্জাইস টাইপ পড়িতে পড়িতে সে নিশ্চয়ই অন্ধ হইয়া যাইবে।

চতুর্থ—এমন বিষয় নির্বাচন করিবে, যাহাতে সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। যে বিষয় কেহ জানে না, আর জানিতেও চাহে না, সেই বিষয়ে থীসিস্ যেমন চমৎকার হয়, এমন আর কিছুতে নয়। খবরদার, জীবনের সঙ্গে থীসিসের যোগ করিতে কখনো চেষ্টা করিও না।

বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিও, তোমার থীসিসে যেন সহজ সত্য না থাকে; জীবনের ছায়া না থাকে; জ্ঞানের তৃষ্ণা পানীয় না থাকে। মৌলিক দৃষ্টিকে সর্বদাই এড়াইয়া চলিবে। কখনও সুবোধ্যভাষা ব্যবহার করিবে না,

এবং কিছুতেই যেন থীসিসটি সুখপাঠ্য ও সরল না হয়। থীসিসের ভাষা প্রতি ছত্রে ছত্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে থাকিবে, প্রথম কয়েক ছত্রের আঘাতেই পরীক্ষকের চুপাটি দন্ত নির্দন্ত হইবে, তারপরে অনায়াসে সবটা তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবেন।

এইরূপে প্রাথমিক ভূমিকা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—বৎস, এবার নিম্নের কয়েকটি ছত্রকে তুমি থীসিসে পরিণত কর:—

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; অবশেষে সে এক বকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।"

ব্যস্; এইবার পাণ্ডিত্য, অভিধান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও উপযুক্ত পরিমাণে অজ্ঞতা মিশাইয়া এই কয়েক ছত্রকে থীসিসে পরিণত করিয়া ফেল।

বাঘ ও বক শব্দের উপরে জোর দিবে। কত রকম বাঘ ও বক আছে তাহার সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত কর। তারপর পৃথিবীর সাহিত্যে কোথায় কোথায় বাঘের ও বকের উল্লেখ আছে সংগ্রহ কর। তারপরে বাঘ ও বকের উল্লেখ একত্র কোথায় আছে সংগ্রহ কর—দেখিবে ইহাতেই প্রায় দেড়শত পাতা ভরিয়া যাইবে।

তার পরে দেখ—এই গল্পটির মূলে ঈসপের লেখাতে বাঘ ছিল 'উল্ফ'; বাংলাদেশে আসিয়া তাহা হইয়াছে 'বাঘ'; এখন এই সূত্রকে অনুসরণ করিয়া আরও পঞ্চাশ পাতা লিখিবে। এখানে গ্রীসের ও বাংলাদেশের ভূগোল লইয়া একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিবে। বলিবে যে বাংলাদেশের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রভাবে গ্রীক 'উল্ফ' 'বাঘ' হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গত সুন্দরবন, পর্তুগীজ দস্যু ও পর্তুগাল সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখিবে। তারপরে বাঘ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ফুটনোটে লিখিবে—'হাজারিবাগ' নামের ব্যুৎপত্তি কি? নিশ্চয় কোন সময়ে এখানে এক হাজার ব্যাঘ্র ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিবে এখনো দুই-চারটি বাঘ দেখা যায়।

এই ফুটনোটের ফুটনোটে বলিবে 'বাগবাজার'-এর মৌলিক নাম ব্যাঘ্রবজ্র', ইহার সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ের 'বজ্র' শব্দের যোগ আছে।

এখানে পুরাকালে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল; বর্গীদের অত্যাচারে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তুমি একখানি প্রাচীন তাম্রলিপি হইতে এসব কথা জানিতে পারিয়াছ; তাম্রলিপিখানি এতদিন তোমার কাছেই ছিল, সম্প্রতি খোয়া গিয়াছে। তারপরে 'বক' সম্বন্ধে লিখিবে; মহাভারতের ধর্ম্মরূপী বকের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যত বক পাইয়াছ উল্লেখ কর।

তারপরে এই গল্পের রাজনৈতিক ভাষ্য করিবে—ইউরোপ হইতেছে বাঘ, এশিয়া বক। ইউরোপ নিজের বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য এশিয়ার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিতেছে। এইখানে সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, কম্যুনিজম্‌, জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটা গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করিবে।

এইরূপে উপদেশ দিয়া গুরু বলিলেন—যাও বৎস, এখন বাড়ি গিয়া থীসিস্‌ লিখিতে আরম্ভ কর। আমার কথা মনে রাখিলে নিশ্চয় কৃতকার্য হইবে।

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া আমি ছয় মাস পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাগারে ঘুরিয়া সাড়ে সাতশ' পাতার এক জগদ্দল থীসিস্‌ লিখিয়া ফেলিলাম —এবং অবশেষে একটি শুভদিন দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিয়া দিলাম।

চারমাস পরে একদিন চিঠি পাইলাম যে আমার থীসিস মনোনীত হওয়ায় আমি ডিগ্রিলাভ করিয়াছি।

রামতনু বলিল যে তিনজন পরীক্ষকই একবাক্যে আমাকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার লিখিয়াছেন—"এরূপ অত্যাশ্চর্য থীসিস্‌ যে লিখিত হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। বাঙালী ছাত্রটির মাথার মধ্যে কি আছে দেখিতে কৌতূহল হয়।"

পাঞ্জাবের প্রফেসার বলিয়াছেন—" 'What Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow.' আশা করিতেছি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রেরা কি করিয়া থীসিস্‌ লিখিতে হয় তাহা বাঙালীর কাছ হইতে শিখিবে।"

কলিকাতার প্রফেসার লিখিয়াছেন—"অহো কি প্রগাঢ় জ্ঞান—কি সারগর্ভ চিন্তা! অহো কি হৃদয়গ্রাহী ভাষা! অহো ইতিহাসের অন্ধকার গুহার মধ্যে কি সাহসের সহিত প্রবেশ! এই একখানিমাত্র গ্রন্থ রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের আর সব পুড়াইয়া ফেলা চলে। এতদিন পরে বাঙালীর দুর্নাম ঘুচিবে—স্কলার বলিয়া খ্যাতি বাড়িবে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় এই পণ্ডিত-প্রবরকে একখানি চেয়ার দিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন।"

এই পর্যন্ত বলিয়া রামতনু থামিল। আমি কাঁদিব কি হাসিব স্থির করিতে না পারিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম।

শেষে বাড়ী ফিরিয়া স্থির করিলাম বাঙালী জাতির, বিশেষ বাঙালী ছাত্রদের হিতার্থে ইহা প্রকাশ করা উচিত। তাই ঠিক যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিয়া কাগজে দিলাম। কেবল রামতনুর গুরুর নাম চাপিয়া গেলাম, কারণ তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রামতনুর নামটাও ছদ্মনাম। আর এই প্রবন্ধের লেখকের নামটাও আমার নাম নয়; আমার সত্য নাম গোপন করিয়া এই বেওয়ারিশ নামটা ব্যবহার করিলাম।

চিত্রগুপ্তের এড্‌ভেঞ্চার

এক দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীমান্ চিত্রগুপ্ত নন্দন-বনের একধারে বসিয়া পারিজাতের ডাল দিয়া দন্ত-মর্জনা করিতেছিল! এমত সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন,—বৎস চিত্রগুপ্ত, তোমাকে একবার বঙ্গদেশে যাইতে হইতেছে।

এই অশুভ সংবাদে চিন্তিত হইয়া চিত্রগুপ্ত শুধাইল—পিতামহ, হঠাৎ এরূপ আদেশের কারণ কি? মিতামহ বলিলেন, তবে শোন। অনেক দিন হইল বঙ্গদেশ হইতে যে সব রিপোর্ট আসিতেছে, তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। তরুণ দেবতারা বলিতেছে—পিতামহ বুড়া মানুষ, তাঁহার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। আর তাড়াতাড়িতে এতবড় বিশ্বসৃষ্টির সময়ে যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!

চিত্রগুপ্ত শুধাইল—ভুলটা কি?

পিতামহ বলিলেন—তাহারা বলিতেছে বঙ্গজাতি সৃষ্টি করিবার সময়ে আমি না কি তাহাদের মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অর্থাৎ বুদ্ধি ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এতদিন ঘটনাটা চাপা ছিল, সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহাতেই এই তথ্যটা ধরা পড়িয়াছে।

চিত্রগুপ্ত বলিল—সে কি পিতামহ মস্তিষ্ক ছাড়া কি মানুষ হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন—হয় কি না হয়, অনুসন্ধান করিবার জন্যই তোমাকে একবার কষ্ট করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানীতে যাইতে হইবে। মনে রাখিও তোমার রিপোর্টের উপরেই বঙ্গজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সত্যই যদি উহাদের মাথার মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুল হইয়া গিয়া থাকে—তবে জাতিটাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে দেবতারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে 'এন্‌কোয়ারি কমিটি' বসাইয়াছে তাহার কাজ বন্ধ থাকিবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চিত্রগুপ্ত বঙ্গদেশে যাইতে প্রস্তুত হইল; ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমার মাহিনার বিষয় বিবেচনা করিব।

২

চিত্রগুপ্ত বঙ্গজাতির বেশে বঙ্গদেশের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একদিন সে দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ এক জন-প্রবাহ রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছে; তাহাদের হাতে লালরঙের পতাকা; পতাকায় নানারূপ বাণী লিখিত; মুখে মুখে মুহুর্মুহু 'মিল্‌মিলাব কৈজাবাদ' ধ্বনি। এই শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে যাহারা চলিয়াছে তাহাদের অতি দীনবেশ, কিন্তু যতই পিছনে যাওয়া যায় লোকের বেশ-ভূষা মূল্যবান্‌, সবশেষে যাহারা আছে তাহারা মোটরে ও অশ্বযানে চলিয়াছে। চিত্রগুপ্ত এ হেন দৃশ্য কখনও দেখে নাই; কাজেই বুঝিতে পারিল না এ জাতীয় শোভা-যাত্রার উদ্দেশ্য কি? তবে এটুকু বুঝিল, কিছু গুরুতর না ঘটিলে জন-প্রবাহ এরূপ শিঙ্খলভাব

ধারণ করে না! ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে পতাকাধারী এক ব্যক্তিকে শুধাইল, মশাই এ শোভাযাত্রা কিসের জন্য? সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনি নিশ্চয় বঙ্গজাতির লোক নন, নতুবা এ প্রশ্ন আপনার মনে উঠিত না। তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল, এ জাতীয় প্রশ্ন করা মহাঅপরাধ। কিসের জন্য এ শোভাযাত্রা আমি জানি না। তবে ইহাতে যোগ না দিলে অপরাধ আরও গুরুতর তাই আসিয়াছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

চিত্রগুপ্ত পিছনের একব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করিল। সে বলিল, এ প্রশ্ন কখনও আমার মনে জাগে নাই, জন্ম হইতেই এই জাতীয় শোভাযাত্রা দেখিতেছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করুন।

চিত্রগুপ্ত ক্রমে পিছনে আসিতে লাগিল, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এই শোভাযাত্রার অর্থ কি। অবশেষে সে সবচেয়ে পিছনের মোটরারূঢ় এক নধরকান্তি পুরুষকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। সেই ব্যক্তি বলিল, দেখুন, আমি বুঝিতেছি আপনি নিশ্চয় বঙ্গজাতির লোক নন, কারণ তাহাদের মনে কখনও প্রশ্ন জাগে নাই। আপনাকে এই অঙ্গীকারে বলিতেছি যে, আপনি ইহা অপরকে বলিবেন না। আমার এক প্রবল শত্রুর একটি লোহার কারখানা আছে, প্রতিযোগিতায়, আমার কারখানা কিছুতেই তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতেছে না, এমন চলিলে শীঘ্রই আমাব সর্ব্বনাশ হইবে। তাই আমি দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া দিয়াছি; সে লোকটা যে দেশের শত্রু ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছি; তার কারখানার মজুররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে—এখন আমরা সকলে মিলিয়া চলিয়াছি সেই কারখানা ধ্বংস করিতে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, লোকে কি প্রশ্ন করিল? জানিতে চাহিল না কি করিয়া লোকটা দেশের অনিষ্ট করিতেছে?

নেতা বলিল, আগে ওরকম বিরক্তিকর প্রশ্ন করিত, কিন্তু যেদিন হইতে তারা আমার হেপাজতে তাদের মস্তিষ্ক 'safe deposit' রাখিয়াছে, তারপর হইতে প্রশ্ন করিবার মত বুদ্ধি আর তাহাদের নাই।

বিস্মিত চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি? সকলেরই তো মাথা দেখিতেছি।

নেতা বলিল, মাথা থাকিলেই মস্তিষ্ক থাকে না। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে আপনিও দেখিবেন এরা সবাই কবন্ধ।

চিত্রগুপ্ত বলিল, ভাল! কিন্তু ওই 'মিল্‌মিলাব্‌ ফৈজাবাদ' ধ্বনির অর্থ কি?

নেতা বলিল, সিংহ যে গর্জ্জন করে তাহার অর্থ কি? শুনুন তবে বলি, এ রঙ্গদেশ, এখানে অর্থ বলিতে ধাতু-মুদ্রা বুঝায়। অন্য কোন জাতীয় অর্থ এদেশে আশা করিবেন না। 'মিলমিলাব্‌ ফৈজাবাদ' ধ্বনিতে অর্থ নাই, কেবল শব্দ আছে—আর নিরর্থক শব্দে রঙ্গজাতি যেমন অনুপ্রাণিত হয় এমন আর কিছুতেই নয়।

এই ব্যাপার দেখিয়া চিত্রগুপ্তের মানসাকাশে ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের ধূমকেতু উদিত হইতে লাগিল।

৬

রঙ্গদেশের রাজধানী প্রান্তে এক হ্রদ আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্রগুপ্ত সেখানে যাইত; দিনের অভিজ্ঞতা পরিপাক করিবার জন্যও বটে, আবার সারাদিনের ঘটনার রিপোর্ট লিখিবার জন্যও বটে।

একদিন সে দেখিতে পাইল অদূরে একটি শ্যাওড়া গাছের তলায় একখানা বেঞ্চিতে একটি তরুণী ও একটি যুবক উপবিষ্ট। তরুণীটি অতিশয় সুন্দরী।

চিত্রগুপ্তের চোখ উর্ব্বশী-মেনকা-প্রুফ, অর্থাৎ যাকে তাকে চোখে ধরে না। কিন্তু এ নারী যে-সে নয়; এমন কি তাহার স্বর্গীয় চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই পুরুষটির প্রতি সে ঈর্ষ্যা অনুভব করিল। দৈবশক্তির বলে সে শুনিতে পাইল মেয়েটি যুবককে বলিলেন, যতদিন না এই হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত হয় ততদিন আমি তোমাকে ভালবাসিব। ইহা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বুঝিল যুবকটির ভাগ্য ঈর্ষ্যা করিবার মত বটে।

পরদিন আবার সে রিপোর্ট লিখিবার জন্য এবং সেই তরুণীকে দেখিবার

জন্য হ্রদের ধারে গেল। সে দেখিতে পাইল সেই তরুণীটি সেই স্থানে বসিয়া আছে, কিন্তু এ কি! তার পাশে যে যুবকটি সে তো আগের দিনের ব্যক্তি নয়! আজও সে শুনিতে পাইল, মেয়েটি সেই পূর্ব্ব দিনের মত অঙ্গীকার করিতেছে, হ্রদের জল লবণাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে তাহাকে ভালবাসিবে।

ইহার পর প্রতিদিন সেই মেয়েটিকে সে লক্ষ্য করিয়াছে, প্রতিদিন তাহার পাশে নূতন এক যুবক, কিন্তু প্রতিদিন সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে সে বুঝিল রঙ্গদেশের আধুনিকার বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত এবং সে বিবাহের স্থায়িত্ব একটি দিনমাত্র। সে ভাবিল, স্বর্গে গিয়া এই 'দিনান্ত' বিবাহ সম্বন্ধে গোটা-দুই বক্তৃতা করিবে।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় হ্রদের ধারে গিয়া আর সে তরুণীকে দেখিতে পাইল না। তার বদলে দেখিল তরুণীর সঙ্গী যুবকদল হ্রদের ধারে বসিয়া হায় হায় করিতেছে, আর মাঝে মাঝে হ্রদের জল এক অঞ্জলি তুলিয়া মুখে দিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে। জল মুখে দিয়া কাঁদিবার কি কারণ ঘটিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া সেও এক অঞ্জলি জল তুলিয়া মুখে দিল, দেখিল, হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত। তরুণীর প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল! কিন্তু হ্রদের জল লবণাক্ত হইল কি রকমে?

সে পাশের একটি যুবককে ইহার রহস্যটা কি জিজ্ঞাসা করিল। যুবকটি বলিল, আর বলেন কেন? মেয়েটি, পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে রাতারাতি সাতাশ হাজার মন লবণ আনিয়া হ্রদের জল লবণাক্ত করিয়া দিয়াছে। রঙ্গজাতির আধুনিকারা পতিপরিবর্ত্তন করে কিন্তু মতি-পরিবর্ত্তন করে না। অঙ্গদান করে কিন্তু অঙ্গীকার দান করিলে তাহা যথাসাধ্য রক্ষা করে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, তবে তো আপনাদের বড় দুঃখ দেখিতেছি?

যুবকটি বলিল, দারুণ দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনালাভ করা রঙ্গজাতির অভ্যাস। আমরা হতভাগ্য এই কয়জন মিলিয়া এই হ্রদ ইজারা লইয়াছি এখন জল শুকাইয়া লবণ করিতে পারিলে দু'পয়সা ঘরে আসিবে; দ্বিগুণ দামে বেচিতে পারিব, রাজধানীতে এক ছটাক লবণও নাই।

কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায় ?

যুবক বলিল, ওই লবণের পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে গিয়াছে।

সেখানেই কি বরাবর থাকিবে ?

যুবকটি বলিল, কেমন করিয়া বলিব ? ইহার পরে চিনি আছে, গুড় আছে, হ্রদের জলের কত রকম স্বাদপরিবর্ত্তন হইবে, দেখিতে পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এমন রূপময়ী নারী হাতছাড়া হওয়াতে দুঃখ হইতেছে না ?

যুবক বলিল, রূপ ভাল, কিন্তু রূপা আরও ভাল, ইহাকেই বলে, "ইকনমিক ইণ্টারপ্রিটেশন অব্ লাভ !"

চিত্রগুপ্ত সেইদিন হইতে হ্রদে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

৪

বঙ্গদেশের সাহিত্যের খ্যাতি স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল ; চিত্রগুপ্ত শুনিয়াছিল এমন উচ্চদরের সাহিত্য না কি কোনও দেশে কখনও সৃষ্ট হয় নাই ; সাহিত্য উচ্চদরের হইলে সাহিত্যিকরাও অবশ্য উচ্চদরের হইবেন, চিত্রগুপ্তের ইচ্ছা হইল একবার তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। স্বর্গে সে অবশ্য ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতিকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তো প্রাচীন কবি ; আধুনিক কবিগণকে দেখিয়া, সে জন্ম সার্থক করিবে।

সে 'সোম'রসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি টেবিলের চারিপাশে কয়েকজন সাহিত্যিক তাস খেলিতে বসিয়াছে, আর কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই খেলা দেখিতেছে। খেলিতে খেলিতে পরস্পরের প্রতি যে-সব বাক্য তাহারা প্রয়োগ করিতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্রগুপ্তের কেমন যেন লাগিল,—ইহা কি ব্যাস-বাল্মীকির সগোত্রদের উচিত ভাষা।

আর একখানা টেবিল ঘিরিয়া একদল সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকা গল্পগুজব করিতেছে। চিত্রগুপ্তের একটা বিষয় বড় রহস্যজনক বলিয়া মনে

হইল—ইহারা সকলেই বঙ্গজাতির লোক, কিন্তু নামগুলা এমন বিদেশী কেন? কাহারও নাম বার্ণার্ড শ, কাহারো নাম জয়েস, কাহারও কাহারও নাম প্রুস্ত, কাহারও নাম এলিয়ট, কেহ স্পেণ্ডার, কেহ হুইটম্যান, কেহ বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। ব্যাপার কি?

কোন এক মাসিকপত্রে ইহাদের একজনের একখানা বইয়ের নিন্দা করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল।

প্রুস্ত বলিল, শালা লেখককে দেখে নেব; লিখব এমন এক প্রবন্ধ।

এলিয়ট বলিল, লিখে কি হবে? বেটার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে সরে পড়ো।

বার্ণার্ড শ বলিল, তা হ'লে লোকটা বেঁচে যাবে। তার চেয়ে ও যখন গলি দিয়ে বের হয় ওর মাথায় মারো একখানা থান-ইট ছুঁড়ে।

স্পেণ্ডার বলিল, ওসব কিছু হবে না। চল ওর বাপের নামে কেচ্ছা লেখা যাক্।

ইহা শুনিয়া সকলে সমস্বরে 'হিপ হিপ, হুর্‌রে', করিয়া উঠিল।

আর একখানি টেবিলের পাশে কয়েকজন সাহিত্যিক বসিয়া নীরবে বোতল হইতে কি যেন ঢালিয়া ঢালিয়া পান করিতেছে। গন্ধটা যেন পরিচিত। ইন্দ্রের নৈশ দরবারে অনুরূপ গন্ধ অনেকবার সে দূর হইতে পাইয়াছে। ইহাদের কথা বলিবার পর্য্যন্ত অবকাশ ছিল না।

সে ফিরিয়া তাস-খেলোয়াড়দের কাছে গেল; তাহারা তখন তাস ছাড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে—ব্যাপার কি? অনেক অনুধাবন করিয়া বুঝিল, কারণ একজন রমণী। কে সেই রমণী? একটু সন্ধান করিতেই দেখিতে পাইল, একান্তে এক সুন্দরী তরুণী উপবিষ্টা; হ্রদের ধারের বহু-বল্লভা সেই নারী।

ক্রমে ক্রমে সকলে সেখানে আসিয়া জড়ো হইল—তখন মারামারি গালাগালি এমন উচ্চগ্রামে উঠিল যে একটা কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কেবল সেই যাহারা সন্দেহজনক পানীয় পান করিতেছিল তাহারা আসিল না, তখন তাহারা সমভূমি হইয়া শায়িত।

চিত্রগুপ্ত ছুটিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। ট্রামের পয়সায়

জন্য পকেটে হাত দিয়া দেখিল পকেট শূন্য, কোর্টের পকেট শূন্য, সার্টের পকেট শূন্য, ফতুয়ার পকেট শূন্য। 'সোমরসে' আসিবার সময়ে পকেটে টাকা-পয়সা ছিল। বুঝিল সাহিত্যিকদেরই এ কাজ। ধন্য তাহাদের শিক্ষা। একসঙ্গে পর-পর তিন জামার তিন দুগুণে ছয় পকেট কাটা অসামান্য প্রতিভার লক্ষণ।

৫

চিত্রগুপ্ত থিয়েটার দেখিবার জন্য টিকিট করিয়াছে, কিন্তু পথ ভুলিয়া থিয়েটারে ঢুকিতে বঙ্গদেশের আইন-পরিষদে গিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিল বিরাট প্রাসাদ, হাঁ বঙ্গদেশের যোগ্য থিয়েটার বটে। সুসজ্জিত আসনের একটাতে সে বসিল। দেখিল, রঙ্গমঞ্চে কাতারে কাতারে অভিনেতারা বসিয়া আছে, সাজ-সজ্জা দেখিয়া বুঝিল ইহারা সব কুরুপাণ্ডব। ওই যে বিরাটকায় পুরুষ, উনি নিশ্চয় ভীম; আর ওই যে চাপকান-সমন্বিত পুরুষ উনি নিশ্চয় দুর্য্যোধন। মাঝখানে ঘাড়ে-গর্দ্দানে যে লোকটা বসিয়া সে নিশ্চয় ধৃতরাষ্ট্র। ওই যে একদিকে অতি ক্ষীণকায়া দ্রৌপদীকেও দেখা যাইতেছে। সে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দুর্যোধন উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—ভাই সব আজ এই সভায় স্থির করিতে হইবে সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে, না পূব দিকে?

পাণ্ডবের দল ধিক্কার দিয়া উঠিল।

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, এসব কথা তো মহাভারতে নাই। ভীম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়, আমি সহস্রবার সূর্য্যকে পূবে উঠিতে দেখিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, আপনি দেখিলে কি হইবে? পাণ্ডবের চোখকে কৌরবগণ বিশ্বাস করে না, কারণ তাহাদের চোখ মোহগ্রস্ত।

পাণ্ডবের দল হইতে বিরূপাক্ষ বলিয়া উঠিল, আর কৌরবের চোখ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ অন্ধের পুত্র অন্ধ।

দুর্য্যোধন বলিলেন, সভাপতি মহাশয়। বাপ তুলিয়া কথা বলা কি বে-আইনি নয়?

সভাপতি উত্তর দিবার আগেই বিরূপাক্ষ বলিল—বাপ যদি বে-আইনি না হয় তবে তার উল্লেখ বে-আইনি হইবে কেন?

পাণ্ডবের দল হো হো করিয়া, হাসিয়া উঠিল; একজন বলিল শুনুন, শুনুন।

কৌরবের দল বলিল, ধিক্ ধিক্!

সভাপতি রায় দিলেন, বাপ বে-আইনি নয়; তাহার উল্লেখ বে-আইনি।

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, ভাই সব, বর্ত্তমান যুগে চোখের উপর বিশ্বাস নাই। আমরা ভোট দিয়া স্থির করিব সূর্য্য কোন্ দিকে ওঠে। আপনারা কি দেশের জন্য, দশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ডাল-ভাতের জন্য কৌরবের দিকে ভোট দিবেন না? সূর্য্যের উদয় স্থির করিবার কি অধিকার পাণ্ডবদের আছে? উহারা সংখ্যায় কম; এ রাজ্য আমাদেরই; উহারা পুনরায় বনে যাক্।

তখন সভাগৃহের চারিদিক হইতে বিড়াল, কুকুর, গর্দ্দভ, বৃষভ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী নানা জাতীয় পশুপক্ষী ডাকিয়া উঠিল।

সভাপতি বলিলেন, এ বিষয়ে তর্ক বৃথা। আপনারা ভোট দিবার জন্য প্রস্তুত হোন।

ইহা শুনিয়া ভীম বলিয়া উঠিলেন, ভ্রাতৃগণ তোমরা যদি পাণ্ডবের দিকে হও, যদি আত্মসম্মান থাকে, যদি সত্য বলিবার সাহস থাকে, যদি স্বচক্ষে কখনও সূর্য্যোদয় দেখিয়া থাক তবে এস আমার সঙ্গে সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে এস।

ইহা শুনিয়া ভীমকে অনুসরণ করিয়া পাণ্ডব দলের অনেকে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কৌরবের দল ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা হাত গুণিয়া স্থির করিল পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে ১৪৭ জন; আর পূবে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে মাত্র ২৭ জন।

প্রধান মন্ত্রী বললেন, আজ হইতে বঙ্গদেশে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহার বিপরীত কথা কেহ বলিলে বঙ্গদেশের আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। সভা ভঙ্গ হইল!

চিত্রগুপ্ত বাহির হইয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল তাহার পাঁচ সিকা পয়সা সার্থক হইয়াছে, এমন সুন্দর অভিনয় দেখিবার আশা সে করে নাই।

৬

চিত্রগুপ্ত ট্রামে ফিরিতেছে, এমন সময়ে দেখিল এক ছোকরা হাঁকিতেছে, লিয়ে লিন বাবু, চার চার পয়সা, নূতন আইন—"গীতায় হস্তান্তরবাদ," লিয়ে লিন্।

গীতায় হস্তান্তরবাদ! চিত্রগুপ্ত গীতায় জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কিছু জানে! ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চার পয়সা দিয়া একখানা বই কিনিয়া ফেলিল। বই পড়িয়া দেখিল—ব্যাপার আর কিছু নয়, মহাজনকে কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, নিজের সম্পত্তি কি ভাবে আইন-সঙ্গত উপায়ে বেনামী করা যায়, সেই সম্বন্ধে উদার সব আইন ইহাতে বিধিবদ্ধ। বঙ্গজাতি অত্যন্ত গীতাপরায়ণ, সেইজন্য গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝানো হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের গূঢ় মর্ম্ম কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ নয়—ঋণ-যোগ, ঋণীরা স্বভাবতই নিষ্কাম, অর্থাৎ ঋণশোধ করিবার ইচ্ছা তাহাদের থাকে না; কিন্তু অবুঝ মহাজনরা প্রায়ই নিষ্কাম হয় না—টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। এক্ষনে তাহাদের নিষ্কামকর্ম্ম শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; মহাজনরা যাহাতে দয়াবদ্ধ সম্পত্তি ধরিতে না পারে, তজ্জন্য সম্পত্তি কি ভাবে আইন বাঁচাইয়া হস্তান্তর করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সংক্ষেপে ইহারই নাম "গীতায় হস্তান্তরবাদ।"

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, দেবতারা মিছা অপবাদ দেন যে ব্রহ্মা বঙ্গজাতির মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি মস্তিষ্কের পরিচয় না হয় তবে আর কিসে মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে?

সে পার্শ্ববর্ত্তী আরোহীকে বলিল, মশায়, এই যে আইন, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে?

সে লোকটা হাঁ করিয়া থাকিল, শুধাইল 'ন্যায়' কাহাকে বলিতেছেন? বঙ্গদেশে ও কথা কখনও কেহ শোনে নাই।

চিত্রগুপ্ত অবাক! সে বলিল, সে কি মশায়, এ আইন তো ধর্ম্মসঙ্গত নয়।

—ধর্ম্ম? লোকটা আরও বেশী অবাক্ হইল! এমন সময়ে ট্রামের কণ্ডাক্‌টার আসিয়া তাহাকে বলিল, ট্রাম কোম্পানীর নিয়ম যে, ট্রামে কেহ অশ্লীল কথা বলিতে পারিবে না। আপনি হয় চুপ করুন, নয় নামিয়া যান।

ট্রামের সকল যাত্রী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, কথা ঠিক! ওরকম অশ্লীল কথা আমরা শুনিতে পারি না। কণ্ডাক্‌টার তাহাকে নামাইয়া দিল।

কয়েকজন লোক তাহার সঙ্গে নামিয়া পড়িল; এবং 'ন্যায়,' 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য্য অশ্লীল কথা বলিবার জন্য তাহাকে মারিতে গেল। চিত্রগুপ্ত প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। পথের সব লোক তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল, কেহ বলিল, শালা জার্ম্মানীর গুপ্তচর; কেহ বলিল পঞ্চম বাহিনীর লোক; কেহ বলিল, শালা গান্ধীর চর, বঙ্গদেশকে আর কিছুতেই জব্দ করিতে না পারিয়া এখন বঙ্গজাতির নীতিজ্ঞান মাটি করিতে আসিয়াছে।

প্রাণভয়ে ভীত চিত্রগুপ্ত জনতাকে বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং সম্মুখে দেখিল এক বৃহৎ বাড়ী; আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চিত্রগুপ্ত ভাবিয়াছিল, এখানেও আশ্রয় পাইবে না, কিন্তু এই বাড়ীটার বাসিন্দাদের ব্যবহারে সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা চিত্রগুপ্তকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল, আশ্রয় দিল, আহার্য্য দিল, অভয় দিল; তাহাদের সৌজন্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এমন ছুটিয়া এখানে প্রবেশ করিলেন কেন?

চিত্রগুপ্ত সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিল, ধর্ম্ম, ন্যায় সত্য প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করাতেই আমার এ দুর্দ্দশা। আপনারা কি ওসব কথা শোনেন নাই?

তাহারা একবাক্যে বলিল, তাহাদের দুর্দ্দশার মূলে ওই সব কথা। তাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতি কথা বলিত বলিয়াই এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এ বাড়ীটা কি?

তাহারা বলিল, ইহা পাগলা গারদ এবং আমরা পাগল।

চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি! এই রঙ্গদেশে আপনাদেরই তো কেবল প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

তাহারা বলিল, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা সংখ্যায় কম! তবে শুনুন, পৃথিবীতে পাগল দুই জাতীয়—বদ্ধপাগল ও মুক্তপাগল। বদ্ধপাগলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়! মুক্তপাগল অসংখ্য। বদ্ধপাগলেরা গারদে থাকে, মুক্তপাগলেরা সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, আপনারা কতদিন এখানে থাকিবেন?

তাহারা বলিল, যতদিন না মুক্তপাগলের দলে যোগ দিই অর্থাৎ ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি শব্দ কখনও যে শুনি নাই, ও সব পদার্থ যে রঙ্গদেশে নাই এ কথা যতদিন না স্বীকার করি।

চিত্রগুপ্ত বলিল, মহাশয়, যতদিন আমি রঙ্গদেশে থাকিব, আপনাদের আশ্রয়ে থাকিব; রঙ্গদেশে যদি ভদ্রলোকের স্থান থাকে তবে তাহা এই পাগলা গারদ।

*

চিত্রগুপ্ত রঙ্গদেশের পাগলা গারদে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিল। সে লিখিল, রঙ্গদেশে ভ্রমণ করিলাম। পিতামহ ব্রহ্মা যে ইহাদের মাথার খুলির মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা মনে হয় না, কারণ কোন কোন বিষয়ে ইহারা অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া থাকে, যাহা স্বর্গের অনুকরণযোগ্য। তবে রঙ্গদেশ ভাল কি মন্দ, এক কথায় বলা সম্ভব নয়। বরঞ্চ বলিতে গেলে বলিতে হয়,

ইহা ভালও নয়, মন্দও নয়, ইহা অপূর্ব্ব—অর্থাৎ বঙ্গদেশের কবির ভাষায়—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

এই দেশের সৃষ্টি ব্রহ্মার অসাধারণ কারু-কৌশলের পরিচয়। এ দেশ নষ্ট হইয়া গেলে বিশ্ব হইতে একটা অদ্ভুত জিনিষ নষ্ট হইবে, কাজেই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক।

পুনশ্চ

এ দেশে যাহাতে তরুণ দেবতারা না আসিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; আসিলে তাঁহারা ফিরিতে চাহিবেন না; আমি বৃদ্ধ এক এক বার আমারই ফিরিতে অনিচ্ছা হইতেছিল; মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এ দেশে অবাঞ্ছনীয় ভাবে প্রবল! ইতি—

মারণ-যজ্ঞ

তোমরা যাই বল না কেন—ইউরোপের মত এমন পরার্থপর দেশ আর নাই!

কেন?

কেন বুঝিবে কেমন করিয়া! নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ যাহারা করে নিজের গলা কাটিয়া পরের যাত্রার আসর-জমাইবার মর্য্যাদা তাহারা বুঝিবে কি করিয়া?

গত মহাযুদ্ধের কথা মনে আছে? যখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছিল তখন আমরা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া বড় বড় মানচিত্র আর লাল নীল পিন কিনিয়া কোন্ পক্ষ কত দূর অগ্রসর হইল নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ইউরোপের নদীনালা সহর গ্রাম পাহাড় পর্ব্বত তখন বেশ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল! আমরা, ভারতীয়েরা, চিরদিনই ইতিহাসের চার আনার গ্যালারীর দর্শক; দূরে থাকিয়া দেখি, চানাচুর চিবাই, হাততালি দিই আর সংবাদপত্র পড়ি।

সেই হইতে সংবাদপত্র পড়িবার অভ্যাস ছাড়ি নাই—বরঞ্চ অন্যসব অভ্যাস ছাড়িয়াছি।

সত্য কথা বলিতে কি, আজকাল সংবাদপত্র ছাড়া আর কিছু পড়ি না। আবার সংবাদপত্রেরও সবটা নয়, কেবল বৈদেশিক সংবাদ আর পাটের বাজারের পূর্ব্বাভাষ! কবে যুদ্ধ বাধিবে আর কবে পাটের দর চড়িবে।

কেন?

আচ্ছা তবে খুলিয়া বলি! ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাট জন্মে? যুদ্ধ বাধিলেই পাটের দর চড়িবে—পাটের দর চড়িলেই বাঙ্গালী কৃষকের অবস্থা ভাল হইবে, তাহার অবস্থা ভাল হইলেই তোমারও ভাল।

যখন পরহিতের জন্য (কারণ আমার পাটের ক্ষেত নাই) প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ নন্দ-দা আসিয়া হাজির!

নন্দ-দা বলিলেন, ভায়া এবারে কাজ হাঁসিল। আমি তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিলাম—এক কাপ চা আনাই!

নন্দ-দা বলিলেন—যা করবে চটপট্! চা আসিল, নন্দ-দা চা পান করিতে লাগিলেন; এই অবসরে পাঠক তোমাকে তাঁহার পরিচয়টা দিই।

নন্দ-দার অবস্থা এক সময়ে খারাপ ছিল, তখন তিনি আমাদের দশ-জনের মতই সাধারণ লোক ছিলেন। তারপরে অবস্থা যখন ভাল হইল তখন তিনি অসাধারণ হইয়া উঠিলেন—অর্থাৎ রাতারাতি চাঁদনী হইতে একটা স্যুট ও প্রাচীনশাস্ত্র হইতে একটা ফিলজফি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন; এখন তিনি ঘোর বিশ্বপ্রেমিক!

বিশ্বপ্রেম কি?

যে ভাব মনে উদিত হইলে ঘরের পাশের প্রতিবেশীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া ব্রেজিল ও বেলজিয়ামের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ইচ্ছা হয়, সংক্ষেপে তাহাই বিশ্বপ্রেম।

এ হেন বিশ্বপ্রেমিক নন্দ-দা কিছুদিন হইতে জগতের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহার মতলবটা এই রকম—জগতের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে axis power এর অত্যাচার!

কোনরূপে এই axis বা অক্ষ ভাঙিতে পারিলে জগতে শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে। আর এই axis-এ আঘাত করিতে পারিলেই সব ঠাণ্ডা!

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গত দুই বৎসর হইতে তিনি নানা রকম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

প্রথমে তিনি জার্ম্মাণীযাত্রী একটি বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে কিছু কচুরী পানার শিকড় দিয়াছিলেন। সেই শিকড় সেখানকার জলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ক্রমে দেশটা কচুরী পানায় ছাইয়া ফেলিবে এবং কালক্রমে জার্ম্মাণী বাঙ্গলাদেশ হইয়া উঠিবে! ব্যস!

কিন্তু জার্ম্মাণীতে প্রবেশের সময়ে শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী চালাকি ধরিয়া ফেলিল; কচুরিপানার শিকড় জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে পারিল না এবং পরের দিন জার্ম্মাণীতে কচুরী অর্ডিনান্স প্রচারিত হইল!

কিন্তু নন্দ-দা দমিবার পাত্র নহেন। কিছুদিন পরে তিনি কতকগুলি স্বপ্নাদ্য মাদুলী জার্ম্মণীতে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য, এই মাদুলী ধারণ করিতে করিতে সে দেশের লোক ধর্ম্মভীরু ও অহিংস হইয়া উঠিবে। কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল! সে দেশের মেমসাহেবেরা মাদুলিগুলাকে 'ইণ্ডিয়ান অর্ণামেন্টস্' মনে করিয়া তুষার-ধবল নিটোল বাহুতে পরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনরূপ ফল ফলিল না; নন্দ-দা বলিলেন, ম্লেচ্ছের স্পর্শে ওষুধের গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

কয়েকদিন আগে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ওহে এবার এক মতলব ঠাওরানো গিয়াছে—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

—শোন তবে! আমাদের নোট-সম্রাট মহাস্তিকে জান তো! তাঁকে পাঠাবো জার্ম্মাণীতে! সে দেশের স্কুল কলেজের বইয়ের নোট লিখে, অর্থাৎ বাঘ মানে শার্দ্দূল লিখে ছেলেগুলোর মাথা খেয়ে দেবেন; দেখ্‌বে এক generation-এর মধ্যে জার্ম্মাণী বাঙলাদেশ হয়ে পড়বে! কিন্তু মুস্কিল কি জানো, মহাস্তি জার্ম্মাণ জানে না, তাকে জার্ম্মাণ শিখে নিতে বলেছি!

আজ নন্দ-দার আগমনে বুঝিলাম যে, সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে নন্দ-দার চা-পান শেষ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দাদা, মহাস্তি জার্মাণ শিখলো?

নন্দ-দা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—ধ্যেৎ, ওসব জার্মাণ টার্মাণের কাজ নয়। এবার আসল উপায়ের সন্ধান মিলেছে।

আমি জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিলাম। তিনি গলা খাটো করিয়া বলিলেন—ঘরে কেউ নেই তো?

—দেখতেই পাচ্ছেন!

—বাইরে?

—সব সিনেমার অগ্রিম টিকিট কিনতে গিয়েছে।

—তবু একবার দেখে এসো!

বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিলাম।

তিনি বলিলেন—দরজায় এবার খিল এঁটে দাও।

দরজায় খিল দিলাম!

তিনি বলিলেন—কাছে এসো!

কাছে গেলাম।

গলা খাটো করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন—একজন মহাতান্ত্রিকের দেখা পেয়েছি—একেবারে সাক্ষাৎ অবধূত।

আমি মূঢ়ের মত বলিলাম—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আবার কি আজ শনিবার, অমাবস্যা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে নৈঋতে যখন যোগিনী আসবে, বাস্! বাছাধনের আর মস্কোতে যেতে হ'বে না!

তারপরে একটু থামিয়া নিঃসংশয় প্রমাণের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—নৈঋত কোণে মস্কো কিনা, কি বল?

কি আর বলিব!

বলিলাম—আপনিই বলুন!

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—উহু এখন নয়। স্বামীজীর নিষেধ!

এই নাও ঠিকানা, রাত্রি দশটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে—বিলম্ব করো না।

দেখিলাম দমদমের এক বাগান বাড়ীর ঠিকানা।

নন্দ-দা এসব কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে দমদমের বাগানবাড়ীতে পৌঁছিলাম; দ্বারদেশে নন্দ-দা অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু নন্দ-দার একি বিচিত্র বেশ! পরণে লাল চেলি, গায়ে লাল চাদর, রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, হাতে ত্রিশূল, পায়ে খড়ম, মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ রব, চোখ দু'টাও যেন লাল!

আমি বলিলাম—নন্দ-দা একি!

তিনি বলিলেন—চুপ! সঙ্গে এসো।

সঙ্গে চলিলাম!

বৃহৎ একটি অট্টালিকা, যেমন নির্জ্জন তেমনি নিস্তব্ধ, তেমনি ভগ্নপ্রায়! আমি নন্দ-দাকে অনুসরণ করিয়া দোতলায় উঠিতেছি। একটি কেরোসিনের ডিবে ক্ষীণ আলোদানের উপলক্ষ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় অমাবস্যা সৃষ্টি করিতেছে। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, আমি ভয় পাইলাম। নন্দ-দা কি শেষে বিপ্লবী হইল নাকি? না ভৌতিক কিছু—শেষের কথাটা বোধ হয় জোরেই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—

তিনি বলিলেন—অবধৌতিক।

তবে সেই যে সকালে বলিয়াছিলেন একজন অবধূত মিলিয়াছে, এ বাড়ী বোধহয় তাহারই নিকেতন!

একটি বৃহৎ হলঘরে প্রবেশ করিলাম! নন্দ-দার মনে তবে এই ছিল! মনে হইল কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আশ্রমটিকে আস্ত উঠাইয়া আনা হইয়াছে। মেঝেতে থান পাঁচছয় কুশাসন জোড়া দিয়া এক বিরাট অবধূত বসিয়া আছেন; তাঁহার ধুতি চাদর লাল; রক্তচন্দনে কপাল লাল; কিসের প্রভাবে চোখ দুটি লাল, পাশে একখানা ত্রিশূল পড়িয়া, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের রাশি। সম্মুখে যজ্ঞের আয়োজন; বালি, পাটকাঠি, ঘৃত. বিল্বপত্র, খড়্গ, কোশাকুশি, ধূপদানী, ছিন্ন ছাগমুণ্ড এবং অদূরে কয়েকটি সন্দেহজনক বোতল! তবে কি আমিই নবকুমার! নন্দ-দার মনে শেষে এই ছিল! নন্দ-দা কানে কানে বলিলেন, বাবাজীকে প্রণাম কর।

প্রণাম করিলাম!

বাবাজী বলিলেন—বৈঠো বাচ্চা!

তবু ভাল—তিনি 'ভৈরবী প্রেরিতোঽহসি' বলেন নাই। বাবাজীর গলাতে একখানা তক্তির মত কবচও লক্ষ্য করিলাম!

তখনও সন্দেহ নিরসন হয় নাই—নবকুমারের কার্য্য যে আমাকে দিয়া হইবে না তখনো নিশ্চিত হই নাই—এমন সময় দেখিলাম অদূরে অস্পষ্ট আলোকে একখানা ছবি একটি কাষ্ঠফলকে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। সে ছবি হিটলারের। সদ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে কাঁচি চালাইয়া কাটা! বুঝিলাম নন্দ-দার উদ্দেশ্য মহৎ।

নন্দ-দা বলিলেন, বাবাজী লগ্ন আসন্ন।

বাবাজী বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা। থোড়া কারণ পান কর্ না!

নন্দ-দা একটি বোতল অগ্রসর করিয়া দিলেন; বাবাজী অকারণে অনেকটা পরিমাণে পান করিয়া ফেলিলেন, খানিকটা প্রসাদ নন্দ-দাকে দিলেন, তিনি ভক্তিভরে পান করিলেন, আমার হাতেও খানিকটা দিলেন, আমি তাঁহাদের অগোচরে ফেলিয়া দিলাম।

এইবার বাবাজী হোম করিতে বসিলেন!

তান্ত্রিকমতে পূজা। শনিবার অমবস্যার নিশীথরাত্রি!

বালু সাজাইয়া, চারিদিকে পাটকাঠি দিয়া, মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে যজ্ঞ ডুম্বুরের সমিধ্ রক্ষা করিয়া বাবাজী যথাশাস্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন: ঘৃত নিষিক্ত অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তীব্র আলোকে ভয় পাইয়া ঘরের কড়িকাঠে নিবদ্ধ কয়েকটি চামচিকা ঘরময় ফড়ফড় করিয়া উড়িতে লাগিল। বাবাজী একখানি তালপাতার চণ্ডীজাতীয় পুঁথি হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমাগ্নিতে ঘৃতাসিক্ত বিল্বপত্র আহুতি দিতে লাগিলেন। ঘৃতের গন্ধে, অগ্নির তাপে, স্বধা প্রভৃতি মন্ত্রের শব্দে মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈদিক কালে চলিয়া গেলাম। বাবাজী অগ্নিতে বিল্বপত্র দেন আর 'হর্য্যক্ষ'-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ 'কটকট করিয়া) হের হিটলারের দিকে তাকাইতে থাকেন! বেচারা হিটলার!

নন্দ-দা আমার কানের কাছে বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে থাকেন

—বুঝলে না ভায়া, বাবাজীর প্রত্যেক কটাক্ষে পাষণ্ডটার বুকের রক্তে টান্ পড়ছে! এতক্ষণে খোঁজ নিয়ে দেখ ওর 'ব্লাড-প্রেশার' low হয়ে গেছে!

মূঢ় আমি বলিলাম—সে যে অনেক দূরে আছে।

নন্দ-দা একটি পৌরাণিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, থাকলোই বা! এযে তান্ত্রিক মন্ত্র!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? হের হিটলারের নিধন! এই যজ্ঞের নাম মারণযজ্ঞ। দেখবে যখন আগুনে পূর্ণাহুতি পড়বে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্লিনে বাছাধন চিৎপটাং। আর মস্কোতে প্রবেশ করতে হ'বে না। তার বদলে কাগজে দেখবে অকস্মাৎ হের হিটলার অ্যাপোপ্লেসি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দ-দা খানিকটা থামিলেন, তারপরে যেন নিজের মনেই বলিলেন অনেক চেষ্টায় বাবাজীর দেখা পেয়েছি।...বুঝলে ভায়া এই এক 'ষ্ট্রোকে' রোম-বার্লিন-টোকিও-এক্সিস ভঙ্গ হ'য়ে, বিশ্বে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

নন্দ-দা পৃথিবী শব্দের পরিবর্ত্তে 'বিশ্ব' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ওদিকে যথাশাস্ত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে, স্বাহা, স্বাহা, ওঁ হ্রীং ক্রীং ধ্বনিত হইতেছে। আর চামচিকা ফড়ফড় করিয়া উড়িতেছে।

নন্দ-দা মাঝে মাঝে সন্দেহজনক বোতল অগ্রসর করিয়া দিতেছেন বাবাজী এই সমস্তের আদি কারণস্বরূপ কারণসলিল পান করিতেছেন।

বোধ হয় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—হঠাৎ একটি হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বাবাজী বলিতেছেন—বাছা পূর্ণাহুতি দেনাকা লগ্ন আ-গিয়া।

বাবাজীর হিন্দী শুনিয়া বুঝিলাম রাষ্ট্রভাষা এখনো আয়ত্ত হয় নাই। তবে কিনা অকৃত্রিম সন্ন্যাসীরা প্রায়শঃই হিন্দুস্থানী, সেইজন্য তিনি হিন্দী বলিতে চেষ্টা করেন।

নন্দ-দা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। একটি করিয়া ঘৃত, মন্ত্রপূত বিল্বপত্র লইয়া বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; নন্দ-দা তাড়াতাড়ি হিটলারের

ছবিখানা আনিয়া বাবাজীর হাতে দিলেন—এই বারে পূর্ণাহুতিসমেত ছবিখানা অগ্নিতে পড়িবে আর সঙ্গে সঙ্গে ছ' হাজার মাইল দূরে মস্কোর পথে পাষণ্ডটা হঠাৎ অ্যাপোপ্লেসিতে · আঃ কি শাস্ত্রই না সনাতন ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন!

কিন্তু এমন সময়ে বাবাজী যে প্রশ্ন করিলেন সেজন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না ইতিহাসেও তাহার উত্তর নাই।

বাবাজী যাহা বলিলেন বাঙ্গলায় তার অনুবাদ দিতেছি।

বাচ্চা, হিটলারের গোত্র কি?

সর্ব্বনাশ! নন্দ-দা আমার দিকে, আমি তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—তোমার তো ইতিহাসে অনার্স ছিল, কোথায় কিছু পাওনি!

আমি অপ্রতিভ হইযা বলিলাম, না দাদা!

তিনি বলিলেন—বেটারা সব ফাঁকি দেয়।

ভাবিলাম বলি—

গোত্র তার নাহি জানি, তাত! সে যে দ্বিজোত্তম, আর্য্য কুল জাত।

বাবাজী বলিলেন—গোত্র না বলিতে পারিলে ফল ফলিবে না।

শেষে কি তীরে আসিয়া তরী ডুবিবে! এতক্ষণের যজ্ঞের ফলে ন্যুরেমবার্গে বোধ হয় 'ফিট' উঠিয়াছে। শেষে কি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে!

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—হিটলার কোন্ বংশসম্ভূত?

এবার আর আমাকে ঠকাইতে পারিলেন না—আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—আর্য্য! আর্য্য!

বাবাজী যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নন্দ-দা ক্ষেপিয়া গেল নাকি? তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া, উঠিলেন—হয়েছে, হয়েছে!

—কি হ'ল নন্দ-দা?

—হবে আর কি? ভাগ্যিস সুনীতি চাটুজ্জের কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়েছিলাম! হিটলারের পুরো নাম পেয়েছি।

—ব্যাপার কি?

—শ্রীহিট্‌লার শর্ম্মণঃ!

নন্দ-দা রুখিয়া উঠিলেন, কেন পাব না? শর্ম্মণ থেকেই জর্ম্মণ। বাবা গ্রীম্‌স্ ল'র কাছে চালাকি নয়!

নন্দ-দা তখন গ্রীম্‌স্ ল-'র গৌরবে উপস্থিত কার্য্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন কেশরী হইতে কাইজার, দানব হইতে ড্যানিউব, বল্‌গা হইতে ভল্‌গা সাধিতেছেন।

বাকি সমস্যার সমাধান বাবাজী স্বয়ং করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন গোত্র জানা না থাকিলে 'যথা নাম-গোত্র' বলিলেও কাজ চলিবে! তবে আর কি চাই!

বাবাজী পূর্ণাহুতি ও ছবিখানা হাতে করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; সবটা বুঝিতে পারি নাই; খানিকটা বেশ বুঝিতে পারিলাম 'রোম-বরুণালয়-ত্রক্র-অক্ষভঙ্গায়—জগদ্ধিতায়—শনিবাসরে, অমাবস্যায়াং তিথৌ ...আর্য্যবংশসম্ভূতস্য যথানামগোত্রস্য শ্রীঅধলোপ হিত্‌লার শর্ম্মণঃ প্রাণনাশায় ইদম্ পূর্ণাহুতিং স্বাহা।'

পূর্ণাহুতি যজ্ঞাগ্নিতে পড়িল। বাস্, মুরেমবার্গে কাজ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বে (পৃথিবীতে নয়) আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু পাশের ঘরে ওকি অশান্তি! ও কাহাদের ভারি জুতার তালে তালে মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ!

নন্দ-দার দিকে তাকাইলাম!

নন্দ-দা বলিলেন—খবর পেয়েছে।

—কাহারা?

—নাৎসী চর।

আমি বলিলাম কি আপদ্! এ যে ইংরেজের রাজত্ব!

নন্দ-দা বলিলেন—হোলে কি হয়? নাৎসীরা আমাদের ধরতে আসছে! পালাও!

উপদেশ ও উদাহরণের মধ্যে ছেদ রহিল না—নন্দ-দা সোজা দরজার দিকে ছুটিলেন! কিন্তু তৎক্ষণি দরজার গোড়া হইতে তীব্র টর্চ্চলাইটের ছটা ঘরের মধ্যে পড়িল!

এখন বুঝি জেলে যাইতে হয়।

দরজার কাছে জন চার পুলিশ ও জন চার উপরিতন কর্ম্মচারী!

তাহারা নন্দ-দাকে পাকড়াইয়াছে। নন্দ-দা বিড়ালের কবলে মুষিকের মত ছট্ ফট্ করিতেছেন।

ইতিমধ্যে বাবাজী কার্য্য হাসিল করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। সন্দেহ-জনক বোতলের একটায় হাত পড়ে নাই—তিনি সেটাকে মুখের সঙ্গে লাগাইয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছেন—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষভূষিত মহাদেবের নন্দী প্রাণপণে শিঙা ফুঁকিয়া প্রমথ পালকে ডাকিতেছে!

একজন পুলিশ আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি বলিলাম—We are performing religious duty! no interference! দেখিলাম তাহারা সকলেই বাঙালী, তাই বাঙলায় সুরু করিলাম—কুইন্স প্রোক্লামেশন পড়েছি! ধর্ম্মে হাত দেবার অধিকার পুলিশের নেই!

আমার কথায় নন্দ-দারও সাহস ফিরিয়া আসিল।

তিনি বলিলেন, ঠিক কথা। আমিও পড়েছি 'সরল ভারতবর্ষের ইতিহাসে' —আমিও পড়েছি! পাতার referenceটা বলে দাও না হে!

আমি পত্রসংখ্যার কথা ভাবিতেছি—এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী বাবাজীর মুখের উপরে আলোকচ্ছটা ফেলিলেন—তিনি তখনও অনন্য-মনা হইয়া শিঙা ফুঁকিতেছিলেন।

সেই কর্মচারী পকেট হইতে একখানা ছবি মিলাইয়া লইয়া সম্মতি জানাইল। এমন সময়ে বাবাজীর গলায় সেই কবচখানা চোখে পড়াতে তাহারা সেখানকার উপরে আলো ফেলিয়া দেখিল তাহাতে বড় বড় করিয়া ইংরাজীতে লেখা আছে—27 M. H.। ইহা দেখিয়া সেই কর্মচারী বলিল, That's the man!

বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করিয়া উঠিল—ফেরারী নাকি? শেষ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, ফেরারীই বটে—তবে পাগলা গারদ হইতে!

বাবাজী সেখানকার আসামী—কিছুদিন আগে সরিয়া পড়িয়াছিলেন—খোঁজ চলিতেছিল—এতদিনে সন্ধান মিলিয়াছে।

বাবাজীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি সেই বোতলমুখী হইয়া রহিলেন বোতল আর নামাইলেন না। বুঝিলাম, এতক্ষণে স্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছেন।

সে রাত্রি নন্দ দা ও আমাকে হাজতেবাস করিতে হইল। কুইন্স প্রোক্লামেশন বাঁচাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করায় বলিল—তোমরা যে পাগল নও তাহা প্রমাণ হয় নাই। তোমাদের মেণ্টাল অবজারভেশন ওয়ার্ডে রাখিতে হইবে।

যাহা হোক, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইলাম। শুধু যে বাবাজী যথাস্থানে গিয়াছেন তাহা নয়, আমরাও প্রত্যেকে যথাস্থান পাইয়াছি! আমি কাগজের সাব-এডিটর, নন্দ-দা মফঃস্বলের কোন কলজে মাষ্টারী করেন।

"সদাসত্য কথা কহিবে"

পাঠক, যার কপালে দুঃখ আছে সে ভোগ করিবে, তার তুমিই বা কি করিবে আর আমিই বা কি করিব। কত ছেলেই তো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, কেহ তো এমন ভুল করে না—সকলেই তো সেই বিপদপূর্ণ উপদেশটাকে দিব্যি ডিঙাইয়া চলিয়া যায় এবং স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের বলে বোধোদয়ে পৌঁছিবার পূর্বে ভুলিয়া যায়। কিন্তু কপালে যার দুঃখ আছে সে ওখানে আটকাইয়া যায়।

কোন্ বিপদের কথা বলিলাম বোধ করি বুঝিতে পার নাই। না পারিবারই কথা, কারণ কাণ্ডজ্ঞানের বলে বহুদিন আগেই নিশ্চয় সে উপদেশটা ভুলিয়া গিয়াছ। তবে একবার মনে করাইয়া দিই—দ্বিতীয় ভাগে আছে যে, 'সদা সত্য কথা কহিবে'। মনে পড়িয়াছে কি?

আজ যার কথা বলিতে যাইতেছি এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে সে ওই

উপদেশটা ভুলিতে পারে নাই। ভুলিতে এক এক সময়ে তুমি আমিও পারি না; যখন আর কেহ মিথ্যা বলিয়া আমাদের স্বার্থহানি ঘটায় তখন এক একবার বিদ্যুতের মতো ধাঁ করিয়া কথাটা মনে পড়ে; তখন বিষম নৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া বসি। ঠিক সে রকম কথা বলিতেছি না। রামতনু ওই তার নাম, এই উপদেশে এমন বাধিয়া গিয়াছিল, যেমন বাধিয়া যায় দোদুল্যমান কোঁচার অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ সূচি চোরকাঁটা—চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পা ফেলিবার তালে তালে খোঁচাইতে থাকে।

একদা প্রভাতে, সুপ্রভাত বলিতে পারি না, রামতনু পড়িল—'সদা সত্য কথা কহিবে'। সন্ধ্যার মধ্যেই ভুলিয়া যাইত—কিন্তু তার মাস্টার রামতনুর কাঁচা মনের উপরে এই গজালটাকে বারে বারে স্মৃতির হাতুড়ি ঠুকিয়া আচ্ছা করিয়া বসাইয়া দিল—ফলে হইল এই যে লক্ষ্মণের মতো শক্তিশেল-বিদ্ধ হইয়া সে জীবনপথে চলিতে আরম্ভ করিল—ঠিক লক্ষ্মণের মতো বলিতে পারি না—লক্ষ্মণ মরিয়া বাঁচিয়াছিল—রামতনু বাঁচিতে বাঁচিতে শেষে একদিন মরিল—অনেক দিন পরে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—মাস্টার মশাই, সদা সত্য কথা কহিবে—এটা কি সত্য?

মাস্টার মশাই বড় একটিপ নস্য লইয়া বলিল—এ ছাড়া কোন সত্য নাই।

রামতনু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাস্টার মশাই, সত্য কথা বলিলে লোকে কি করে?

মাস্টার মশাই মুখের মধ্যে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিয়া বলিল—লোকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান করে। মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করে।

রামতনু ভাবিল—কাল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠক, আশা করি তুমি কখনও এ রকম পরীক্ষা করিবে না—যদিও সুযোগ দিনের মধ্যে অসংখ্যবার পাইবে।

পরদিন ইস্কুলে রামতনুর সুযোগ আসিল। ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসিয়া একটা ছেলে মাটিতে পা ঘষিতেছিল—পণ্ডিত বহু বার চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—কেহ বলিতে পার কে জুতা ঘষিতেছে?

সকলে নীরব। রামতনু ভাবিল তবে কি এরা দ্বিতীয় ভাগ পড়ে নাই! সে বলিয়া উঠিল—পণ্ডিত মশাই—রমেশ।

রমেশ বড়লোকের ছেলে, তাতে বলিষ্ঠ; ক্লাসের সকলেই তাকে ভয় ও ভক্তি করে। রামতনুর কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—না পণ্ডিত মশাই, রমেশ নয়, রামতনুই জুতা ঘসিয়াছে।

তখন পণ্ডিত মশাই উঠিয়া আসিয়া রামতনুকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উত্তমরূপে প্রহার করিয়া ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিল। সে ক্লাসের বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিবার অবকাশে বারংবার জপ করিতে লাগিল, 'সদা সত্য কথা কহিবে'। এমন সময়ে ক্লাস ছুটি হইল—ছেলেরা বাহিরে আসিয়া তাকে ধরিয়া কিল, চড়, ঘুষি, লাথি, যে যা পারিল মারিল। রামতনু যতই বলে, আমি সত্য কথা বলিয়াছি, ছেলেরা ততই তাকে বিদ্রূপ করিতে থাকে, কেবল বিদ্রূপ নয়, সঙ্গে কিল-চড়ও থাকে।

রামতনু বাড়ি ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! সত্য কথা বলিলে তার ফল তো এমন ভয়ানক হওয়া উচিত নয়! দ্বিতীয় ভাগে তো এমন লেখে না। সেখানে তো সত্যবাদী গোপালকে সকলে খুব ভালোবাসিত। আচ্ছা, মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

পাঠক, রামতনুর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ সে তোমার আমার মতো 'স্মার্ট' বা 'ক্লেভার' হইত, তবে ইস্কুলের অভিজ্ঞতাই তার পক্ষে যথেষ্ট হইত–মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি আর হইত না; কিন্তু রামতনু তুমি আমি নয়—সে ক্ষণজন্মা পুরুষ—ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই তার জন্ম।

সে মাস্টারকে ইস্কুলের অভিজ্ঞতা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে মারিল কেন?

মাস্টার বলিল—পণ্ডিত তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াই মারিয়াছে—সত্যবাদী জানিলে আদর করিত।

—কিন্তু ছেলেরা মারিল কেন? তারা তো জানিত আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।

মাস্টার বলিল—মিথ্যাবাদীরা সত্যবাদীকে দেখিতে পারে না—তাই ঈর্ষাবশত মারিয়াছে।

পাঠক, রামতনুর মাষ্টারের যুক্তির অভাব হয় না। সত্যকথা বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল—সুযোগ বুঝিয়া সত্য কথা বলিবে, বিপদ না থাকিলে এবং লাভের বা প্রশংসার আশা থাকিলে সদা সত্য কথা বলিবে।

রামতনু দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিল সদা সত্য কথা কহিব। মূর্খ রামতনু!

পরদিন রামতনু বাপের সঙ্গে বাজারে গেল। তার পিতা মেছুনির নিকটে দশ আনার মাছ কিনিয়া একটি টাকা দিল। মেছুনি ছয় আনা ফেরত দিতে গিয়া ভুলক্রমে দুটি সিকি দিল। ভদ্রলোক সিকি দুটি ত্বরিত-ভাবে ট্যাঁকে গুঁজিযা তাড়াতাড়ি ছেলেকে বলিল—চল।

মেছুনি ভুল বুঝিতে পারিযা বলিল—বাবু, পয়সা কি বেশি দিলাম?

সে বলিল—না না, ঠিক আছে।

সত্যবাদী রামতনু বলিয়া উঠিল—বাবা, দুটো যে সিকি দিল।

পিতা পুত্রেব প্রতি চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না গো তুমি একটি সিকি আর একটি দুআনি দিযেছ।

মেছুনি আর একজনকে মাছ বেচিতে লাগিল, পিতা পুত্র চলিয়া গেল। আডালে গিয়া পিতা বলিল—পাকা ছোকরা কোথাকার—বাপের উপরে কথা।

রামতনু বলিল—বাবা, দ্বিতীয় ভাগে আছে, 'সদা সত্য কথা কহিবে'।

পিতা বলিল—আছে তো তোর কি হয়েছে? মাস্টারে এই সব বুঝি শেখায়? দেখছি একবার তোর মাস্টারকে।

বাড়ি গিয়া মাস্টারকে পিতা সব কথা বলিল। মাস্টার বলিল—দাঁড়ান, আমি দেখছি।

মাস্টার রামতনুকে শাসন আরম্ভ করিল—অর্থাৎ একখানি বাঁশের কঞ্চি কয়েক বার তার পিঠে পডিল।

রামতনু বলিল—তবে কি সত্য কথা বলিব না?

মাস্টার বলিল—একশ'বার বলিবে, তাই বলিয়া পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই? বাপের উপরেও সত্য কথা!

রামতনু বুঝিল সত্য কথা বলিতে হইলে পাত্র বিচার করিতে হইবে।

মাস্টার ছাত্রের পিতাকে গিয়া বলিল—আজ্ঞে ও ছেলেমানুষ, সব কথার অর্থ বুঝিতে পারে না—এবার ঠিক হইয়াছে।

পিতা খুশি হইয়া বলিল—বেশ আজ হইতে তোমার ছু'টাকা মাহিনা বাড়িল।

মাস্টার বুঝিল হিসাব শুধু জটিলতর হইল। মাহিনা পাওনা হয় বটে, কিন্তু কোনদিন পাওয়া যায় না। এতদিন দশ টাকার হিসাব রাখিত, এবার হইতে বারো টাকার হিসাব রাখিতে হইবে।

ক্রমে রামতনু ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিল—কিন্তু বাল্যকালেই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। 'সদা সত্য কথা কহিবে' রূপ প্রাচীন উপদেশটা সিন্ধবাদের বৃদ্ধের মতো স্কন্ধে চাপিয়া থাকিয়া তার নিশ্বাসরোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। যখনই সে সত্য কথা লইয়া কোনো বিপদে পড়িত তখনই সে তার পুরাতন মাস্টারের কাছে গিয়া উপদেশ চাহিত। মাস্টার উপদেশ দিয়া বলিয়া দিত—সত্য কথা বলিবার অভ্যাস ত্যাগ করিও না।

ফল হইল এই যে রামতনু ক্যারমের ঘুঁটির মতো সংসারের চারিদিকের দেয়ালে ক্রমাগত মাথা ঠুকিয়া মরিতে লাগিল। মাস্টার তাকে বলিয়া দিয়াছিল—সংসারে সত্য কথা বলিবার পুরস্কার যদি না-ই পাও দুঃখ করিও না, মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়া (সত্যবাদী স্বর্গ ছাড়া আব কোথায় যাইবে!) পুরস্কার পাইবে; এবং একদিন ঠিক ক্যারমের ঘুঁটির মতোই চারিদিকের দেয়ালে রিবাউণ্ড হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় নরম জালের ঝুলিটার মধ্যে গিয়া পড়িবে—সেই ত স্বর্গ।

রামতনু এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইল, মরিতে অবশ্য একদিন হইবে—সেইদিন আমার পোয়াবারো—মিথ্যাবাদীরা সেদিন সত্যই মরিবে।

কিন্তু মৃত্যু তো মেসের চাকর নয় যে ডাক দিলেই আসিবে। ইতিমধ্যে তাকে সংসারে আর দশজনের মতো চলাফেরা করিতে হইল।

একদিন সে ট্রামে উঠিতে যাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল

একটা লোক এক ভদ্রলোকের পকেট হইতে টাকার থলিটা তুলিয়া লইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া 'পকেটকাটা পকেটকাটা' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। পকেটকাটা বিপদ দেখিযা টাকার থলিটা চট্‌ করিয়া রামতনুর অলক্ষিতে তার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া 'পকেটকাটা পকেটকাটা' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

ক্রমে লোক জুটিয়া গেল—সেই ভদ্রলোকও আসিল। বীটের পুলিস যখন দেখিল ছোরা-ছুরি নয়, টাকাব ব্যাপার তখনই সে ছুটিয়া আসিযা দুইজনকে ধরিল।

রামতনু বলিল—এই লোকটা পকেট কাটিয়াছে।

সে লোকটা বলিল—ওই কাটিয়াছে মাইরি। জমাদার সাহেব, পকেট সার্চ করিয়া দেখ।

পুলিস রামতনুর পকেট হইতে টাকার থলি টানিয়া বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিল এবং তাকে টানিয়া থানায় লইয়া গেল।

বিচারে রামতনুর চারিমাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারের সময়ে সে দ্বিতীয় ভাগ দেখাইয়া বিচারককে বলিয়াছিল—সে সদা সত্য কথা বলে।

তার কথা শুনিয়া আদালতসুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। বিচারক হাসে নাই বটে, কিন্তু রায় লিখিয়া তাকে জেলে পাঠাইয়া দিল।

পাঠক, রামতনু তোমাব আমাব মতো সাধারণ লোক হইলে চারি মাস পরেই বাহির হইতে পারিত কিংবা বোধ করি জেলেই যাইত না। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তার জন্মগ্রহণ। জেলেব মধ্যে সত্য কথা বলিতে গিয়া কয়েদী, ওয়ার্ডার, জেলার, সুপার সকলেব কাছে তাডা খাইতে লাগিল এবং সত্য কথার অপ-প্রয়োগের জন্য চারি মাসের স্থানে আট মাস মেয়াদ খাটিয়া একদিন প্রভাতে (রামতনুর পক্ষে সুপ্রভাত নয়) বাহির হইয়া আসিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া রামতনু বুঝিল সংসারে অধিকাংশ লোকই বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পড়ে নাই—নতুবা তারা এমন মিথ্যাবাদী কেন। সে স্থির করিল বাকি জীবনটা সে দ্বিতীয় ভাগের এই অদ্বিতীয় বাণী

প্রচার করিয়া কাটাইয়া দিবে। সে দুইখানি পেস্টবোর্ডে বড় বড় "সদা সত্য কথা কহিবে" লিখিয়া গলায় ও পিঠে ঝুলাইয়া দিয়া কলিকাতার রাজপথে বাহির হইল এবং অনুমান করিল তার এই নৈতিক উদাহরণ (দুঃসাহস?) অচিরে কলিকাতার চৌদ্দলক্ষ লোককে সত্যবাদী করিয়া তুলিবে। কিন্তু ঠিক যেমনটি ভাবিয়াছিল তেমনটি হইল না। পথে ছেলেরা ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল—যুবকেরা ঠাট্টা করিতে লাগিল—বৃদ্ধেরা অনুকম্পা করিয়া বলিল—লোকটা পাগল। প্রথমে কয়েকদিন এই ভাবে চলিল—শেষে লোকের সমালোচনা কঠোরমূর্তি ধারণ করিল।

বুর্জোয়াগণ ভাবিল—লোকটা কম্যুনিস্ট।

কম্যুনিস্টগণ ভাবিল—লোকটা বুর্জোয়া, নহিলে এমন পুরাতন কথা বলিবে কেন?

কংগ্রেসওয়ালারা ভাবিল—লোকটা লীগের টাকা খাইয়াছে।

লীগওয়ালারা ভাবিল—লোকটা কংগ্রেসে ভলান্টিয়ার।

আন্তর্জাতিকবাদীরা ভাবিল—লোকটা সাভারকরের চর কি স্বয়ং সাভারকরও হইতে পারে।

হিন্দু মহাসভাওয়ালারা ভাবিল—আমাদের শাস্ত্রে কোথাও তো এমন কথা নাই—লোকটা মূর্খ।

জার্নালিস্টরা ভাবিল—লোকটা পরশ্রীকাতর—আমাদের ব্যবসা নষ্ট করিবে।

সাহিত্যিকরা ভাবিল—আমরা এতজন থাকিতে একটা লোকে দেশের মত বদলাইতে পারিবে না।

ব্যবসায়ীরা ভাবিল—লোকটা বেকার।

বেকারগণ ভাবিল—শালা এই উপায়ে দু'পয়সা করিতেছে।

ক্যাপিট্যালিস্টরা ভাবিল—লোকটা শ্রমিক।

শ্রমিকরা ভাবিল—বেটা ক্যাপিট্যালিস্টদের লোক!

প্রফেসারগণ ভাবিল—আমাদের এতদিনের শিক্ষা ছেলেরা ভুলিবে না।

মাস্টারগণ কিছু ভাবিল না—শুধু একবার হাসিল।

আর পুলিসে ভাবিল—বেটা বিশেষ করিয়া তাদেরই ঠাট্টা করিতেছে।

তখন সকলে মিলিয়া একদিন রামতনুকে কলেজ স্কোয়ারে পাকড়াও করিল এবং সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি?

রামতনু কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল—আমি রামতনু।

তখন সকলেব ভয় কাটিল—তারা পুনরায় সমস্বরে বলিল—লোকটা পাগল!

ফলে রামতনু পাগল সাব্যস্ত হইযা রাঁচির পাগলাগারদে গভর্নমেণ্ট খরচে প্রেরিত হইল।

পাগলাবদে গিযা রামতনু ভ্রাতৃপাগলগণকে সম্বোধন করিযা বলিল—ভাই সব, সদা সত্য কথা কহিবে।

ভ্রাতৃপাগলগণ একস্বরে বলিল—ওটা পুরাতন কথা—নতুবা আমবা এখানে আসিলাম কি করিয়া!

রামতনু এবার মনের মতো সঙ্গী পাইল—এতগুলি সত্যবাদী যে পৃথিবীতে আছে তা সে কখনো কল্পনা কবিতে পাবে নাই। সে মনের আনন্দে সত্য কথা বলিতে লাগিল এবং তৎপরিবর্তে শালা, পাজি, চোর. জোচ্চোর প্রভৃতি সত্য কথা শুনিতে লাগিল!

অবশেষে একদিন, দীর্ঘকাল পবে, সত্য কথা বলিতে বলিতে এবং শুনিতে শুনিতে রামতনু মবিল।

স্বর্গে গিযা স্বর্গের দপ্তরখানায উপস্থিত হইযা রামতনু চিত্রগুপ্তকে নিজের পরিচয় দিল—আমি সত্যবাদী রামতনু।

চিত্রগুপ্ত বলিল—ওঃ বুঝেছি। ·এই বলিযা তার দিকে একখানা টুল আগাইয়া দিল।

রামতনু বলিল—পৃথিবীতে অনেক ভুগিয়াছি, এবার এখানে কি পুরস্কারের বরাদ্দ আছে দেখি।

চিত্রগুপ্ত লেজার বুক্‌-এ রামতনুর হিসাবের পাতা খুলিয়া দেখিল এবং দেখাইল! রামতনুকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বাঁধিযা স্বর্গ ঘুরাইতে হইবে—নীচে স্বযং ধর্মরাজের স্বাক্ষর।

বিস্মিত রামতনু বলিল—এ কি রকম পুরস্কার?

চিত্রগুপ্ত বলিল—এটা পুরস্কার নয়, দণ্ড!

—দণ্ড ? কিসের ? সত্য কথা বলিবার ?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না, নির্বুদ্ধিতার।

—নির্বুদ্ধিতা ? ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না !

চিত্রগুপ্ত বলিল—পারিবে না তা জানি। তুমি যে নির্বোধ ! আমরা কি আর মিছা দণ্ড বিধান করি !

রামতনু বলিল—বুঝাইয়া দাও !

চিত্রগুপ্ত বুঝাইতে লাগিল—পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ নির্বুদ্ধিতা—স্মার্টনেস্ বা ক্লেভারনেসের অভাব। তুমি তার চরম দৃষ্টান্ত ! এই বিধান তুমি যত রকমে ভঙ্গ করিয়াছ এমন কেহ করে নাই।

রামতনু বলিল—নির্বুদ্ধিতা কিসের ? আমি সদা সত্য কথা বলিয়াছি।

চিত্রগুপ্ত হাসিয়া বলিল—ওটাই তো নির্বুদ্ধিতার চরম !

রামতনু বিরক্তির সঙ্গে বলিল— তবে ওরকম একটা উপদেশ পুঁথিতে থাকে কেন ?

চিত্রগুপ্ত বলিল—কে নির্বোধ—আর কে বুদ্ধিমান পরীক্ষার জন্য ও রকম দু'একটা উপদেশের বাধা আমরা সৃষ্টি করিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই তো ওটা পড়ে—কেউ তো তোমার মতো ওটাকে সত্য বলিয়া মনে করে না।

ততক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা দরজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চিহি রব ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—আমার মাস্টার মহাশয়ের তবে এই দণ্ড হইবে ?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না, তার অক্ষয় স্বর্গ।

রামতনু বলিল—সে কি ? তিনি কি তবে সত্যবাদী নহেন ?

চিত্রগুপ্ত ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল—ঠোঁটের ফাঁক দিয়া তার সোনা-বাঁধা দাঁত দুটি দেখা গেল ; সে বলিল—না, যে 'সদা সত্য কথা কহিবে' উপদেশ দেয়—তার মতো মিথ্যাবাদী আর কে আছে ? সে খুব ক্লেভার। তোমার মাস্টার—আমাদের চর। শুধু তোমার মাস্টার নয়—মাস্টার ও প্রফেসারগণ আমাদের গুপ্তচর, যাকে বলে এজেণ্ট প্রভোকেটর।

এখন সত্যবাদী নির্বোধ রামতনু উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধ হইয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া স্বর্গ পরিভ্রমণ করিতেছে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া মিথ্যাবাদী ক্লেভার পৃথিবীর লোককে ধিক্কার দিতেছে—বোধ হয় এখনও তার ভুল ভাঙে নাই! সে স্থির করিয়াছে মেয়াদ ফুরাইলে একবার স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে আপীল করিবে। কিন্তু মূর্খ জানে না যে, অনেক সময়ে আপীলে দণ্ড বাড়িয়া যায়। কিন্তু সে ভয় নাই—কারণ রামতনুর দণ্ড আজীবন! ভাষা ঠিক হইল না, জীবন তো তার শেষ হইয়াছে—যতদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে আর তার আত্মা থাকিবে ততদিন সে অশ্বচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে!

ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত! তুমিও নিশ্চিন্ত হইতে পার—সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আর তোমার ক্লেভারনেসে বাধা দিতে আসিবে না।

ইহা ফাঁকা গল্প নয়—নীতিমূলক গল্প। সে নীতিটি এই যে, তাক্ বুঝিয়া সত্য কথা বলিতে পারিলে পৃথিবীতে সম্মান ও ঐশ্বর্য পাইবে আর মৃত্যুর পরে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া ইচ্ছামতো পারিজাতের বনে উর্বশী-রম্ভাদের লইয়া পিকনিক করিতে পারিবে—তবে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধ রামতনু ঘুরিতে ঘুরিতে কাছে আসিয়া পড়িলে, যদি লজ্জাবোধ হয়, উর্বশীর আঁচলে মুখ লুকাইও।

ভূতের গল্প

আজ একটা ভূতের গল্প বলিব—একেবারে নিছক সত্য ঘটনা। আমি নিজে দেখিয়াছি কি না, জানিতে চাও? নিজে না দেখিলেও এক রকম দেখাই; পাড়ার ঘটনা, বন্ধুবান্ধব দেখিয়াছে; ঘটনার ঠিক পরেই তারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই দেখা ছাড়া আর কি?

আমাদের পাড়াতে একটা বাড়ীকে লোকে ভূতের বাড়ী বলিত। ছেলেবয়সে বাড়ীটাতে ভাড়াটে থাকিতে দেখিয়াছি; কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনিলাম বাড়ীটাতে নাকি ভূতের উৎপাত হইয়াছে। ভাড়াটে আসে না,

আসিলেও থাকিতে পারে না, ভূতের উৎপাতে দু চার দিন পরেই উঠিয়া যায়। শেষে আর ভাড়াটে জোটে না, 'টু লেট্' লেখা কাঠের তক্তা সারা বছর মাদুলীর মত বাড়ীর গায়ে বাতাসে দুলিতে থাকে। প্রকাণ্ড বাড়ী—এই সস্তার বাজারেও আশী টাকা ভাড়া নিশ্চয় হইত।

বাড়ীটাতে নাকি ব্রহ্মদৈত্য থাকে। উৎপাত আর কিছু নয়, মাঝ রাতে হাওয়া নাই, বাতাস নাই, হঠাৎ দরজা জানালা সব একসঙ্গে খুলিয়া গেল। উঠিয়া দরজা জানালা দিয়া শোও, আবার খুলিয়া যাইবে। গরমের রাতে দরজা-জানালা খুলিয়া ঘুমাও, হঠাৎ সব বন্ধ হইবার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইবে।

মাঝ রাতে বিদ্যুতের আলোগুলা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিম্বা হয়তো সব আলো একসঙ্গে নিভিয়া গেল। বেশি রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া শুনিতে পাইবে ছাদের উপরে কে যেন খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গ্রহণে বা ঐ জাতীয় কোন যোগ উপলক্ষে অনেকে গভীর রাতে ছাদের উপরে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি শুনিয়াছে—স্বর ঈষৎ অনুনাসিক। লোকে প্রথমে মনে করিত ব্যাপার আর কিছু নয়—দুষ্ট-লোকের উপদ্রব, পাড়ায় ছেলেরা পাহারা বসাইল, পুলিশে পাহারা দিল, কিন্তু এ সব উপদ্রব কমিল না।

তখন বাড়ীর মালিক রিষড়ার বিখ্যাত ভূতের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল, সে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘর বন্ধ করিয়া কি করিল জানি না, বাহির হইয়া আসিলে জানা গেল চোর বাটপাড় কিছু নয়, ব্রহ্মদৈত্য ভর করিয়াছে। কথাটা দেখিতে দেখিতে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বাড়ীতে ভাড়াটে আসা বন্ধ হইল, আর ব্রহ্মদৈত্য পরম সুখে সেখানে কালযাপন করিতে লাগিল। এসব আমাদের অল্প-বয়সের কথা, তারপরে সেই ভূতের বাড়ীর অস্তিত্ব সকলে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল; হঠাৎ কি করিয়া এই বাড়ীর প্রসঙ্গ উঠিল, সেই কথাই আজ বলিব।

২

হঠাৎ একদিন মুঙ্গের হইতে রাম-দা আসিয়া উপস্থিত। রাম-দা'র পরিচয় কি দিব ভাবিতেছি; আমরা পাড়াশুদ্ধ সকলে তাঁকে মুঙ্গেরের রাম-দা বলিয়া জানিতাম, পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। এত বড় বিরাট পুরুষ আমি কখনো দেখি নাই—যেন রামায়ণ-মহাভারতের একটা বীরপুরুষ পথ ভুলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

এহেন রাম-দা'র জীবনে দুটি আসক্তি ছিল, তিনি ভূতে বিশ্বাস করিতেন না। ভূত দেখিবার আশায় তিনি যে কত শ্মশানে, কত পোড়ো বাড়ীতে, কত অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুরিয়াছেন তার হিসাব নাই। আর কবিতা পড়িবার জন্য নূতন বই সংগ্রহ করিতে তিনি যে কত লাইব্রেরী, কত দোকান, কত কবির বাড়ী ঘুরিয়াছেন, তারও হিসাব অপরে জানে না। রাম-দা ইংরেজী ভাল জানিতেন না, বাংলা কবিতাই বেশি পড়িতেন।

রাম-দা আমার বাসায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন ওহে—সাহিত্যিক, (আমি একজন সাহিত্যিকের পাশের বাড়ীতে থাকিতাম বলিয়া তিনি আমাকে সাহিত্যিক বলিতেন) নূতন কবিতার বই কিছু দাও! তাঁর জন্যে আমি আগেই এক বোঝা বাংলা কবিতা বই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বিরাট কাব্য-গন্ধমাদনটিকে অনায়াসে কুক্ষিগত করিয়া যখন তিনি উঠিতেছেন, শুধাইলাম—রাম-দা, ভূতের দেখা মিলল?

পুঁথির বোঝাটা ধপ্‌ করিয়া তক্তপোষের উপরে ফেলিয়া বলিলেন—যা নেই তার দেখা মিলবে কি ক'রে?—এই বলিয়া নিজের আধুনিকতম ভৌতিক এড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী বিবৃত করিলেন। গল্প শেষ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—না হে, ও জিনিষ নেই।

আমার পাশেই রমেশ বসিয়াছিল, সে এক রকম পুরাতাত্ত্বিক, অর্থাৎ পুরানো বাড়ীর দালাল; সে বলিল—রাম-দা, এ পাড়ায় একটা ভূতের বাড়ী আছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—সেই ঘোষেদের তেতালা বাড়ীটার কথা বলেছি হে।

পূর্ব্বোক্ত পুরাতন ভূতের বাড়ীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম—হাঁ, ওটাতে ভূতের উপদ্রব আছে শুনেচি।

রাম-দা'র মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ভূত আছে এ বিশ্বাসে নয় একটা এড্‌ভেঞ্চার জুটিল এই আশায়।

তিনি বলিলেন— চল হে যাওয়া যাক্।

আমাদের মধ্যে যতীন ডিটেক্‌টিভ, কারণ রহস্য-পিরামিড সিরিজের ১৫২-খানা বই পড়িয়া ফেলিয়াছে, সে বলিল—রাম-দা, রাত ছাড়া তো সুবিধে হবে না।

রাম-দা বলিলেন—যা দিনেও নেই, তা রাতেও নেই। বেশ রাতেই যাবো। বাড়ী-ওয়ালাকে ব'লে রাতটা সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

রমেশ বাড়ী-অলার অনুমতি আনিতে গেল, আর যতীন টর্চ-বাতি, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। তারা রাম-দার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে।

রাম-দা বলিলেন—রাতটা জাগতে হবে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিইগে।

তারপরে বলিলেন—যাক্ ভালই হ'ল—রাতটা যখন জাগতে হবে, নূতন কবিতার বইগুলো পড়ে ফেলা যাবে। কি বল?

বলিলাম—ভালই হবে।

রাম-দা রাত্রির ঘুম আগাম ঘুমাইয়া লইবার জন্য বাসায় রওনা হইলেন।

৩

রাত্রে আহারান্তে রাম-দা দলবল লইয়া ঘোষেদের ভূতের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। দোতালার হলঘরটি আগেই পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে শতরঞ্চি বিছাইয়া সকলে শুইয়া পড়িল। পোড়ো বাড়ীতে

আর বিদ্যুতের আলো কে রাখে? গোটা দুই হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতে থাকিল; বিপদের জন্য গোটা কয়েক টর্চবাতি আনা হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার মধ্যে বার কয়েক চা হইলেও ঘুমে চোখের পাতা ভার হইয়া আসিতেছিল।

রমেশ বলিল—রাম-দা, ঘুম পাচ্ছে যে!

যতীন বলিল—রাম-দা, কবিতাই যখন পড়ছ, উচ্চস্বরে পড়ো আমরাও শুনি।

রাম-দা, বাংলা কবিতার বোঝা সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ একমনে পড়িতেছিলেন, এবারে মুখ তুলিয়া বলিলেন—এসব কি তোমাদের ভাল লাগবে?

বল কি? আসন্ন ভূতের ভয়ের সম্মুখে বাংলা কবিতা মনোরম লাগবে না, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা আমার নেই।

রাম-দা স্বগতভাবে বলিলেন—যা বল, আজকালকার কবিরা খাসা লিখছে হে।

—পড়ুন, রাম-দা, পড়ুন। কবিতা-শোনবার এমন পরিপূর্ণ অবসর দুর্লভ।

—ভূত, না ছাই। এই দেখ না রাত একটা।—একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রাম-দা এই কথাগুলি বলিলেন। তারপরে সকলের আগ্রহাতিশয্যে পড়িতে লাগিলেন—শোন তবে, এই দেখ, ঈগল পাখীর উপরে কি সুন্দর কবিতা!

"অধৃষ্যের তপস্যার নৈরাজ্য বিলাসে
তপশ্চর মহীয়ান্!
দুন্দুভি, দামামা!
হোরা, অক্ষ, দ্রাঘিমা, লঘিমা,
ঈডিপাস্ বিষম কম্‌প্লেকস্।"

চমৎকার! চমৎকার! রাম-দা নিজেই উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এইবারে দেখ—ঈগল আর সাপে যুদ্ধ হচ্ছে!

"পীগম্যালিয়ন বক্তা আর
সুন্দরী মেনকা।

মৈনাক কৈ নাক দন্ত
ফুৎকার চীৎকার।
অন্ধ হ'ল রন্ধ্র তব।
মার্ক্স্ কই আলো?
লেনিন লণ্ঠন জ্বালো।
মধ্যবিত্ত হাসি আর অশ্রু আভিজাত্য।
তাজমহলের গম্বুজ
দা-ভিঞ্চির তুলি,
হুইটম্যানের দাড়ি,
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"
... . . — — ? ? ... ! ! — —
মিলিয়নের মিলেনিয়াম!
সাপ আর ঈগল।"
—কি হে, ঘুমোলে নাকি?

রমেশ বলিল—কি যে বল রাম-দা। এমন কবিতা শুনলে স্বয়ং কুল-কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, আর আমরা ঘুমোব?

রাম-দা বলিলেন—ওয়াণ্ডারফুল!

যতীন সঙ্কোচে বলিল—অর্থ বোঝা কঠিন।

—কিছু কঠিন নয়। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করলেই বুঝ্তে পারবে।—এই বলিয়া রাম-দা সেই সরল ও সরস কবিতা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ হলের দরজা জানালা খুলিয়া গেল। সকলে লাফাইয়া উঠিল, ব্যাপার কি? বাতাস নাই, ঝড় নাই, জানালা খুলিল কেমন করিয়া? কবিতা পাঠে বাধা পাইয়া রাম-দা বিরক্ত হইলেন; উঠিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিযা আবার কবিতা পাঠ আরম্ভ করিলেন—চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আধুনিক বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ কবিতাটি।

"কীটদষ্ট চক্রবাক্
উন্মোচিত, হে বাচাল,
জনতা সজ্ঘাতে তব অসূর্য্যম্পশ্য মাতে।

পোষ্ট-কার্ড আর খাম
বেড়েছে তার দাম।
বেশি দিন নয় আর
আসছে লাল দানব
ওই শোনা যায় হুঙ্কার
ইনক্লাব ফৈজাবাদ!
স্বেচ্ছাচারী ট্রাম
ক্রতুকৃতমের শেষ
আকাশের চাঁদ, আর এরোপ্লেন
বোমা আর শিলাবৃষ্টি
অজবন্ধু মাতরিশ্বা
ট্রয়, দিল্লী, ব্যাবিলন।"

আবার সশব্দে দরজা-জানলা খুলিয়া গেল। ব্যাপার কি?

এমন সময়ে সকলে দেখিল অতি বিরাট ও অতি কুৎসিত এক পুরুষ ঘরে ঢুকিতেছে। পায়ে তার খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, খাটো একখানা কাপড় পরণে, কাঁধে গামছা। রমেশ ও যতীন রাম-দা'র পিছনে গিয়া লুকাইল।

রাম-দা শুধাইলেন—মশায় কে?

কিন্তু সেই পুরুষ তার উত্তর না দিয়া অত্যন্ত করুণভাবে বলিল আপনারা আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, ছেড়ে দিন লোকটার স্বর ঈষৎ অনুনাসিক!

রাম-দা শুধাইলেন—আপনি কে?

—আজ্ঞে আমি এই বাড়ীতে থাকি।

রাম-দা বলিলেন—এতক্ষণ দেখিনি কেন?

—আজ্ঞে পাশের বেল গাছটার উপরে বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

রাম-দা—আপনি কি?

—আজ্ঞে হাঁ, আপনারা যাকে ব্রহ্মদৈত্য বলেন আমি সেই।

রমেশ ও যতীন গোঁ গোঁ করিয়া মূর্চ্ছা গেল।

রাম-দা বলিলেন—আপনি যেখানে খুশী বসে হাওয়া খান, কিন্তু এখানে কেন?

—আজ্ঞে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না।

রাম-দা বলিলেন—কষ্ট দিলাম কোথায়?

সে বলিল—ওই যে ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়ছিলেন, ওতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

রাম-দা বলিলেন—ভূতের মন্ত্র কোথায় পেলেন? এ তো কবিতা, আধুনিক কবিতা।

সে বলিল—আজ্ঞে ভূতের মন্ত্র তো কবিতাতেই লেখা হয়।

তারপর সে বইয়ের গাদা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বলিল—সর্বনাশ। ভূতের মন্ত্রের এতগুলো বই ছাপা হয়েছে! আমি হচ্ছি নবাব আলীবর্দীর সময়ের ভূত। তখনকার দিনে ভূতের ওঝা ছিল লালগোলার হোসেন মিঞা। সে আর কটা মন্ত্র জানতো?

রাম-দা বলিলেন—এ যে ভূতের মন্ত্র তা কে বলল?

লোকটা বলিল—আমি নিজে ভূত, আমি বলছি! আপনার প্রত্যেকটি শ্লোক তপ্ত লোহার মত আমার গায়ে বিঁধছিল। কিছুকাল আগে এই বাড়ীর মালিক রিষড়ে থেকে ওঝা এনেছিল। সুবা বাংলার শ্রেষ্ঠ ওঝা। সে-ও আমাকে তাড়াতে পারেনি। কিন্তু আপনি আমাকে হার মানিয়েছেন! এবারে অনুমতি করুন, আমি বাড়ী ছেড়ে পালাই।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—নাঃ, বাড়ীটা বেশ ছিল। একদিকে বেল গাছ, একদিকে তাল গাছ, হাওয়া খাবার কি সুবিধেই না ছিল।

আবার একটু থামিয়া বলিল—ধন্য আপনার শিক্ষা। এই সব মন্তর আবার যখন ছাপা হয়েছে, বাংলা দেশে আর আমাদের বাস করা চলল্ না দেখছি। বাঙালী ভূত বাংলার বাইরে গেলে কি আর জায়গা মিলবে? ছাতু ভূত, মোড়ো ভূত, বেহারী ভূত, পাঞ্জাবী ভূত—সবাই বলবে, "বাঙ্গালী ভূঁত বংলামে যাঁও।" তা তাদের তাড়া খাই, সেও ভাল; না হয় পাগড়ী প'রে বাঙালীকে গাল দিয়ে রাষ্ট্রভাষা শিখে নিয়ে জাত ভাঁড়াবো, কিন্তু আপনার মন্তর অসহ্য।

এই বলিয়া সে গলায় গামছা দিয়া রাম-দার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল।

অনেক চেষ্টার পর রমেশ ও যতীনের মূর্চ্ছা ভাঙিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ঘটনা নানালোকে নানাভাবে বলিতে লাগিল! কেহ বলিল—রাম-দা লড়াই করিয়া ব্রহ্মদৈত্য তাড়াইয়াছেন; কেহ বলিল—শর্ষে পড়া দিয়া; আবার কেহ বলিল—মন্তর পড়িয়া। আসল রহস্য কেহই জানিল না, তবে সকলেই দেখিল যে বাড়ীটাতে আর কোন উৎপাত নাই।

রাম-দা এখন নামজাদা ভূতের ওঝা; তিনি ভিজিট লইয়া ভূত তাড়ান, মানুষকে ভূতে পাইলে ভূত ছাড়ান; খানদুই বাড়ীও কলিকাতায় করিয়াছেন। রাম-দা'র কবিতাপাঠ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সার্থক হইয়াছে। তাঁর ঠিকানা চাই? ঠিকানা দেওয়া বাহুল্যমাত্র তাঁর পরিচয় আজ কে না জানে?

কাঙালী ভোজন

সেদিন একখানা বইয়ে একটি গল্প পড়িলাম!

এক রাজার একবার বড় ইচ্ছা হইল যে তিনি যে নরমাংস ভোজন করিবেন! তিনি প্রধান পাচককে ডাকিয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী পাচককে বলিলেন যে তুমি নরমাংস রন্ধন করো, কিন্তু আমাকে না জানাইয়া তাহা রাজাকে দিও না।

নরমাংস পাক হইলে প্রধান মন্ত্রী চাখিবার জন্য একখণ্ড মাংস মুখে দিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাহা অমৃতের মত সুস্বাদু। অমনি তিনি প্রচুর পরিমাণে লবণ তাহাতে ঢালিয়া দিয়া পাচককে বলিলেন—এইবারে রাজাকে খাইতে দাও।

রাজা ওই অতিলবণাক্ত মাংস মুখে দিয়া বিরক্ত হইলেন এবং পাচককে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন!

প্রধান মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুধাইলেন—মহারাজ, মাংস কেমন লাগিল ?

রাজা বলিলেন—মাংস অত্যন্ত লবণাক্ত।

মন্ত্রী বলিলেন—এইরূপ যে হইবে তাহা আমি জানিতাম! অন্যান্য পশুপক্ষী লবণ খায় না; সে সব মাংসে লবণ দিতে হয়, মানুষ খাদ্যে লবণ খায়, কাজেই স্বভাবতঃই তাহার মাংস অত্যন্ত লবণাক্ত হইবে।

রাজা বলিলেন—তাহা হইলে আমার নরমাংস, ভোজন আর হইল না।

মন্ত্রী মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

পরে এক সময়ে পাচক মন্ত্রীকে মাংসে লবণ দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মন্ত্রী বলিলেন—লবণ দিয়া নরমাংস বিস্বাদ না করিয়া দিলে, মহরাজ যদি বুঝিতেন যে নরমাংস সত্যই সুস্বাদু, তবে কি আর রাজ্যে মানুষ থাকিত। আবার রাজ্যে মানুষ ফুরাইলে তিনি পররাজ্য আক্রমণ করিতেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাজা মহারাজারাও নরমাংসের গুণ বুঝিতে পারিত, এবং কালক্রমে পৃথিবীর রাজা মহারাজারা মিলিয়া পৃথিবীর সব মানুষ খাইয়া ফেলিয়া পৃথিবী মানুষ-শূন্য করিয়া তুলিত। কাজেই মহারাজাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য—আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গল্পটি এই।

ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে নরমাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। আর মিথ্যা মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? রাজা মহারাজাদের যে নরমাংসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে, তাহা কে না জানে?

এখন, নরমাংস সুস্বাদু বলিয়া পড়িবার পর হইতে আমার মনে একটি মহৎ আইডিয়া উদিত হইয়াছে।

কিছুদিন হইল কলিকাতা সহরে ভিক্ষুক-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। সত্য বলিতে কি ভিক্ষুক সমস্যা কলিকাতার নাগরিক জীবনের একটি প্রধান বিঘ্ন। ভিক্ষুকরা গৃহস্থের বাড়ীতে না শুইয়া ফুটপাথে রাত্রি কাটায়। কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব! তুমি যখন সুশোভন হোটেলে বসিয়া দামী

খানা খাইতেছ তখন পথের ওপারে তাহার ক্ষুধিত মুখ দেখা দিয়া তোমার রসভঙ্গ করে।

তুমি যখন মোটরে বান্ধবী (অনেক সময়েই পরস্ত্রী) লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছ তখন সে কোথা হইতে অকস্মাৎ মোটরের মধ্যে তাহার বীভৎস হাত বাড়াইয়া দিয়া ভিক্ষা চায়। কি আস্পর্দ্ধা! এমন কি মাঝে মাঝে তোমার মোটরে চাপা পড়িয়া গিয়া তোমার মোটর (যার মূল্য এখনো শোধ হয় নাই) জখম করিয়া দেয়।

এ হেন ভিক্ষুক-উপদ্রব দূর না করিলেই নয়, এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে অভিন্নমত।

একবার শুনিয়াছিলাম যে তাহাদের জন্য নগরোপকণ্ঠে এক প্রাসাদ তৈয়ারি হইবে—আজিও সে প্রাসাদ আকাশ-প্রাসাদ রহিয়া গিয়াছে। আর তৈরী হইলেই বা কি? তাহাতে কি ফুটপাথচারী ভিক্ষুকেরা স্থান পাইবে? মন্ত্রী, কাউন্সিলার, এম, এল, এ, মহাশয়দের সুপারিশ তাহারা কোথায় পাইবে?

অতএব ওসব উপায়ে ভিক্ষুক-সমস্যার নিরাকরণ হইবে না। এক্ষণে আমি একটা উপায় বলিতেছি—ইহাতে নিশ্চিত এই সমস্যার সমাধান হইবে।

কলিকাতায় ছোট বড়, ভালমন্দ অসংখ্য রেষ্টুরেণ্ট আছে—তাহাতে প্রতিদিন হাজার হাজার চপ, কাটলেট ও প্রচুর পরিমাণ মাংস বিক্রয় হয়। এখন, এই ভিক্ষুকদের ধরিয়া তাহাদের মাংসে চপ, কাটলেট, কোপ্তা, কোর্ম্মা রাঁধিয়া বিক্রয় করিলে শুধু যে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নয়—এক ঢিলে এক ঝাঁক পাখী মরিবে। কত সুবিধা দেখুন।

প্রথমতঃ, ভিক্ষুক সমস্যার সমাধান হইয়া মোটরের পথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে —সহরে মোটর একসিডেণ্ট কমিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পাঁঠা বলিয়া যে সব কুকুরের মাংস রেষ্টুরেণ্টে চালানো হয় সে সব কুকুর প্রাণে বাঁচিয়া যাইবে।

সদ্‌গুণের বিচারে মানুষের চেয়ে কুকুর অনেক শ্রেষ্ঠ তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারো সন্দেহ নাই। আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন যে. Evolu-

tion এর বিচারে মানুষের অনেক ধাপ উচ্চে কুকুর। যে-সব জন্তুকে এখন আমরা কুকুর বলি, এক সময়ে তাহারা মানুষ ছিল, এবং এখন যাহারা মানুষ কয়েক লক্ষ বৎসর পরে তাহারা কুকুর হইবে। কুকুর যে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, এত প্রাণী থাকিতে স্বয়ং ধর্ম্ম কুকুরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাভারতের কাহিনীতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে। প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রাণশক্তি, স্বজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি গুণে কুকুর মানুষের অনুকরণস্থল।

কাজেই এই উপলক্ষ্যে এতগুলি কুকুর বাঁচিয়া গেলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইবে।

তবে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভিক্ষুকদের বধ করিলে মানুষ মারার আইনে দণ্ড হইতে পারে।

ইহা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমার নিজের অভিমত, ভিক্ষুকেরা মানুষ নয়! মানুষের মত তাদের আকৃতি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও বলিব যে মানুষের মত আকৃতি হইলেই মানুষ হয় না। যাহারা ফুটপাথে ঘুমায়, রুগ্ন, দরিদ্র, নিরন্ন, নির্ব্বাস তাহাদের মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া আমি মনুষ্যজাতিকে অপমান করিতে পারি না।

তবে নিতান্ত যুগধর্ম্মের খাতিরে যদি তাহাদের মানুষ বলিয়া স্বীকার, করিতেই হয়, তাহাতেই বা ভয় কিসের?

কাউন্সিল আছে, তাহাতে একটা আইন পাশ করিয়া নিলেই চলিবে। সেখানে যদি কেহ বিপরীত তর্ক তোলে? সে ভয় নাই। হাতের জোরে সেখানে সত্যনির্দ্ধারণ হয়, হাতের তো আর মাথা নাই। আর ইহার চেয়েও অনেক অসম্ভব আইন সেখানে পাশ হইয়াছে, কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—ইহাও পাশ হইয়া যাইবে যে ভিক্ষুকেরা মানুষ নয়, তাহাদের বধ করিলে কোন দণ্ড হইবে না।

বিশেষ, নিত্য অভাবগ্রস্ত গভর্ণমেণ্টের ইহাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। ভিক্ষুকদের স্বত্বস্বামিত্ব গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া সম্পত্তি ইহা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতে পারেন। রেষ্টুরেণ্টের মালিকরা গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক ভিক্ষুক পিছু কিছু দিয়া কিনিয়া লইবে; তাহাতে খুব বেশি দাম লাগিবে না। পাঁঠা

ওরফে কুকুরের মাংসের সের যদি দশ আনা হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকের মাংসের সের পাঁচ আনা ফেলা যাইতে পারে। তবে এসব detail স্থির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটা কমিটি বসাইতে পারেন।

আবার দেখুন, ভিক্ষুকদের ইহাতে কত সুবিধা! তাহাদের ভিক্ষা করিতে হইবে না, ফুটপাথে ঘুমাইতে হইবে না, মোটরচাপা পড়িতে হইবে না, এমন কি চপীভূত হইবার জন্য ঘাতকের আঘাতও সহ্য করিতে হইবে না। অস্ত্রাঘাতে বধ করিলে রক্ত পড়িয়া নষ্ট হইবে, ভিক্ষুকের গায়ে আর কতটুকুই বা রক্ত! রক্তপাত না করিয়া তীব্র ইলেকট্রিক শকে' তাহাদের মারিলেই চলিবে। চপ, কাটলেট বনিয়া গিয়া ধনীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করার চেয়ে ভিক্ষুকরা আর কি সৌভাগ্য কল্পনা করিতে পারে?

আবার এই ভিক্ষুকদের monopoly হইতে গভর্ণমেণ্টের যে লাভ হইবে তাহা দিয়া আরও জন দশেক মন্ত্রীর বেতন হইতে পারে। কাউন্সিলে আড়াইশ সভ্য, আর মন্ত্রীমাত্র দশজন, ইহাতেই কাউন্সিলে যত কিছু দ্বেষ-প্রেমের গণ্ডগোল। যে দিন পাঁচশো সভ্য পাঁচশো মন্ত্রীতে পরিণত হইলেন —সে দিন আর 'দ্বেষের' কাজ লইয়া বিবাদ থাকিবে না।

এখন একটা তর্ক উঠিতে পারে যে এমন ভাবে চলিলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দেশের সব ভিক্ষুক নিঃশেষ হইয়া যাইবে—তখন কারা বা ধনীদের জন্য চপ হইবে আর কারা বা অতিরিক্ত মন্ত্রীদের বেতন জোগাইবে?

ইহাতে ভয় পাইবার কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশের যে-আইন এবং পৃথিবীর যে আবহাওয়া তাহাতে ভিক্ষুক শ্রেণী কখনো লোপ পাইবে বলিয়া বোধ হয় না—বরঞ্চ উত্তরোত্তর ভিক্ষুকশ্রেণীর বাড়িবারই সম্ভাবনা।

এখন স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল ভিক্ষুকই কিছু নীরোগ নয়; রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদের মাংস ধনীদের পাতে দেওয়া চলে কিনা? ইহাতে কি ধনীদের বাঁচিবার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না?

এ প্রশ্ন সমীচীন বটে। তবে ইহারও সমাধান আছে। ভিক্ষুকদের

monopoly লক্ষ টাকা হইতে একটি হাসপাতাল খোলা যাইতে পারে। রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদের সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা করিয়া নীরোগ হইলে তখন তাহাদিগকে বিক্রয় করা চলিবে—বরঞ্চ হাসপাতাল-ফেরৎ ভিক্ষুকদের চাহিদা বেশী হইবে; চাহিদা অনুসারে দাম, কাজেই তাহারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রীত হইবে! ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—ফাঁসির আসামীকেও বহুব্যয়ে আরোগ্য, সুস্থ, সবল করিয়া তুলিয়া তবে ফাঁসি দেওয়া হয়—কারণ একটা রুগ্ন মানুষকে ঝুলাইলে মানুষের হননবিজ্ঞান তৃপ্তিলাভ করে না।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমি এই সমস্যার সামাজিক, স্বাস্থ্যিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক্ দিয়া আলোচনা করিলাম—এক্ষণে আশাকরি এ বিষয়ে দেশের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা বিস্তার লাভ করিবে।

পাঠক, তুমি যদি ধনী হও—ইহাতে তোমার লাভ; আর যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ তুমি ভিক্ষুকশ্রেণীভুক্ত হও, তবু তোমার ক্ষতি নাই; হয় তুমি চপ খাইবে, নতুবা চপীভূত হইবে।

বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথন-কৌশল, প্রতিপত্তি, ব্লপ, তহবিল-ভঞ্জন প্রভৃতি যে সব গুণ থাকিলে 'পপুলার ইলেক্‌শনে' যাওয়া যায়, তার সবগুলি আমার নাই—তবে আশা করিতেছি শীঘ্রই সে সব আয়ত্ত করিয়া আইন পরিষদে যাইতে পারিব। কিন্তু যতদিন আমি এম, এল, এ, না হইতে পারিতেছি আমার হইয়া কোন সদাশয় মেম্বার কি পরিষদে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবেন? তিনি সকল দলের অনুমোদন যে লাভ করিবেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইলে, আমরা তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা কঠিন প্রস্তরে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া গোলদীঘিতে স্থাপন করিয়া দিব—এখনও সেখানে কিঞ্চিৎ স্থান অবশিষ্ট আছে।

পুনশ্চ:

সুইফ্‌ট নাকি ঠাট্টা করিয়া এই জাতীয় একটা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুইফ্‌টের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই যে এই প্রস্তাব ঠাট্টাবিদ্রূপ নয়—নিতান্ত আন্তরিক!

"পরিস্থিতি"

আমি একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সপ্তাহের ছয়দিন আমি সাংবাদিক, সপ্তমদিনের সেই আমিই সাহিত্যিক। ছয়দিন যারা আমাকে জার্নালিজম করিতে দেখিয়াছে, সপ্তমদিনে তারা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না।

মাথার উপরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে; বাঁ হাতে রয়টারের সংবাদের কাগজের খণ্ড; ডান হাতে কলম, কোলের কাছে শাদা কাগজ; সম্মুখে চলন্তিকা অভিধান; আর আমি অবলীলাক্রমে অভিধান ও ব্যাকরণের ট্রেঞ্চ ও সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন অতিক্রম করিয়া সাংবাদিকতার সর্ব্বধ্বংসী ট্যাঙ্ক চালাইয়া দিয়াছি। শুনিয়াছি ট্যাঙ্কভেদী কামান বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে ভেদ করিতে পাবে এমন কামান কোথায় আছে?

বেশ ছিলাম। হঠাৎ কাগজের সম্পাদকের মাথায় দুষ্টা সরস্বতী চাপিল, সোমবারের কাগজের সঙ্গে কযেক পাতা সাহিত্যিক ক্রোডপত্র জুড়িয়া দিতে হইবে। আমরা বলিলাম—সাহিত্যিক কই?

সম্পাদক সংস্কৃত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—'আত্মানং বিদ্ধি।' তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—নিজেদের জান্‌তে শেখো! তোমরাই সাহিত্যিক! সাহিত্যিক কি গাছে ধবে!

এই আপ্তবাক্যের ফলে আমরা সাহিত্যিক হইয়া গেলাম—কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি লিখিতে লাগিলাম, শেষে সত্য সত্যই আমাদের ধারণা হইয়া গেল, আমরা সাহিত্যিক, কারণ সোমবারের ক্রোড়পত্রের কাটৃতি হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আমরা জরাসন্ধের মত কেরানি ও লেখকের যুক্তসংস্করণ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে রক্ষা করিতে পারে? বিপদে পড়িলাম।

২

একদিন সন্ধ্যা বেলায় কলম পিষিয়া যাইতেছি। পাঠক! সন্ধ্যা বেলাতেই আমাদের কাজের আরম্ভ। সংস্কৃতে আছে, কবি, প্রেমিক ও চোরেরা রাত্রিকাল পছন্দ করে; স্পষ্ট-বুঝা যাইতেছে সেকালে সংবাদপত্র ছিল না; থাকিলে ওই সঙ্গে সাংবাদিকের নামও পাইতাম।

এমন সময়ে সম্পাদকের ঘর হইতে আমার ডাক আসিল, গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মশায়, আপনি বাঙালী নন্।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে বাঙালী বইকি। তবে কিছুদিন আসামে ছিলাম।

সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন—ঠিক, আসামী।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে, অল্পদিন ছিলাম, ডমিসাইল্‌ড হইনি।

তিনি বলিলেন—সে আসামী নয়; ক্রিমিনাল, যাকে বলে—রাগের আতিশয্যে আর কিছু তিনি বলতে পারিলেন না। আমি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম—কেন?

কেন? বাঙালী হ'লে আপনি এ-ভাবে বাংলার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করতে পারতেন?

সম্পাদক ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

আচ্ছা বলুন তো সংবাদপত্রের একখানা পাতা লম্বায়, চওড়ায় কত ইঞ্চি?

বলিতে পারিলাম না।

সম্পাদকের মুখ দিয়া দিয়া অটোম্যাটিক্যালি বাহির হইয়া আসিল—ধিক্।

লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

—একখানা পাতা আগাগোড়া টান্ ক'রে খুলে ফেললে হয় ৩৬″× ২২″, এমন থাকে ৪ খানা পাতা, অর্থাৎ পৃষ্ঠা।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্রোধে ও আনুষঙ্গিক একটা কারণে লাল দুই

চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন—পাঠশালায় বর্গফলের আঁক কষেছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে গুণ করুন; করে বলুন কত বর্গ ইঞ্চি জায়গা হ'ল।

—আজ্ঞে ১৯২ বর্গ ইঞ্চি।

—বেশ!—সম্পাদক যেন একটু প্রসন্ন হইলেন। বোধহয় ইতিপূর্ব্বে কোন সাংবাদিকের নিকটে এতখানি বিদ্যার পরিচয় তিনি পান নাই! তারপরে বলিলেন—কালকার কাগজে মধ্যইউরোপ সম্বন্ধে ওই নিবন্ধটা তো আপনিই লিখেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

তখন কাগজের সেই পাতাটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—আচ্ছা এখানে কেন লিখলেন—"মধ্যইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ।"

—আজ্ঞে, অবস্থা যে সত্যই ভয়াবহ।

—আবার 'অবস্থা'!—আহত শার্দ্দূলের মত লাফাইয়া উঠিলেন।

—আজ্ঞে তবে কি লিখব?

—কি লিখবেন? অবস্থা নয়, অবস্থিতি, পরিস্থিতি!

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম—সেটা কি?

কিন্তু দেখিলাম আমার কথা শুনিয়া তাঁর বিস্ময় আরও বেশী হইয়াছে!

—পরিস্থিতি জানেন না, আর আপনি সাংবাদিকতা করতে এসেছেন?

—আজ্ঞে, একটা শব্দ না জানলে কি আসে যায়?

তিনি বলিলেন কোন শব্দ না জানলে কিছু আসে যায় না, সে কথা মানি। কিন্তু পরিস্থিতি তো একটা শব্দ নয়, ও যে একটা [illegible]ফি—সংবাদপত্রের ফিলজফি!

আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না—একটা [illegible] বসিয়া পড়িলাম।

সম্পাদক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ফিলজফির [illegible] যাইতে লাগিলেন!

—তবে শুনুন! এখনি তো বললেন যে [illegible] থাকে

৭৯২ বর্গ ইঞ্চি! আপনি যদি 'পরিস্থিতি' না লিখে 'অবস্থা' লেখেন, তবে, প্রত্যেক 'অবস্থা'য় একটা করে অক্ষর কম লিখ্‌তে হয়। তাতে যে-জায়গাটা ফাঁক থাকলো, সেখানে অন্য অক্ষর বসাতে হ'লে আপনাকে বেশী চিন্তা ও পরিশ্রম করতে হবে!

আমি বলিলাম,—আজ্ঞে পরিস্থিতি শব্দটা আর ক'বার ব্যবহার করা চলে! ও'তে আর এমন কি পরিশ্রম বাঁচে?

ধিক্কারের সঙ্গে সম্পাদক বলিলেন—ওই তো ফিলজফি-টা ধরতে পারেন নি! যেখানে চার অক্ষরের শব্দ পাবেন, সেখানে তিন অক্ষরের শব্দ বসাবেন না; যেখানে তিন অক্ষরের পাবেন, সেখানে দু'অক্ষরের বসাবেন না। ভেবে দেখুন এ'তে কত কম পরিশ্রমে ও চিন্তায় কত বেশি জায়গা জুড়ে ফেলা যায়। এবারে একবার হিসাব করুন, বাংলা দেশে কতগুলো সংবাদপত্র বের হয়, তা'তে কত বর্গ ইঞ্চি জায়গা থাকে; মাসে কত বর্গ ইঞ্চি হ'ল! এই ফিলজফি অনুসরণ করলে কত কম পরিশ্রমে কত বেশী কাজ হয়। এবং এর যোগফল ক'রে দেখুন, বাঙালীর কত অর্থ ঘরে থেকে যায়! বুঝলেন!

বলিলাম—আজ্ঞে তা'হলে 'বাঘ'এর বদলে 'শার্দ্দূল' লিখতে হবে?

সম্পাদক উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন—ঠিক, ঠিক ধরেছেন; হাজার হোন আপনি বাঙালী তো! তারপরে যেন নিজের মনেই বলিলেন—ম্যাক্সমূলর বলেছিলেন, ভারতীয়েরা জন্ম থেকেই দার্শনিক; আমি বলছি—প্রত্যেক বাঙালী জন্ম থেকেই সাংবাদিক!

আমি সম্পাদকের প্রসাদ পাইয়া টেবিলে ফিরিয়া গেলাম—ও তদ্দণ্ড হইতে 'অবস্থা'র বদলে 'পরিস্থিতি', 'বাঘ' এর বদলে 'শার্দ্দূল', 'দুর্ব্বলতা'র বদলে 'স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য', 'অগ্নি'র বদলে 'বৈশ্বানর' প্রভৃতির শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সম্পাদক আমার উপরে ভারি খুশী।

৬

এখন একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের কাগজের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল—নাম 'ধুরন্ধর'—ইহাদের মধ্যে সনাতন জ্ঞাতিবৈরী-ভাব ছিল। আর ইহাদের সম্পাদকের যদি তুলনা করা যায়—কে কম, কে বেশি স্বয়ং বিধাতা বলিতে পারেন না—যেন বিধাতাপুরুষের মানসিক যমজ সন্তান—দুই জনেরই ওজন পাকি আড়াই মন!

কোন্ কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কি বাহির হইবে তাহা দেখিবার জন্ত দেশশুদ্ধ লোক অপেক্ষা করিয়া থাকিত। 'ধুরন্ধরে' যদি আজ কৃষি সম্বন্ধে লিখিত হইল, অমনি আমাদের কাগজেও কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইল—তাহার ছত্রে ছত্রে ধুরন্ধরের গবেষণাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইত!

'ধুরন্ধরে' রিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল—তার পরদিন আমাদের কাগজেও রিলেটিভিটির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ! আমাদের সম্পাদকের বিদ্যার পরিধি দেখিয়া আমরা বিস্মিত, গৌরবান্বিত, পুলকিত হইতাম।

কিন্তু একদিন বড় অঘটন ঘটিল। 'ধুরন্ধরে' মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইল—একেবারে সম্পাদকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি তিনি কোন্ রেল কলিশনে পড়িয়াছিলেন—তারই স্মৃতি। প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম—আজ আমাদের সম্পাদক কি করিবেন!

আমাদের মধ্যে একজনের রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে বলিল—কোন ভয় নেই, সম্পাদকের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আছে।

আমরা বলিলাম—কি রকম?

সে বলিল—একদল লোক আছেন যাঁরা মরবার আগে অনেক বার মরে থাকেন, আমাদের সম্পাদক সেই দলের।

আমরা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু সকলেই ধরিয়া রাখিলাম সম্পাদক সহজে ছাড়িবেন না, একটা কিছু করিবেনই।

রাত্রি ন'টা বাজিয়া গেল—সম্পাদক আফিসে আসিলেন না; সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ পাওয়া গেল না—আর দেরি হইলে সম্পাদকীয় স্তম্ভ শূন্য থাকিয়া যাইবে। সকলে আমাকে বলিল, তুমি একবার তাঁর বাড়ীতে যাও।

আমি সম্পাদকের বাসায় রওনা হইলাম। বাসায় পৌঁছিলাম। নীচের তলা অন্ধকার। দোতলায় উঠিলাম সেখানেও অন্ধকার—কেবল একটা ঘরে যেন আলো জ্বলিতেছে। সেই দিকে চলিলাম। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল—ঠেলিতেই খুলিয়া গেল; খুলিতেই যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়িল, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—ভয়াবহ পরিস্থিতি!

ঘরের কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়া আড়াইমণি সম্পাদক ঝুলিতেছেন। বিদ্যুৎবেগে একটি সন্দেহ মগজের মধ্যে খেলিয়া গেল—ইহা নিশ্চয় 'ধুরন্ধর' সম্পাদকের কাজ! কারণ মেঝেতে দেখিলাম—কাগজ ও কলম পড়িয়া রহিয়াছে, কাগজের উপরে যেন একটি প্রবন্ধের নাম—'আমার মৃত্যু।' বুঝিলাম 'ধুরন্ধরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উত্তর দিবার জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলেন—এমন সময়ে 'ধুরন্ধর' সম্পাদক আসিয়া এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আর ভাবিবার সময় ছিল না—তিনি তখন অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শূন্যে পা ছুঁড়িতেছেন। আমার পকেটে কাঁচি ছিল (জর্ণালিষ্ট ও সম্প্রদায়বিশেষের পকেটে কাঁচি সর্ব্বদাই থাকে)। আমি ক্রতহস্তে দড়ি কাটিয়া দিলাম; পাকি আড়াই মণ সশব্দে মাটিতে বাধ্যতামূলক অবতরণ করিলেন। পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। মাথায় জল দিলাম, হাওয়া করিলাম—প্রায় একঘণ্টা পরে সম্পাদক জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া চোখ মেলিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

আমি পরিচয় দিয়া বলিলাম—একি ভয়াবহ—

তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—পরিস্থিতি! তারপর উঠিয়া বসিয়া রাগিয়া বলিলেন—তুমি দড়ি কাটলে কেন?

আমি বলিলাম—জার্নালিষ্ট বলে' কি মানুষ নই!

তিনি বলিলেন—তুমি মানুষ-ই, জার্নালিষ্ট নও।

সে কি স্যার—আপনার প্রাণ বাঁচালাম।

তিনি বলিলেন—তুমি প্রাণই চেন, মান চেন না, এখন আমি 'ধুরন্ধরে'র প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে কি লিখ্‌বো ?

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—জানো আমি মৃত্যু সম্বন্ধে লিখবার জন্য মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলাম।

সম্পাদকীয় নিষ্ঠা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম—যে রকম অবস্থা আপনার হয়েছিল, আর দু' এক মিনিটের মধ্যে দড়ি না কাট্‌লে যে মরে যেতেন, তখন লিখ্‌তেন কি করে ?

আমার যুক্তিতে তিনি থমকিযা গেলেন। বুঝিলাম এ কথাটা আগে তাঁহার মনে হয নাই, কিছুক্ষণ কোন কথাই তিনি বলিতে পারিলেন না, ইহার আগে কখনো তাঁহাকে হতবুদ্ধি হইতে দেখি নাই।

বিস্ময় দূর হইলে বলিলেন—সে একটা কথা বটে। কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না—তোমার মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব আছে, পূর্ণভাবে সাংবাদিকত্ব জাগে নাই। সত্যকারের সাংবাদিক কখনো আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমার অভিজ্ঞতা নষ্ট করতো না। তোমার চাকরি গেল।

তাঁহার বিকার ও আমার বেকাব দশা ভাবিয়া আমার অজ্ঞাতসারে, অত্যন্ত অনায়াসে আমাব মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—ভয়াবহ—

পাছে 'অবস্থা' বলিয়া ফেলি সম্পাদক দ্রুত পাদপূরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পরিস্থিতি।

গঙ্গার ইলিশ

পণ্ডিতেরা বলেন কাজই নাকি মানবজীবনের লক্ষ্য। হয় তো তাই। কিন্তু এ সব অকাজেব কথা ভাবিবার অবসরটুকু অন্তত পণ্ডিতদের আছে। আমার তাও নাই। আমার কর্মতালিকা দেখিলে পণ্ডিতদেরও স্বীকার করিতে হইত—কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে।

সকালে পাড়ার ছুটি ছেলে পড়াই। ছাত্র দুটির পিতা সত্যই পুত্রের শুভানুধ্যায়ী—পাঠের সময়ে তাঁরা কাছেই বসিয়া থাকেন—একটাও বাজে কথা বলিবার সময় পাই না। একজনের মাছ কিনিয়া দিবার ভার আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত পিতা মৃদু হাসিয়া বলেন, মাস্টার মশায়, একবার বাজার থেকে···ওরে রামা সঙ্গে যা। আচ্ছা আপনি এগোন—রামা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য রামা যায় না—আমি একাই যাই এবং মাছ কিনিয়া আনি।

চাকরের হাতে মাছ কিনিবার ভার দিলে চুরির আশঙ্কা; আমাকে দিয়া সে ভয় নাই, হাজার হোক নোব্‌ল প্রফেশানের লোক তো! বাঙালি পিতাদের প্রাইভেট্ টিউটারদের উপরে অগাধ বিশ্বাস।

আহারান্তে সাড়ে দশটায় আসল কর্মস্থলে যাই। আমি 'জুট-মিল বিদ্যাকেন্দ্রের' অধ্যাপক। দশটা হইতে ছাত্ররা আসিতে থাকে, এগারটার মধ্যে বাড়ি ভরিয়া যায়; আড়াই হাজার গাঁঠ ছাত্র-সংখ্যা আমাদের। বছরে বছরে দেড় হাজার গাঁঠ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্যই পাঠাইয়া দিই; সেখানে ভালমন্দ মাঝারি দর কষা হইয়া থাকে। আমাদের কাজকে প্রায় নিষ্কাম বলা যাইতে পারে; বেতন এতই অকিঞ্চিৎকর, মাসের প্রথম দিনের পরে হাতে আর কিছু থাকে না। তবে নোব্‌ল প্রফেশানের লোক বলিয়া দোকানে বাকি পাওয়া যায়। হায় হায় লোক ঠকাইবার মরাল কারেজও আমাদের নাই—এ কথা সবাই জানিয়া ফেলিয়াছে। 'জুট-মিল বিদ্যাকেন্দ্রের' মালিক সুবিধাজনক পোষমানা একটা মৃগী ব্যারাম অর্জন করিয়াছেন, বেতন বৃদ্ধির কথা তুলিলেই তিনি মূর্ছা যান।

সন্ধ্যাবেলাতেও ছুটি নাই, রাত্রে 'জুট মিলে' বাণিজ্য শিক্ষা দিই। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি বাণিজ্য শিক্ষার উপযুক্ত সময় বটে। রাত্রি ন'টায় ছুটি। কলিকাতা শহরে নিতান্তই চৌকিদারি প্রথা নাই—নতুবা রাত্রিটা চৌকিদারি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। কাজের জন্যই যখন মানুষের জন্ম তখন আর এ টুকু ফাঁক থাকে কেন?

সেদিন রাত্রি ন'টার সময়ে 'জুট মিল' হইতে বাহির হইতেছি, সহকর্মী

বলিলেন, চলুন বৈঠকখানা বাজার থেকে মাছ নিয়ে যাওয়া যাক্। তার পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, রাত্রে ইলিশ মাছ শস্তা হয়।

আমি বলিলাম—চলুন।

মনে মনে ভাবিলাম, পরের জন্যই তো মাছ কিনিয়া আসিতেছি, নিজের জন্য তো কিনিবার কখনো অবসর হয় না।

সহকর্মী বাজারে ঢুকিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম তিনি মাঝে মাঝে আসেন। ঝুড়ির মধ্যে স্নিগ্ধ চিক্কণ গঙ্গার ইলিশগুলি চক্রাকারে সজ্জিত, ছোট, বড়, মাঝারি; কোনটা বা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা, কোনটা বা চতুর্থীর, কোনটা পঞ্চমীর, কোনটা ষষ্ঠীর।

সের, নয় সিকে। সহকর্মী বলিলেন কাল যে দেড় টাকা ছিল। ওহে গণেশ—

গণেশ মৎস্য বিক্রেতা। সে যেন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অন্য একজন খদ্দের আসিতেই তার প্রতি মনোনিবেশ করিল। সহকর্মী আগামীকল্যের আশায় রহিলেন—আমার এই প্রথম (এবং শেষও বটে) তাই এক সেরের একটা মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে একটা কাগজের থলে ছিল—মাছটা তা'তে ভরিলাম। কেবল শুভ্র পুচ্ছটি বৃদ্ধের পাকা গোঁফের মতো বাহির হইয়া রহিল।

সহকর্মী বলিলেন, আপনি এগোন। বুঝিলাম, গণেশ ও তাঁহার মধ্যে এখন ধৈর্য্য পরীক্ষার দড়ি টানাটানি চলিতে থাকিবে।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকখানা গাড়িতেই সূচীভেদ্য ভিড়। সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া রবার্ট ব্রুসের কীর্তিকে খর্ব করিয়া অষ্টম ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। ভিড়ের জন্য সরলভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হয় নাই; দেহখানা তিন চার দফা বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু হাতে সেই খামখানা ঠিক আছে—তার ফাঁক দিয়া মৎস্য-পুচ্ছ দৃশ্যমান।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তারপরে যা ঘটিয়া গেল একটি মুহূর্তের মধ্যে। একজন পুছিল—কোথায় কিনলেন মাছটা?

—আজ্ঞে বৈঠকখানা বাজারে।

তিনজন সমস্বরে পুছিল—কত নিলে?

নোব্‌ল প্রফেশানের লোকেরা চেষ্টা করিলেও মিথ্যা মুখে টানিয়া আনিতে পারে না। কিন্তু কে যেন আমার মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিল—

—আজ্ঞে পাঁচসিকে।

ট্রামখানা ঘুরিয়া যেমনি শিয়ালদ স্টেশনের মুখে থামিয়াছে, অমনি সেই জনতা মুহূর্ত মধ্যে একজনবৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল—এবং পরক্ষণেই 'বিশেষ ধরণের লরি' অগ্রাহ্য করিয়া বৈঠকখানা বাজারের মুখে ছুটিয়া চলিল। কে বলিল বাঙালির মধ্যে একতার অভাব? তবে তেমন তেমন উপলক্ষ তো চাই।

ট্রাম খালি হইয়া গেল। নিতান্ত কর্তব্যবোধে না বাধিলে বোধ করি কন্‌ডাক্‌টার ও ড্রাইভারও যাইত। আরামে বসিয়া পড়িলাম। বাঙালির মৎস্যপ্রীতি ও যুদ্ধের বাজার সম্বন্ধে কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, কেবল ভয় ছিল হতাশ জনতা দ্রুততর বেগে ফিরিয়া আসিবার আগে ট্রামখানা এ অঞ্চল ছাড়িয়া গেলে হয়। ব্যাপারখানা হাস্যকর, মনে মনে একটু হাসিলামও বটে। কিন্তু তখনও কি জানিতাম এই মৎস্যক্রয় মাৎস্যন্যায়ে পরিণত হইবে!

নির্বিঘ্নে বাসায় পৌঁছিলাম। গৃহিণীর হাতে মাছটি দিলাম।

—কত নিলে?

—পাঁচসিকে।

বারংবার আবৃত্তির ফলে মিথ্যাও নাকি সত্য হইয়া ওঠে—

পাঁচসিকে!

গৃহিণীর মুখে এই প্রথম আমার বুদ্ধির প্রতি প্রশংসার আভা দেখিলাম।

তারপরে আমাকে ছাড়িয়া মাছটি লইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে মাছটি ছাড়িয়া চাকরকে লইয়া পড়িলেন।

—হাঁ হরি, তুমি মাছ কিনতে গেলে তিন টাকা সের লাগে—আর দেখ তো বাবু কেমন পাঁচসিকের মাছ কিনে এনেছে।

হরি কি যেন বলিতে গেল কিন্তু গৃহিণীর ব্লিৎসক্রিগের সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে হরিকে আর দেখা গেল না। হরি খদ্দর পরে,

মেদিনীপুরের লোক, তার আত্মসম্মান কিছু উগ্র। সে যে চৌরাপবাজ পলাইবে—কিছু বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। খবরের কাগজ খুলিতেই চোখে পড়িল, বৈঠকখানার বাজারে দাঙ্গা। মৎস্য ক্রেতা ও জেলেদের মধ্যে মাছের দর লইয়া ছোট-খাটো এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ আমার সেই মৎস্য-লোলুপ জনতার কীর্তি।

বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইব, এমন সময়ে গৃহিণী আমার হাতে পাঁচসিকে পয়সা দিয়া বলিলেন—আসবার সময়ে কালকের মতো একটা মাছ নিয়ে এসো।

কি সর্বনাশ! এ জন্য তো প্রস্তুত ছিলাম না। বলিলাম—আজ তো 'জুট মিল' ছুটি। রবিবার যে।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাজার তো ছুটি নয়। ও বেলা আবার বাজার হয়নি, চাকর পালিয়েছে।

তারপরে আরো তিন দফা পাঁচসিকে হাতে দিয়া বলিলেন—ওই তিন বাড়ির গিন্নীরা দিয়েছে—তাদের জন্যেও তিনটা।

পাড়াতে তিনটি বাড়ীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার গৃহিণী দুপুর বেলা সে বাড়িতে গিয়া স্বামীর অসাধারণ সাফল্যের বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আসিবার সময়ে মাছের সুলভ মূল্য লইয়া আসিয়াছেন।

অগত্যা গৃহিণীর স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চার দফা পাঁচসিকে পয়সা লইয়া যাত্রা করিলাম। বাজারে পৌঁছিয়া ভাবিলাম যা করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ।

সিদ্ধিদাতা গণেশই বটে! পূর্বোক্ত গণেশ তখন দুই ঘটি সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পার্শ্ববর্তীর হাতে এক ঘটি দিতেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই চিনিল। নোব্‌ল প্রফেশানের লোক দেখিলেই চেনা যায়।

—কত করে হে?

—আজ্ঞে তিন টাকা।

—সে কি হে?

—আজ মাছের আমদানী কম।

মাছেরাও সুযোগ বুঝিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিয়াছে। চারিটি মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিলাম। জুতা কিনিবার জন্য একখানা দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম—সেখানা ঘাটতির পথে গঙ্গার ইলিশের পিছনে গঙ্গা জলে গিয়া পড়িল। সবটা গঙ্গা জলে পড়িলেও সান্ত্বনা ছিল—অধিকাংশই সিদ্ধিদাতা গণেশের ফাঁকে আটকাইয়া রহিল।

নিজের ও পরের গৃহিণীরা আমার বিস্ময়কর চাতুর্যে খুশী হইলেন।

পরদিন শুনিলাম তাঁদের চাকর তিনটিও পলাতক। সকলেই মেদিনীপুরের লোক—খদ্দর পরে।

তারপর হইতে এখন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে ঘাটতি দিয়া গঙ্গার ইলিশ আমদানি করিয়া পাড়ার গৃহিণীদের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছি। কিন্তু এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে? 'জুট মিল' হইতে বেতনের মধ্যে কিছু অগ্রিম লইয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষ। এখন কি করিবে?

সত্য কথা বলিব কি? না মাছ খাওয়া ছাড়িব? না, মাছ কন্‌ট্রোল হইয়াছে বলিব? কন্‌ট্রোল হইলেই যে দাম বাড়ে—একথা গৃহিণীরাও জানেন।

সত্য বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না—বিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে। মাছ খাওয়া ছাড়িলেও সকলকে তো ছাড়াইতে পারিব না, কাজেই ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। কন্‌ট্রোল? ওকথা চলিবে না—গৃহিণীরা নিয়মিত কাগজ পড়া উপলক্ষে ঘুমাইয়া থাকেন।

মিথ্যা বলাতে যে এমন ক্ষতি তাহা জানিলে কে না সত্য বলিবে!

ইলিশ মাছের সময়টা গেলেও বাঁচা যায়, কিন্তু তার অনেক আগেই যে আমার তিন মাসের অগ্রিম বেতনও যাইবে!

কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময়ে পূজা সংখ্যায় লেখার জন্য তাগিদ আসিল! লক্ষ্মীর টানাটানিতে যে সরস্বতী এমন সাহায্যার্থ আসিতে পারেন, শাস্ত্রকারেরা কি তা ভাবিতে পারিয়াছিলেন? স্থির করিলাম দেশের উপকারের জন্য ঘটনাটা লিখিয়া ফেলি না কেন? ঘাটতির কিয়দংশ যদি উঠিয়া আসে নিজের উপকারও হইতে পারে। নিজের ও পাড়ার গৃহিণীরা অবশ্যই পড়িবেন—চাই কি আমার প্রতি দয়া হইলেও হইতে পারে।

নাঃ সে ভরসা বড় নাই। একবার রসিক বলিয়া খ্যাতি রটিয়া গেলে তার দুঃখে আর কেহ বিশ্বাস করে না—না 'জুট মিল বিদ্যাকেন্দ্রে', না বাড়িতে!

পূজা সংখ্যা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, ব্যবসা না করিয়া বাঙালি গেল, আমি তো দেখি ব্যবসা করিয়াই বাঙালি গেল—এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপে একটি গল্প বলিব।

পূজার মাসখানেক আগে দেশ হইতে বন্ধু আসিয়া উপস্থিত, বলিল—ভাবছি একটা ব্যবসা করবো।

সর্বনাশ! ভয়ে ভয়ে শুধাইলাম—কি ব্যবসা?

—সেটা ঠিক করিনি!

যা ভাবিয়াছিলাম। দিন দুই পরে একদিন বন্ধু বলিল—না হে দেশের কোন আশা নেই। এই পুরাতন সত্যের নূতন কি দৃষ্টান্ত আবার তাহার চোখে পড়িল? শুধাইলাম—ব্যাপার কি?

—গিয়েছিলাম আচার্য-দেবের কাছে। ব্যবসা করবো শুনে দুই ঘুষি মেরে বললেন, যা উড়িষ্যার বনে, বাসক পাতা চালান দে, আমি বেঙ্গল কেমিক্যালকে দিয়ে কেনাবো!

শুনলে কথা? আমি চাই ক্যাপিট্যালিস্ট হতে আর উনি বললেন যা উড়িষ্যার বনে। না হে, সত্যই দেশের কোন আশা নেই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেশের প্রতীকের মত ক্লান্তদেহ খাটের উপরে এলাইয়া দিল। ভাবিলাম বোধ হয় তাহার ব্যবসার নেশা ছুটিয়াছে।

আবার দিন দুই এইভাবে গেল।

হঠাৎ একদিন বন্ধু বলিল—এবারে ঠিক হয়েছে।

—ব্যাপার কি?

—ব্যবসা!

—কি ব্যবসা?

সলজ্জ ও সগর্ব হাসি হাসিয়া বন্ধু বলিল—যে ব্যবসা বাঙালির প্রতিভার অনুকূল তাই করবো।

—খুলে বল।

—পূজোর আগে একখানা পূজো সংখ্যা কাগজ বের করবো। এই পর্যন্ত বলিয়া কাগজ কলম লইয়া হিসাব করিয়া দেখাইতে লাগিল—ধর, দশ হাজার কপি ছাপবো, আট আনা করে দাম হলে পাঁচ হাজার টাকা। এবারে খরচ কি দেখা যাক্। টেন্ পারসেন্ট কমিশন, না তার বেশি দিচ্ছি না, গেল পাঁচশো টাকা; কাগজ আড়াইশ টাকা, প্রেস আর ছবির ব্লক দিয়ে ধর আর পাঁচশো, হল গিয়ে সাড়ে বারো শ। লেখক আর খুচরো-খানা ধর সাড়ে সাত শ, হল গিয়ে দু'হাজার। কি বল? ক্লিয়ার প্রফিট হচ্ছে তিন হাজার।

এই তিন হাজারকে অবলম্বন করিয়া তাহার ভবিষ্যতের আশালতা কি ভাবে লতাইয়া উঠিবে, সেই বর্ণনা করিতে যাইতেছিল, বাধা দিলাম, বলিলাম, কিন্তু মূলধন পাচ্ছ কোথা?

—সে এক রকম করে হয়েছে, মানে ওর মধ্যে একটু 'ইয়ে' আছে বুঝলে কিনা, সবাই বাকিতে আজ করবে। প্রেস, ব্লকমেকার, কাগজ-অলা সবাই ক্রেডিটে কাজ করতে রাজি হয়েছে। অসুবিধা নেই!

তারপরে গলার স্বর খাটো করিয়া, এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বুদ্ধি খেলাইয়া বলিল—বুঝলে হে ওর মধ্যে 'ইয়ে'টা হচ্ছে যে কাজ হ'য়ে গেলে শেষে ইয়ে…মানে সরে পড়বো, কাগজ বিক্রির কমিশনও দেবো না—তার মানে ক্লিয়ার প্রফিট পাঁচ হাজার টাকা!

আমি বলিলাম, যদি তোমার কাগজ বিক্রি না হয়?

সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—ইম্‌পসিবল্। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখছেন! তা ছাড়া কোনো বাঙালি লেখককে বাদ দিইনি, প্রাচীন অর্বাচীন, তরুণ করুণ সবাই লিখছেন।

—লেখকদেরই যে অনেক টাকা দিতে হবে।

—তার মধ্যেও একটু 'ইয়ে' আছে।—'ইয়ে'র অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে তাই আর জিজ্ঞাসা করিলাম না।

বলিলাম, কিন্তু শেষে রবীন্দ্রনাথকেও 'ইয়ে' করবে, দেশপূজ্য ব্যক্তি।

সে জিভ কাটিয়া বলিল, ছিঃ ছিঃ। তাঁর সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা শুনিবার জন্য উৎসুক ভাবে রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল—অমরনাথকে তো চেনো—আরে ঐ যে ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের সঙ্গে পড়তো। মনে পড়েছে? ওর হাতের লেখা মনে আছে? অবিকল কবিগুরুর মতো। তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবো। কে চ্যালেঞ্জ করবে করুক।

এইবাবে তার 'ইয়ে'টা বুঝিলাম। বলিলাম স্বয়ং কবি যদি আপত্তি করেন?

—হ্যাঁ, উত্তরায়ণে বসে আপত্তি করলে তো চলবে না। আসুন আদালতে. এমন পঁচিশজন রেস্‌পেকটেব্‌ল সাক্ষী দাঁড় করিযে দেবো। সবাই বল্‌বে তিনি উত্তরায়ণের উত্তর দিকের ঘবটাতে বসে ওভালটিন খেতে খেতে, চা তিনি খান না জেনে নিয়েছি, লেখাটি দিলেন। বললেন—এই যে এসেছ হে, বেশ করেছ, বাঁচালে আমায বাঁচালে; কতজনে এই লেখাটি হস্তগত করবার জন্য যে হাত বাড়িয়েছিল। তারপবে বলিল, আশীবছরের বুড়ো মানুষ, হোক না মহাপুরুষ, ভুলভ্রান্তি তো হ'তে পারে। কাজেই বেনিফিট অব্‌ ডাউটে মুক্তিলাভ করবো। ভাল দেখে উকীল দেবো।

—তাতেও যে খরচ আছে।

—আঃ এতক্ষণে কি বুঝলে! তাকেও 'ইয়ে' করতে হবে।

ঠিক, 'ইয়ে' থাকিতে ভাবনা কি?

বন্ধু সগর্বে এই ব্যবসায়ের আয়োজনেব জন্য বাহির হইয়া গেল; আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কেবল নিন্দুকেরাই বলিয়া থাকে বাঙালির ব্যবসা-বুদ্ধি নাই।

২

বন্ধু সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়, আর সন্ধ্যাবেলা আসিয়া সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

একদিন বলিল, আজ গিয়েছিলাম লেখকদের কাছে; টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি কাউকে বাদ দিইনি। তরুণ, করুণ, নরম, গরম, সবাই রাজি হয়েছেন! বুঝলে না, টাকার খেলা।

বলিলাম, টাকা কি আগে দিচ্ছ নাকি?

শুনিলাম—আরে রাম! সবাইকে বলেছি, কাগজ বেরুলে কাগজ আর টাকা এক সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। একটা মজা দেখলাম যে যুগান্তকারী সব লেখক, পাঁচ-দশ টাকায় লেখা দিতে রাজি হলেন!

আর একদিন আসিয়া বলিল, আজ পাঁচশো টাকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করলাম।

—টাকা পেলে?

—কাগজ বেরুলে পাবো।

মোটের উপর তার ব্যবসার আয়োজন ভালই চলিতে লাগিল—কিন্তু যেভাবে ক্লিয়ার প্রফিট করিবে ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। কিছু কিছু ঘর হইতে বাহির করিতে হইল। কাগজের দামের মধ্যে কিছু অ্যাডভান্স করিল, প্রেসকে কিছু প্রেসকে দিতে হইল; কিন্তু তৎসত্বেও ভালভাবে 'ইয়ে' করিতে পারিলে চার হাজার টাকা ক্লিয়ার প্রফিট হইবে।

৩

অবশেষে মহালয়ার দিনে বন্ধুর পূজা সংখ্যা 'মীনকেতন' বাহির হইল —আরও অনেক পূজা সংখ্যা বাহির হইল। কিন্তু সে সকলের মধ্যে 'মীনকেতন' বরযাত্রীদলের মধ্যে বরের মতো শোভা পাইতে থাকিল। হাঁ, কাগজের মত কাগজ বটে—একেবারে রাজসূয় সংস্করণ। ছাপা, বাঁধাই,

ছবি লেখায় মিলিয়া চতুরঙ্গ বাহিনী যেন সজ্জিত। এই যুদ্ধের বাজারেও আট আনা দিয়া কিনিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

শহরের 'হকার-সম্রাট' ছট্টুলাল বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার লইয়াছে—কাগজ হু হু করিয়া কাটিতেছে। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে. দোকানে রেস্তোরাঁয় যেখানে তাকাই কেবল 'মীনকেতন' আর 'মীনকেতন'।

আমার মেসেই 'মীনকেতনের' গুদাম; সকালে .বিকালে ছট্টলালের লোক আসিয়া কাগজ লইয়া যাইতেছে; তিন দিনের মধ্যে সাবাড়! শেষে আট আনার কাগজ দেড় টাকা পৌনে দু টাকায় বিক্রি হইতে আরম্ভ করিল।

তিন দিন অন্তে বলিলাম—এবারে টাকা কড়ি পেলে?

সে বলিল—ছট্টুলাল বলেছে, একেবারে সব এক সঙ্গে দেবে।

সে নোট ও টাকার জন্য দুইটি থলি বড়বাজার হইতে কিনিয়া আনিল।

ইতিমধ্যে অনেকবার প্রেসের লোক, কাগজের দোকানের কর্মচারী, লেখকদের বন্ধুবান্ধব টাকার তাগিদ দিতে আসিয়াছে। বন্ধু সকলকে বলিয়াছে—আর একটা দিন—টাকাটা হাতে ফিরে আসুক!

কিন্তু ছট্টুলালের আর দেখা নাই। চার দিন পাঁচ দিন গেল। অবশেষে বন্ধু তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল। কোথাও ছট্টুলাল নাই। সারাদিন ঘুরিয়া সে ফিরিল—শূন্য হাত, শুষ্ক মুখ।

—কি হে ছট্টুলালের দেখা পেলে?

—নাঃ, লোকটা গেল কোথায়?

আমার মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেল—

'তবে কি লোকটা 'ইয়ে' করল নাকি?'

টাকার তাগিদে বন্ধু মেস ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইল—আর সারা দিন ছট্টুলালকে খুঁজিতে লাগিল। প্রত্যেক দিন আমার সঙ্গে দেখা হইত না।

একদিন সন্ধ্যার পরে ঘরে ফিরিয়া দেখি কে একজন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আলো জ্বালিয়া চিনিলাম, আমার বন্ধু। এই গরমে মাথায় কম্ফার্টার জড়াইয়াছে! শুধাইলাম—ব্যাপার কি?

সে বলিল—লোকের তাগিদে দিনে বের হ'তে পারি না, রাত্রেও কম্ফার্টার জড়িয়ে তবে।

—খবর কি ?

সে বলিল—ছট্টুলাল সত্যিই 'ইয়ে' করেছে।

—তার মানে ?

সে বলিল—তার মানে ক্লিয়ার প্রফিট অব্ পাঁচ হাজার টাকা; বিক্রির কমিশন-সুদ্ধ দিতে হয় নি।

বলিলাম—তোমার সর্বনাশ করে গেল ?

সে বলিল—তা করল বটে! কিন্তু ব্যবসায়ে যে লাভ হবে না বলেছিলে সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেল! দশ হাজার 'মীনকেতন'কে আট আনা দিয়ে গুণ কর, পাঁচ হাজার টাকা!

আমি বলিলাম—ব্যবসায়ে লাভ হ'ল, কেবল ব্যবসায়ী মলো!

তা হোক; বাড়ি ফিরবার ভাড়াটা হাওলাত দাও। আজই নর্থ বেঙ্গলে! আর তো টিকতে পারি না!

ভাড়া দিলাম। বন্ধু বিদায় হইয়া গেল।

যাইবার আগে বলিলাম, তাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বলিলাম—প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিলে বাঙালি ব্যবসা করতে জানে!

সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—শুধু প্রাণ দিয়ে নয় ভাই, টাকা, টাকা দিয়ে…

কীটাণুতত্ত্ব

আমি একবার স্বর্গে গিয়াছিলাম। পাঠক, তুমি হাসিতেছ! ভাবিতেছ, স্বর্গ পর্যন্ত না হোক আবগারির দোকান পর্যন্ত গিয়াছিলাম। তোমার যাহা খুশী ভাবিতে পার, আমি আজ সকালবেলা সত্য কথা বলিব—বদ্ধপরিকর হইয়া বসিয়াছি।

আমি সত্যই স্বর্গে গিয়েছিলাম—ব্যক্তিগত সুখের আশায় নয়, নিতান্ত পরার্থপরভাবে। আমি পাড়ার স্ত্রী শিক্ষায় ক্লাবের সেক্রেটারি। ক্লাবে স্ত্রী

থিঙ্কিং করিতে গিয়া দেখিলাম বাধা অনেক। কোন্ শুভকার্যে না বাধা থাকে! ক্লাবের সভ্যেরা বলিল, সেক্রেটারিকে একবার স্বর্গে ডেপুটেশনে পাঠানো হোক। তাহাতেও যদি কোন প্রতিকার না হয়, তবে আমরা স্বর্গের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিব। ফলে আমাকে স্বর্গে যাইতে হইল।

বলা বাহুল্য স্বর্গের পথ আমাদের পরিচিত নয়। (আধুনিককালের কারই বা পরিচিত!) অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া স্বর্গে গিয়া পৌঁছিলাম। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিলাম, ফ্রী থিঙ্কার ক্লাব হইতে। মূর্খ সে খবর রাখে না। পুনরায় শুধাইল, যেখান হইতে খুশী আস, সঙ্গে কিছু আনিয়াছ কি? বুঝিলাম, লোকটা ঘুস চাহে। প্লেটোর বাণীর যথার্থতা বুঝিলাম—পৃথিবী স্বর্গের অনুরূপেই সৃষ্ট বটে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দরবার-ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা গেল না। পাশে একজন ব্যক্তি অনেক খাতাপত্র লইয়া বসিয়া আছে—আদালতে জজের পাশে যেমন পেশকার থাকে, অনেকটা সেই রকম।

প্রহরী বলিয়া দিল, উনি বিধাতাপুরুষ, ইনি চিত্রগুপ্ত—তাঁহার পেশকার। তোমার যাহা কিছু পেশ করিবার থাকে এখানে কর।

আমি পৃথিবীর নানারূপ অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম এবং ফ্রী থিঙ্কিং-এ যে কত বিঘ্ন, তাহাও বলিতে ছাড়িলাম না।

বিধাতা শুধাইলেন, ওসব পরে শুনিব, আগে বল কোথা হইতে আসিতেছ?

আমি বলিলাম, আমি পৃথিবী হইতে আসিতেছি।

তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, সেটা আবার কি?

আমি বিস্মিত হইলাম। এ আবার কেমন বিধাতা যে, পৃথিবীর খোঁজ রাখেন না! ভাবিলাম, তাই বটে, বিধাতা পৃথিবীর খবর রাখেন না বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনাচার!

বিধাতা শুধাইলেন, পৃথিবী কোথায়?

জ্যোতিষশাস্ত্র পড়া ছিল, বলিলাম, সৌরমণ্ডলের মধ্যেকার একটি গ্রহ।

তিনি আবার শুধাইলেন, সৌরমণ্ডল কি?

বিধাতা বলে কি?

সম্প্রতি জীন্সের বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছি, বলিলাম, ছায়াপথ যাহার মেরুদণ্ড, সেই বিশ্বের একটি নক্ষত্র সূর্য, আর পৃথিবী তারই অন্তর্গত একটি গ্রহ।

অবিচলিত বিধাতা বলিলেন, কোন্ ছায়াপথের কথা বলিতেছ, এমন পাঁচ শ কোটি ছায়াপথ আছে।

তবে কি জীন্স সাহেব ফাঁকি দিয়া গেল? না লোকটা কিছু জানে না? অমন মূর্খটাকে সবাই মিলিয়া সভাপতি করিল কেন?

ভাবিলাম, দূর ছাই! জীন্সের ভরসা ছাড়িয়া নিজেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।

বলিলাম পৃথিবীর কথা জানেন না? আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী। পাঁচটি মহাদেশ ও সাতটি সাগরে ভূষিত। তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে এই বিজ্ঞানের যুগেও বহু দিন লাগে।

কিন্তু বিধাতার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না।

আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম, পৃথিবীতে ইতিপূর্বে অন্তত দশ বারোটি সভ্যতার উত্থান ও বিলয় হইয়াছে, এখন শ্বেতাঙ্গদের সভ্যতার যুগ। পৃথিবীতে হোমার, সিজার, শেক্সপীয়র, নেপোলিয়ান হইতে দিলীপকুমার পর্যন্ত মহামনীষীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই পৃথিবী পার্থিব ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের মতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এমন স্থানের সন্ধান যে আপনি জানেন না, তাহা বিশ্বাস হইতেছে না।

বিধাতাপুরুষ বলিলেন, সত্যই আমি পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জানি না, এমন কি ওই নামে যে একটা স্থান আছে, তাহাও জানি না।

'তবে কি বিনা বিচারে ফিরিয়া যাইব?'—আমার মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল।

ইহাতে বিধাতাপুরুষের যেন দয়া হইল। তিনি চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন, একবার নথিপত্র ঘাঁটিয়া দেখ দেখি, কোথাও এই পৃথিবীর উল্লেখ পাও কি না!

আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, চিত্রগুপ্ত নথিপত্র ঘাঁটিতে লাগিল।

প্রায় এক বছর পরে দরবার-ঘরে পুনরায় আমার ডাক পড়িল। দেখিলাম, চিত্রগুপ্ত বিধাতাকে বলিতেছে, প্রভু, স্বর্গের দপ্তরখানা যে কত বড়, তাহা আপনার জানা আছে। আমি পাঁচ শ সহকারী লইয়া এই এক বছর তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও পৃথিবীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। আমার বিশ্বাস, লোকটা আমাদের ঠকাইতে আসিয়াছে।

বিধাতা বলিলেন, কিন্তু আসিল কোথা হইতে, তাহারও তো একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।

তখন আমি নিজের কথা প্রমাণ করিবার জন্ত ভূতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন নানারূপ উল্লেখ করিতে লাগিলাম।

অবশেষে বিধাতার যেন কি একটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, ঠিক ঠিক, মনে পড়িয়াছে—আমার শিক্ষানবিসি আমলে অনেক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহার কোনটা মনঃপুত হয় নাই বলিয়া অর্ধসমাপ্তভাবে রাখিয়া দিতাম। লোকটা হয়তো তাহারই কোনটার কথা বলিতেছে। চিত্রগুপ্ত, একবার বাতিল জগতের নথিগুলো দেখ তো।

আবার এক বছর গেল। তাহার পরে চিত্রগুপ্ত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, প্রভু, বাতিল জগতের নথিও এত যে, দেখিতে এক বছর লাগিল। এক-খানা অতি জীর্ণ নথির পাদটীকায় যেন সৌরমণ্ডলের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবী খুব সম্ভব তাহারই অন্তর্গত কোন গ্রহ।

বিধাতা বলিলেন, ঠিক হইয়াছে। সেই বাতিল মৃৎকণিকায় কালক্রমে জলহাওয়া লাগিয়া এক প্রকার কীটাণুর উৎপত্তি হইয়াছে, আগন্তুক তাহাকেই মানুষ বলিতেছে।

আমরা কীটাণু! জলহাওয়ায় মৃৎপিণ্ড পচিয়া আমাদের উদ্ভব! আমরা বাতিল জগতের জীব!—বিস্ময়ে, ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে মুখ দিয়া পরমপার্থিব একটিমাত্র শব্দ বাহির হইয়া আসিল, শালা।

বিধাতা বলিলেন, ওহে বাপু, কোন্ বাতিল মৃৎকণিকায় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কোন্ কীটাণুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ আমার নাই। বিশেষ, কীটাণুর আবার আইনকানুন, অত্যাচার

উৎপীড়ন, স্ত্রী থিঙ্কিং কি? বেশি দিন তোমাদের এইসব সহ্য করতে হইবে না, আমার বর্ণনা অনুসারে পাঁচ দিন হইল তোমাদের উদ্ভব হইয়াছে, আর দিন-চারপাঁচের মধ্যেই বিলয় হইবে। তোমাদের যাহা খুশী কর। ইতিমধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মূল্যবান্ সময় আমার নষ্ট হইয়াছে।

আমি তখন স্ত্রী থিঙ্কার ক্লাবের সেক্রেটারির যোগ্য গম্ভীরতা ও মর্যাদা সহকারে বলিতে লাগিলাম, বিধাতাপুরুষ, এ তোমার অবিচার। আমি ফিরিয়া গিয়া তোমার নামে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিব। আমরা কীটাণু নই, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে—

এইখানে বিধাতা বাধা দিয়া শুধাইলেন যে, দর্শনশাস্ত্র কাহাকে বলে?

আমি বলিলাম, যে শাস্ত্রে ভগবান ও পরকালের তত্ত্ব আছে।

কীটাণুর আবার ভগবান! কীটাণুর আবার পরকাল!

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে যাহারা অমর—

'অমর' অর্থ কি?

যাঁহাদের খ্যাতি চিরকাল থাকিবে।

তোমাদের চিরকাল মানে—আমার দিন-চারপাঁচ।

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, সত্য বলিতেছি যে—

বিধাতা বাধা দিয়া বলিলেন, তার আগে 'সত্য' কাহাকে বলে, বল।

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে সত্য বলে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিধাতা ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না। কীটাণু তোমরা, তাহা জানিবে কি প্রকারে?

আবার সেই অবজ্ঞার হাসি।

আমি ক্রোধে বলিলাম, এই কি ন্যায় হইল?

বিধাতা শুধাইলেন, 'ন্যায়' কাহাকে বলে?

আমি বলিলাম, নিজের প্রতি যে ভাব পোষণ করি, পরের প্রতি তাহার আরোপকে ন্যায় বলে।

কীটাণুর আবার আপন পর!

আবার সেই অবজ্ঞার হাসি।

আমাকে বিব্রত দেখিয়া বিধাতা বলিলেন, দেখ বাপু, তোমার ঘরের কোণে যদি একখণ্ড সন্দেশ বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকে, আর কালক্রমে যদি তাহাতে কীটাণুর উদ্ভব হয়, তাহাদের সুখ-দুঃখ ন্যায়-অন্যায় লইয়া কি তুমি মাথা ঘামাও? না, তাহারা তোমার কাছে বিচার চাহিতে আসে? না, আসিলেই তুমি বিচার করিতে বসিয়া যাও?

এই মৃৎকণিকা, যাহাকে তুমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করিলে, তাহা ঐরূপ একটা বাতিল মৃৎকণিকা। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম আমলে হাত পাকাইবার জন্য ঐরূপ অনেক মাটি লইয়া আমি সৃষ্টির খসড়া করিতাম আর সন্তুষ্ট না হইলে ফেলিয়া রাখিতাম। সেইরূপ এক মৃৎপিণ্ড জলহাওয়ায় পচিয়া কীটাণুর সৃষ্টি হইয়াছে, তোমরা সেই কীটাণু। আমি ওখানে সৃষ্টির ইচ্ছা করি নাই, কাজেই আমার বিধান ওখানে নাই। ও সৃষ্টি জলহাওয়ার ফলে হইয়াছে, কাজেই প্রকৃতির নিয়ম ওখানে চলিতেছে। আবার প্রকৃতির নিয়মেই দুই চার দিনেই সব নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা মর, বাঁচ, চিন্তা কর, কাব্য লেখ, বক্তৃতা দাও, ইতিহাস সৃষ্টি কর, কম্‌রেড হও, ডিক্টেটার হও, যা খুশী কর। নিজেদের সুখ-দুঃখকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবিও না, যাহা লইয়া স্বর্গে আসিয়া দরবার করিতে পার। তোমরা এমনই তুচ্ছ পদার্থ যে. তোমাদের উল্লেখ পর্যন্ত স্বর্গের নথিপত্রে নাই।

ইহা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন, প্রভু, জীবটার স্পর্ধা অসীম। উহাদের মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিন।

বিধাতা বলিলেন, তাহা হইলেও উহাদের অস্তিত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। বিশেষ, আমার বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিতে এমন বিচিত্রতর জীব যে ছিল, ইহা জানাতেই আমার লাভ।

আমি ইহাদের কাছে কোন আশা নাই দেখিয়া ক্রী থিঙ্কার ক্লাবের সেক্রেটারির উপযুক্ত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম, আমার আর কোন গৌরব যদি না থাকে, তবে অন্তত এই গৌরব আছে যে, আমরা নগণ্য কীটাণু হইয়াও এই বিরাট বিশ্ব-বিধানের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে সাহস করিয়াছি।

আবার সেই হাসি। কিন্তু আমি যেন কল্পনার কর্ণে ক্রী থিঙ্কার ক্লাবের সভ্যদের হাততালি ও 'হিয়ার' 'হিয়ার' শুনিতে লাগিলাম।

আরোগ্য-স্নান

সে আমাদের সঙ্গে একই ইস্কুলের একই ক্লাসে পড়িত—তার নাম ছিল রামতনু। কিন্তু ছেলেরা নামটির পূর্বে ছোট একটি উপসর্গ জুড়িয়া দেওয়াতে তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—আরামতনু। এই নূতন নামকরণে কোন্ পক্ষের যে দোষ তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিবার পূর্বে ইহার ইতিহাস-টুকু শুনিলে বিচারে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ইস্কুলটিতে এত বিভিন্ন-প্রকারের ছেলে আছে যে হঠাৎ ইহার উপমা মেলে না। এই অসংখ্য-প্রকার বিভিন্নতার মধ্যেও রামতনু স্বীয় ব্যক্তিত্বটিকে খর্ব হইতে দেয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় যখন সকলে গায়ের কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চামড়াখানি পর্যন্ত খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন সে তার ঘাড়ের-কাছে-তেলে-মলিন হাতের-কাছে-সুতা-বাহির-করা প্রাচীন আলপাকার কোটটি গায়ে দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া ইংরেজী গ্রামার পড়িত! যদি জিজ্ঞাসা কর এই ব্যবহারের অর্থ কি—তবে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মতো সে পেন্সিলটি নাড়িয়া উত্তর দিবে যে বাহিরের তাপের সহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা রক্ষা না করিয়া চলিলে উৎকট ব্যাধি-বিশেষ জন্মাইবার আশঙ্কা আছে।

তাহার শুইবার ঘরে গেলে দেখা যায় ছোট বড় মাঝারি লাল নীল কালো স্বদেশী বিদেশী নানা রকমের ঔষধের শিশি সাজানো, সেটি একটি ছোটোখাটো ঔষধালয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে কেহ তাহাকে দেখে নাই—কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যখন পরিমাণে অল্প এবং স্বাদে বিকৃত নয় তখন উহা ঔষধের মধ্যে গণ্য হইতেই পারে না। যে হেতু যে ঔষধ পরিমাণে যত বেশি এবং আস্বাদনে যত বিকৃত, রোগের পক্ষে তাহা ততই অধিক

বস্ত্র-স্বরূপ। রাত্রিবেলা তাহাকে স্মেলিং সল্টের শিশিটি লইয়া বারেবারে ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শুইবার সময় তিন চারিটি ঔষধের শিশি তাহাদের উৎকট গন্ধ লইয়া তাহার নিদ্রা পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কারণে এবং অকারণে ঔষধ খাইতে কেহ তাহার এত টুকু আপত্তি কখনো দেখে নাই। যখন সে প্রথমে ইস্কুলে আসিয়াছিল তখন তাহার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে একরাশি ছোট বড় মাদুলি ছিল; বিশেষতঃ কণ্ঠেরটিকে ছোটো-খাটো একটি ঢোলক বলিলেও বেমানান্ হয় না। ইস্কুলের ছেলেদের বচনকে সে বেশি ভয় করিত না—কিন্তু পাছে তাহারা এই অক্ষয় কবচগুলি অপহরণ করে এই ভয়ে সমস্ত মাদুলিগুলি বস্ত্রান্তরালে তাহার কোমর-দেশে একটি মেখলার সৃষ্টি করিয়াছিল। শীতের শেষে দক্ষিণের বাতাস দিতেই যেমন পৃথিবী রং- বেরঙের ফুলে ভরিয়া যায়—তেমনি যেমন একটু শীতের হাওয়া দিয়াছে অমনি রামতনুর বাক্সের ভিতর হইতে লাল নীল ফ্লানেলের টুক্‌রা বাহির হইয়া তাহার শরীরের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসে। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে যখন আর সকলে বাহিরে গল্প গুজব গানবাজ্‌না করিতেছে, তখন রামতনু মাথায় কাপড় জড়াইয়া খড়ম পায়ে দিয়া পড়িতে বসে। জান্‌লাটা ভালো করিয়া ভেজাইয়া দেয়—আর মশা মারিতে গিয়া গালের উপরে সজোরে চপেটাঘাত করে। মোট কথা, এ জগতে যত ঠাণ্ডা মশা মাছি ধুলা আবর্জনা, সকলেরই যেন একমাত্র লক্ষ্য দীন-হীন রামতনু!

২

এত সাবধান থাকিতেও রামতনুর আজ দুই দিন হইল জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দিনের মধ্যে চারবার আসে। খাটের উপর অগাধ লেপের তলায় রামতনু—এক পাশে তাহার মুখখানা দেখা যায় ফ্লানেল ও কাপড়-জড়ানো। অন্ধকার রাত্রে যেমন স্টেশনের দুই পাশে তাকাইলে সিগ্‌নালের লাল নীল আলো দেখা যায়—তাহার খাটের চারিপাশে সেই রকম লাল নীল নানা রকমের ঔষধের শিশি রোগকে বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ণিমা রাত্রি। ধরণী-গগণের কানায় কানায় জ্যোৎস্নার আলো ভরিয়া উঠিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। মাঠের মধ্যে চাঁদের আলো স্বর্গের আভাসের মতো কাঁপিয়া উঠিতেছে। দূরে দিক্‌চক্রবালে বনরেখা নিবিড়-রহস্যময়। অদূরে নদীর জলে আলো পড়িয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাতাসে গাছের পাতা মৃদুশব্দে কাঁপিতেছে, যেন ঘুমন্ত পৃথিবী স্বপ্নের ঘোরে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। শেফালির গন্ধ, বাঁশীর সুর, নদীর কলতান আকাশ জুড়িয়া ভাসিতেছে!

হঠাৎ বাতাসে রামতনুর ঘরের জান্‌লাটা একটু খুলিয়া গেল। তাহা বন্ধ করিবার জন্য রামতনু অতিকষ্টে উঠিয়া জান্‌লার ধারে গেল। সহসা বাহিরে তাহার দৃষ্টি পড়িল—এক মুহূর্তে তাহার মনে হইল যেন সে মুক্তি-সাগরের তীরে আসিয়াছে। এ কী আনন্দ! ঘরের ভিতরটিতে শোক-দুঃখ-ব্যথা-রোগের যন্ত্রণা; আর বাহিরে ওই চাঁদের আলোয় স্বর্গের কি স্বপ্ন মাখানো আছে। নদীর জলে কি অমৃত, তার কলতানে কি আহ্বান, বাতাসে কি পরশ, আহা আকাশে কি পুলক! রামতনু অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল দূরে কে একজন গান করিতেছে। একবার ভাবিল—ও মানুষ, না প্রেত? হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই গানের ভাষা বুঝিল—গানের একটি পদ একটি ছেঁড়া ফুলের মত ভাসিয়া আসিল—"তারা চাঁদের চোখে চমক হেনে যায় চলে।" রামতনু একবার ভাবিল যাই নামিয়া ওই শান্তি-স্বর্গের নন্দন-কাননে; ওখানে রোগের জ্বালা জুড়াইবার অমৃত আছে। কিন্তু জান্‌লার লোহার গরাদে তাহাকে বাধা দিল। সহসা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য কঠিন বাস্তবের স্পর্শে চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ জান্‌লার কাছে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রামতনু নিজেই অবাক হইল; তাড়াতাড়ি জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিয়া একবার ঘড়ি দেখিল; তারপর এক মাত্রা ঔষধ খাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকাল-বেলা রামতনু জাগিয়া ভাবিতে লাগিল কাল রাত্রির ঘটনা সত্য না স্বপ্ন! যদি স্বপ্ন হয় তবে কি ভীষণ স্বপ্ন; নিশিভূতে পাওয়া একেই বলে! আর সত্য হইলে ইহার অপেক্ষা হাসির কাণ্ড আর হয় না। মাঝে মাঝে নিজের দুর্বলতা স্মরণ করিয়া রামতনু হাসিতে লাগিল।

এই-রকম ভাবনা-চিন্তার দোলায় দোলায় তার সকালটি কাটিয়া গেল। দুপুর-বেলা সমস্ত প্রান্তরখানি তপ্ত রৌদ্রে স্নাত; মনে হইতেছে যেন কোন্ স্বর্গীয় এক মধুচক্রের মধু ঝরিয়া পড়িতেছে—সমস্ত ধরণী তাই মধুর মনে হইতেছে। রামতনু জান্‌লার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—উদাস প্রান্তর আকাশের শেষ পর্যন্ত শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, রৌদ্রের রং কাঁচা সোনার মত; আকাশের রং গভীর নীল;—বনরাজি রৌদ্রতাপে গভীর শ্যামবর্ণের মতো দেখাইতেছে,—নূতন ধানক্ষেতের সবুজটুকুর তুলনা নাই। মাঠের মধ্যে গরু চরিতেছে, রাখাল বটের ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে, অদূরে যেখানে বর্ষার জলে ক্ষয় হইয়া কাঁকর বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেই রক্তবর্ণ অনুর্বর ভূখণ্ডে রৌদ্র-মরীচিকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া কি অসীম রহস্য আনয়ন করিয়াছে! সেই রৌদ্রকরুণ শরৎ-মধ্যাহ্নটির ছবি, দূরের শ্যামায়মান বেণুবনের ব্যাকুল কম্পন যেন রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট অতি-সাবধানী ওই রামতনুকেই ডাকিতেছে। রামতনু মুগ্ধনয়নে শয্যার উপর বসিয়া বসিয়া শরতের খেলা দেখিতে লাগিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া পড়িয়া সন্ধ্যা হইয়া অবশেষে রাত্রি আসিল। আঃ! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে রামতনুর ঘরের জান্‌লা বন্ধ। সে ভাবিতে লাগিল জানলা খুলিয়া দিবে কি না। কিন্তু পাছে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে জান্‌লা খুলিয়া দিল না। কত কি ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রে জ্বরের ঘোরে রামতনু স্বপ্ন দেখিল। যেন সে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ। ছোট্ট ঘর। আলো বাতাস এত কম যেন তাহা কোন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাজ্য হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ক্রমে মনে হইতে লাগিল যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে যখন বাতাসের জন্য চীৎকার করিতেছে তখন রাশি রাশি ফ্লানেল-কোট, কম্ফর্টার, ঔষধের শিশি, ডাক্তারের বিল ঝরিয়া পড়িতেছে। জলের জন্য ছাতি ফাটিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন এক শিশি কুইনাইন-মিক্শ্চার—উঃ কি তিতো! আলো যখন চাহিল তখন অন্ধকার—ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার, অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার, দিনের তালতলীর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, পোকার গর্তের অন্ধকার, বটের ছায়ার অন্ধকার পড়িতে লাগিল। দূরে একটি আলো জ্যোৎস্না-রাত্রির তারার মতো ক্ষীণ,

ক্ষীণ দীপশিখার মতো অনুজ্জ্বল। ক্রমে তাহা বড় হইতে লাগিল। অবশেষে রামতনুর মনে হইল সে একটি জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকাইয়া দেখিতে পাইল বাহিরে জ্যোৎস্নার আলোয় কত লোক খেলা করিয়া গান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি আনন্দ! কি মুক্তি! এমন সময় মনে হইল ঔষধের শিশিগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাস্তা যেমন রোলারের ভারে সমান হইয়া যায়, তাহাকেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা। সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়াই রামতনুর মনে হইল সে ফিবার-মিক্‌শ্চারের মস্ত বড় একটা নীল শিশির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে. সেই ঔষধের তলানি সবুজ, থিতানি সোনালি, আগুনের ফুল্‌কির মতন তার বুদ্বুদ! রামতনু আরামে তনু ঢালিয়া সেই ঔষধসমুদ্রে অবগাহন করিতে লাগিল। তার জ্বরের জ্বালা, অসুখের সন্তাপ যেন অমৃ স্নানে জুড়াইয়া গেল। রামতনু আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! যেমন অসুখ, তেম্‌নি ঔষধ, তেম্‌নি তার বোতল—সব বিরাট্! ধন্বন্তরির ঔষধ-সমুদ্রের নীল বোতলে তার আজ আরোগ্যস্নান হইতেছে! তার এক সহপাঠী সানন্দে রামতনুর পিঠে বিরাশি সিক্কার ওজনে এক চড় বসাইয়া বলিল—আরামতনু, আজ ছিমে যে!

রামতনু জাগিয়া দেখে সে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া—জ্যোৎস্না-প্লাবনে তার সর্বাঙ্গ পরিস্নাত হইয়া যাইতেছে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো কোট কম্ফর্টার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া একা সুদূর নির্জন মাঠের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ সারা রাত্রির জাগরণে লাল রঙের হইয়া আকাশের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লালের বর্ণনা করা যায় না। জ্যোৎস্নাতে তারাগুলি দেখা যাইতেছে না—যেন তাহারা অরুণের রথের সাড়া পাইয়া এক ঝাঁক পাখীর মতো উড়িয়া গিয়াছে। কেবল শুক-তারাটি অতি অস্পষ্টভাবে আসন্ন-বিধবা রমণীর ভালে অনুজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুর মতো জ্বলিতেছে। ভোরের শীতল উত্তুরে হাওয়াটি নদীর উপর দিয়া, ধান-ক্ষেতের উপর দিয়া, শিশিরের স্নিগ্ধ স্পর্শ বহিয়া, শিউলির গন্ধ মাখিয়া বহিয়া আসিতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির পড়িয়া কেমন সুন্দর ও স্নিগ্ধ

দেখাইতেছে। রামতনু ভোর পর্যন্ত পাগলের মতো মাঠে মাঠে ধানক্ষেতে কাশবনে নদীর তীরে শিউলিতলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ সে পাইয়াছে।

দুপুর-বেলায় ডাক্তার রামতনুকে দেখিতে আসিল। তাহার আর সে ভাব নাই—সে অনাবৃত অঙ্গে বসিয়া আছে, মুখে তাহার মুক্তির আভাস। ডাক্তার হাত দেখিয়া বলিল জ্বর নাই, অসুখ সারিয়া গিয়াছে। অন্য সকলে ডাক্তারের কাছে গত রাত্রির ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহাই অসুখ সারিবার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিল। কিন্তু বিজ্ঞ ডাক্তার তাহা কানেই তুলিল না—কেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—"বটে বটে। যে ওষুধ দিয়েছিলাম, অসুখ না সেরে যায় কোথায়।"

দ্বিতীয় পক্ষ

দেখ, ওঠ, ওঠ—নূতন বধূ নীলিমা শেষরাত্রে স্বামীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল। অন্নদাপ্রসাদ ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল—কি হ'য়েছে নীলি?

নীলিমা বলিল—আমার কেমন ভয় করছে।

অন্নদা সান্ত্বনার ও জিজ্ঞাসার স্বর মিশাইয়া বলিল—ভয় কিসের?

—বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কি বল তো?

বধূ বলিতে লাগিল—যেন কে আমার শিহরের কাছে বসে ছিল; ঘুম ভেঙে গেল; আবার ঘুমালাম—আবার তাকে দেখলাম, লালশাড়ী-পরা, গায়ে ফুলের গহনা, যেন সে-ও এক নূতন বউ।

অন্নদা পরিহাস করিয়া বলিল—ওঃ তাহলে নিজেকেই দেখেছ?

বধূ বলিল—না, তার মুখে যেন কত দুঃখের চিহ্ন, এমন বিষণ্ণ চোখ আমি দেখিনি।

এক মুহূর্তের জন্ম অন্নদাপ্রসাদের মুখ কালো হইয়া গেল, কিন্তু প্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাহা নীলিমার চোখে পড়িল না। স্বামী বলিল—কিছু ভয় নাই লক্ষীটি, আমি আছি, ঘুমোও। ভীত নীলিমা স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় লইয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের বেলায় এ-বিষয়ে আর কেহ কোন কথা তুলিল না; বাড়িতে নূতন গোটা দুই চাকর ছাড়া তৃতীয় আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকাতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে কাহাকেও বলিবার সুযোগ নীলিমার ছিল না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার নীলিমা জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল—ওগো শুন্‌ছ, ওঠ, ওঠ।

—আবার কি হ'ল? অন্নদাপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল।

—সেই স্বপ্ন আবার দেখেছি।

—কি বল দেখি। অন্নদাপ্রসাদ আগের রাতের ঘটনা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বধূ বলিল লাল শাড়ী আর ফুলের গহনা-পরা কে একজন যেন আমার শিয়রের কাছে—

নীলিমার মুখের অর্ধসমাপ্ত বাক্যকে পূরণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ বলিল—চুপ ক'রে বসে ছিল। এই তো—তা থাকুক না।

নীলিমা বলিল—না, আজ সে কথা ব'লেছে।

—কথা? অন্নদা চমকিয়া উঠিল।—কি কথা?

—সে বলছিল আমাকে ঠেলা মেরে, তোর জায়গায় যা, এখানে কেন?

অন্নদাপ্রসাদ এবারে সত্যই চমকিয়া উঠিল। এমন সময়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পরের কাছে সরিয়া আসিল; আর সেই শীতের রাত্রেও দু-জনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল—অন্ধকার বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না।

স্বামী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—ও কিছু না। অমন হ'য়ে থাকে।

—কেন হয় বল না?

অন্নদা আর কিছু বলিবার পাইল না, তাই বলিল—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব। সে শুইয়া পড়িল—বধূ তাহার কোল ঘেঁসিয়া শুইল।

প্রবীণ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে নীলিমা অন্নদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। প্রথম পক্ষের বধূ শ্রীলেখা তিন বছর ঘর করিবার পরে কয়েক মাস আগে মারা গিয়াছে। অন্নদার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না করিবারও কোন কারণ ছিল না; তাহার বয়েস সবে সাতাশ; সন্তানাদি নাই, প্রচুর টাকা কড়ি আছে। শেষে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে নীলিমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ অনুমান করিতে পারে নাই যে অন্নদার দ্বিতীয় পক্ষ; কেমন করিয়া পারিবে! সাতাশ বছর বয়স বিবাহের পক্ষে বেশি নয়—আজকালকার বিচারে কিছু কমও হইতে পারে। কথা যখন উঠিল না, অন্নদাও চাপিয়া গেল; শুধু তাই নয়, পাছে দ্বিতীয় পক্ষ জানিয়া নীলিমা ব্যথা পায়, তাই সে বিবাহের পরে দেশে না ফিরিয়া পশ্চিমের এক শহরে চলিয়া গেল; আর শ্রীলেখার চিহ্ন যতদূর সম্ভব মুছিয়া ফেলিল; চিঠিপত্রগুলি ছিঁড়িল; ফোটোগুলি পুড়াইল; তাহার ব্যবহৃত শাড়ী জামা গরিবদের বিলাইয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল কখন হয়ত কথায় কথায় নীলিমাকে শ্রীলেখার কথা বলিবে—কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহা আর সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

সেদিন দুপুরবেলা অন্নদা রোদে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল আর নীলিমা প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড় চোপড় রোদে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। নীলিমা কতকগুলি শাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিতে করিতে বলিল—দেখ, অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু বিয়ের আগেই এতগুলো শাড়ী কিনতে গেলে কেন?

অন্নদা হাসিয়া বলিল—কবে যুদ্ধ বেধে যায়—তখন তো আবার চড়া দামে কিনতে হ'ত!

—কিন্তু ব্লাউজ যে এতগুলো করিয়ে রেখেছে বোকার মতো যদি আমার গায়ে ছোট হ'ত, কি বড় হ'ত!

অন্নদা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ছোটও হয়নি, বড়ও হয়নি, ঠিকই হ'য়েছে তো!

—তা হ'য়েছে বটে! নীলিমা ভাজ খুলিয়া একে একে বস্ত্রাদি রোদে দিতে লাগিল!

না হইবারই কথা। শ্রীলেখা নীলিমা দুইজনে প্রায় এক মাপেরই। এ সমস্তই শ্রীলেখার; তবে তাহাতে ব্যবহারের কোন চিহ্ন নাই বলিয়া, আর দামও অনেক, অন্নদা সেগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

নীলিমা কৌতূহল ও আবদারের সুরে শুধাইল—আচ্ছা কি ক'রে তুমি আমার ঠিক মাপটি জানলে?

অন্নদা বলিয়া ফেলিল—তা জান না? বিয়ের আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ-দেখা সাপের মতো দু-জনকেই চমকাইয়া দিল; স্বামী অস্বস্তি বোধ করিল, বধূর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—আচ্ছা এই যে আমি রাতের পর রাত ঐ একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, এর কোন প্রতিকার করবে না?

অন্নদা বলিল—স্বপ্নের আর প্রতিকার কি? আর তোমার কিছু ক্ষতিও তো হচ্ছে না।

নীলিমা বলিল—আমার কি মনে হয় জান—অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল—মনে হয় এ বাড়িতে কোন প্রেত বাস করে; সে চায় না যে আমি এখানে থাকি, তাই ক্রমাগত বলে, এখানে কেন? তোর জায়গায় যা। তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আচ্ছা বাসাটা বদলালে হয় না।

অন্নদা কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে।

২

অবস্থা ক্রমে অধিকতর সঙ্কটজনক হইতে লাগিল। নীলিমার ঘুমাইবার উপায় আর রহিল না। একটু ঘুম আসিয়াছে কি, অমনি সে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—ওগো, শুনছ, আবার সেই মূর্তি। অন্নদা কত-ক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়ে—নীলিমা স্থির করে, সে আর ঘুমাইবে না, বাকী রাতটুকু জাগিয়া কাটাইবে;—কিন্তু ক্রমে জাগরণও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্জন ঘর, নিঃসঙ্গ প্রহর; স্তিমিত দীপের আলোয় দেয়ালে কিম্ভুত

সব ছায়া পড়ে ; চোখ বন্ধ করিলে সেই শাড়ী-পরা মেয়েটাকে মনে পড়িয়া যায় ; চোখ খুলিয়া থাকিলে দেয়ালের চটা-ওঠা রেখাগুলা ক্রমে রক্তে মাংসে পুরিয়া সজীব হইয়া উঠিতে থাকে।

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ওটা তো ছায়া। কিন্তু নড়িতেছে কেন ? না, নড়িবে কেন ? কি আশ্চর্য, এমন ভাবে দেয়ালের চটা উঠিয়াছে, ঠিক একটা মেয়ে-মানুষের চেহারা সৃষ্টি করিয়াছে। শাড়ীটা যেন লাল।

নড়িতেছে নাকি। স্বপ্নে-দেখা সেই মানুষ।

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরে—অন্নদাপ্রসাদ লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি, আবার স্বপ্ন দেখলে নাকি ?

নীলিমা বলে—আমি তো ঘুমোইনি।

—তবে ?

—সে যেন এসেছিল।

—কে ?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে বলে, পাছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা, সে শুনতে পায়—স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটা।

এমন সময়ে হয়ত প্রদীপটা নিবিয়া যায়, দুইজনে অন্ধকারে বসিয়া ঘামিতে থাকে। নীলিমা বলে—চল বাসা বদলাই। অন্নদা শুষ্ক কণ্ঠে বলে —আচ্ছা।

৩

অবশেষে বাসা বদলানোই স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া মনের মতো একটা বাসা মিলিল, আগামী কাল সেখানে উঠিয়া যাওয়া হইবে। নীলিমার মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল। সারা দিন সে খাটিয়া জিনিষ পত্র গুছাইল, বাঁধা-ছাঁদা করিল, কাল সকাল বেলাতেই যাহাতে বাসা ছাড়িতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিল—এমন কি অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন শয্যার কথা মনে পড়িয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, সে-ভাবটাও কমিয়া গেল ; বিছানার

শুইতেই তাহার ঘুম আসিল। অন্নদা তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

আজ শেষ রাত্রি। নীলিমা স্বপ্ন দেখিল, সেই মেয়েটি লাল শাড়ীতে ফুলের গহনায় সাজিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

নীলিমা বলিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

সেই মেয়েটি বলিল—বাসা ছাড়িলেই কি আমাকে ছাড়িতে পারিবে?

—নয় কেন?

—আমার জায়গা যে অধিকার করিয়া বসিয়াছ।

নীলিমা শুধাইল—তোমার জায়গা। সে আবার কি?

মেয়েটি বলিল—যদি জানতে চাও, ওঠ।

স্বপ্ন-চালিত নীলিমা উঠিল।

সেই মেয়েটি বলিল—বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে চল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো বাহিরে আসিল, শুধাইল—কোথায় যাইতে হইবে?

—আমার পিছনে পিছনে এসো।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নীলিমা চলিল। সে ঘর ত্যাগ করিল; আর একটা ঘরও ছাড়িয়া আসিল; তারপরের ঘরে মেয়েটি থামিল—নীলিমা থামিল।

মেয়েটি বলিল—ওই টেবিলের ছোট দেরাজে একটা চাবি আছে, খোলো।

নীলিমা দেরাজ খুলিয়া চাবি লইল। এখন এই ঘরটাতে তাহাদের তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি থাকিত।

মেয়েটি বলিল—ঐ হাতবাক্সটা খোলো।

নীলিমা বলিল—ও হাতবাক্স আমার স্বামীর, আমি কখনও খুলি না।

মেয়েটি বলিল—যদি সব জানতে চাও তবে খোল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো খুলিয়া ফেলিল।

—ঐ ডালাখানা তোল।

নীলিমা তাহাই করিল।

—এইবারে ঐ কাগজগুলা সরাও।

নীলিমা সরাইল।

ঐ দেখ একখানা বড় খাম। ওখানা বাহির করিয়া লও।

নীলিমা বাহির করিল।

—এবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখ।

নীলিমা সেইরূপ করিল।

তখন মেয়েটি বলিল—এইবারে দেখ খামখানার ভিতরে কি আছে।

নীলিমা একখানা পুরু কাগজ বাহির করিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিল—ও খানাতে কি আছে দেখ।

এইখানে নীলিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল তাহার হাতে এক খানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির ফোটোগ্রাফ। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্ছিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।।

সেই শব্দে অন্নদাপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল; দেখিল পাশে নীলিমা নাই; নানারূপ শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। কোথায় গেল সে? নাম ধরিয়া ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না। তখন মনে হইল—এই মাত্র একটা শব্দ শুনিল কিসের শব্দ? সে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল বাক্স রাখিবার ঘরের মেঝেতে নীলিমা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্নদাপ্রসাদের মুখে কথা বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। সে জল আনিয়া তাহার মাথায় দিল পাখা লইয়া বাতাস করিল, নাম ধরিয়া ডাকিল; অনেক চেষ্টার পরে নীলিমার মূর্ছা ভাঙিল, জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধাইল—তুমি কে?

অন্নদা বলিল—আমি অন্নদা।

নীলিমা শুধু বলিল—ও।

অন্নদা শুধাইল—তুমি এখানে এলে কি করে?

সে বলিল—সেই মেয়েটি নিয়ে এসেছে।

—কোন্ মেয়েটি?

—সেই যাকে স্বপ্নে দেখেছি।

অন্নদা বলিল—ও সব বাজে! তুমি স্বপ্ন দেখে এখানে চলে এসেছ!

নীলিমা দৃঢ়ভাবে বলিল—স্বপ্ন নয়! তারপরে নিজকেই যেন প্রশ্ন করিল—ছবিখানা কোথায়?

অন্নদা বলিল—ছবি! কিসের ছবি?

নীলিমা বলিল—সেই মেয়েটির—সেই এক মুখ, এক সাজ!

সে এদিক-ওদিক তাকাইতে দেখিতে পাইল অদূরে ছবিখানা পড়িয়া আছে, মূর্ছিত হইয়া পড়িবার সময়ে হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া গিয়াছিল। সে ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই মেয়েটিকেই আমি প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। আজ সে আমাকে বলেছিল, এ বাসা ছাড়লেই আমাকে ছাড়তে পারবে না। তখন সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তোমার হাতবাক্স থেকে এই ছবি বা'র করতে বাধ্য করল। তারপরে বলল—এবারে দেখ। তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি যাকে এতদিন স্বপ্নে দেখেছি—এ ছবি তারই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ছবি তোমার বাক্সে এল কি ক'রে?

অন্নদা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিছানায় চল, সব বলব।

বিছানায় গিয়ে অন্নদাপ্রসাদ সব স্বীকার করিল। প্রথম পক্ষের পত্নীর কথা শুনিয়া নীলিমা দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ সে স্মৃতি যাহাতে নীলিমাকে ব্যথিত না করে সে জন্য কত সঙ্কোচে অন্নদা সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে জানিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি বরঞ্চ বাড়িল।

অন্নদা বলিল—আমি শ্রীলেখার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম, কেবল ঐ ফুলসজ্জার সাজে তোলা ফোটোগ্রাফখানা নষ্ট করিনি। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে তুমি তার খোঁজ জানলে কি ক'রে?

নীলিমা বলে,—সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কি জানতাম ওটা ওখানে আছে?

অন্নদা বলে—সে কথা ঠিক। শুনেছি সমনাম-বুলিজমে এমন হয়।

* * *

পরদিন তাহারা সে বাসা ছাড়িয়া গেল। তাহাদের পরবর্তী কালের ইতিহাস আর জানি না।

উল্টা-গাড়ি

পশ্চিমের ছোট একটি স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছি। টাইম টেব্‌ল অনুসারে গাড়ি আসিবার সময় হইয়াছে; কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজার, এখন সময় আসে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গাড়ি আর আসে না। স্টেশনের বাবুদের ইতিমধ্যে অনেকবার পুছিয়াছি, তাহারা গাড়ির খোঁজ জানে না। একজন বলিল, সময় হলেই আসবে; আর একজন বলিল, আসলেই সময় হবে। মোটের উপর এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি নিষ্কামভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই; আর পুনরপি প্রশ্ন করিয়া বাবুদের বিরক্ত করিয়া তুলিলে হয়তো প্ল্যাটফরমে যে আশ্রয়টুকু পাইয়াছি তাহাও হারাইব। বাবুরা কুলি দিয়া আমার মালপত্র বাইরে ফেলিয়া দিবেন। অতএব প্ল্যাটফরমের সজীব বেঞ্চিখানার উপরে বসিয়া পড়িয়া একটি চুরুট ধরাইলাম।

তা সত্য কথা বলিতে কি স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতে আমার মন্দ লাগে না। তবে যে গাড়ির খোঁজ করি সেটা নিতান্ত কর্তব্য-বুদ্ধিতে, নিতান্তই কাজের লোকের অনুকরণে।

স্টেশনটি ছোট। স্টেশনের বাহিরে এক সার সিমুলগাছ শীতের বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে আগ্‌ডালের রোদটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তার পাশেই একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি-মোটা অশথ, হাজার পাতার হাজার নিশান নাড়িয়া অনুক্ষণ কি যেন সঙ্কেত করে। নিচে খান দুই গরুর গাড়ি, যেমন ছই, তেমন গরু, তেমনি গাড়োয়ান; জীর্ণতার এমন আতিশয্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে কান্নার সীমা অতিক্রম করিয়া এখন হাসির উদ্রেক করে মাত্র। লাল রাস্তাটি পার হইলেই ছোট খান কয়েক খাবারের দোকান, টঙা ধুলা উড়াইয়া চলিয়া গেলে সেই ধুলা সন্দেশের উপরে গিয়া সঞ্চিত হইয়া খাদ্যবস্তুকে পুষ্টতর করিয়া তোলে। শহরটি কিছু দূরে। চারিদিকে

শাল, মহুয়া, হরিতকী আর পলাশের বন; এই সব গাছের মাথার উপর দিয়া দূরের একটা পাহাড়ের কপালটা দেখা যায়, বেচারার উকি মারিয়া দেখিবার আগ্রহের আর শেষ নাই।

স্টেশন-ঘরের মধ্যে ঘন ঘন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে; টেলিগ্রাফের কলটা অদৃষ্টের আঙুলের মতো টেবিলের উপরে অনবরত তাল ঠুকিয়া মরিতেছে; প্রকাণ্ড টেবিলটার উপরে গোটা দুই মোটা খাতা মাথায় দিয়া কে একজন পড়িয়া ঘুমাইয়া 'নাইট ডিউটি' সম্পন্ন করিতেছে; একদিকে গোটা দুই লণ্ঠন, কয়েকটা কাঠের বাক্স, হাতুড়ি, নিশান ও একটা কুষ্মাণ্ড। দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে বটে, কিন্তু কাঁচখানা এমনি মলিন যে অক্ষরজ্ঞান দুঃসম্ভব। টিকিট ঘরের ঘুলঘুলির কাছেই মুসাফিরখানা অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী থাকিবার স্থান। আইনতঃ আমারও ওখানে বসিবার কথা, কিন্তু ফর্সা-কাপড় পরা বাঙালীবাবুর জন্য স্বতন্ত্র বিধান, তাই প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিখানায় বসিতে কেহ আমাকে বাধা দেয় নাই। একদিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি ঘর। একবার সেদিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম, দেখিলাম ঘরটা আগাগোড়া তোরঙ্গে, ট্রাঙ্কে বিছানায়, বালতিতে পুরাপুরি অধিকৃত, আর এতগুলি জিনিসের মালিকও নিশ্চয় সংখ্যায় কম নয়। কাজেই গাড়ি না আসা অবধি এই বেঞ্চিই আমার 'শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারানসী।'

চুরুটটা পুড়িয়া অনেকটা ছোট হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব পশ্চিমের মালগাড়ির শব্দ জোয়ার জলের মতো দুই প্ল্যাটফর্মের দুই তীরের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়; সিগনালগুলা উদার সম্মতিতে কখনো হাত নিচু করে, কখনো বা হাতগুলা টান্ করিয়া ধরিয়া দিগন্তের দিকে বন্দুক বাগাইয়া নিশানা করে; স্টেশনের বাহিরেই রেল লাইন খাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট একটা টানেলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; টানেলের ওদিকের মুখটা একটা আলোর রন্ধ্র, অন্ধকারের দূরবীণে এক চোখ লাগাইয়া নিকট যেন দূরত্বের দিকে তাকাইয়া আছে।

এ মন্দ লাগিতেছে না। এই শীতের সকালের মার্জিত স্নিগ্ধতা, ক্রমবর্ধমান মধুর উত্তাপ, শিমুলগাছগুলির আগাগোড়া রৌদ্রে ঝলমলানি, আর

উত্তরে হাওয়ার প্রত্যেক প্রস্তাবেই অশথ গাছের পাতাগুলির সম্মতি প্রকাশ। কাঁকর-বিছানো প্লাটফর্মে একটিও লোক নাই, দুটা কাঠবিড়ালি নির্জনতার মাকুর মতো ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করিয়া আরব্যোপন্যাসের কিংখাব বুনিয়া তুলিতেছে; মাঝে মাঝে পূব পশ্চিমের গাড়ির এই অতল স্তব্ধতার মধ্যে শব্দের শিকল নামাইয়া দিয়া পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়া যায়; এ যেন মানুষের রাজ্যের শেষতম সরাইটিতে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহার ঠিক পরেই মানুষের মনের উত্তর মেরুর আরম্ভ। এ রকম সর্বদায়িত্বহীন লঘুতা অনেকদিন অনুভব করি নাই।

চুরুটটা আরো অনেক ছোট হইয়া আসিয়াছে; তার ধোঁয়া আমার মনের মধ্যে ভাবের মৌসুমি মেঘের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, এখন বর্ষণের জন্য কেবল একটি শীতল দমকা হাওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু তখন এত বুঝিতে পারি নাই, বেঞ্চি ঠেসান দিয়া, চোখ বুজিয়া, মন খুলিয়া চুরুট টানিয়া যাইতেছিলাম।

সে আজ কত দিনের কথা? কুড়ি বছর? না তারও বেশি। কুড়ির চেয়ে ত্রিশের বেশি কাছে। তখন কেবল কলেজে ঢুকিয়াছি। কোথায় কি একটা পরিবর্তন হইয়া গেল। পরিবর্তনটা বুঝিতে পারি নাই, তার পরিণাম বুঝিতে পারিলাম। অকস্মাৎ যেন পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিল। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? চিরদিনের পরিচিত পানাপুকুর মানস সরোবরের অলৌকিকতা লাভ করিল। ঘরের কোণের মেয়েদের মুখ স্বর্গের সুষমায় ভরিয়া উঠিল। এতদিন যাহাদের দেখি নাই, এখন তাহাদের চোখে পড়িল। এ সেই বয়স যখন লোকে নারীকে আবিষ্কার করে, নূতন জগতের বিস্ময়-ভরা নাবিকের দৃষ্টিতে! প্রথমে সমষ্টিগতভাবে নারীকে আবিষ্কার, তারপরে নিজের অজ্ঞাতসারে কি একটা নির্বাচনী প্রথা চলিতে থাকে, যাহাতে ধীরে ধীরে আর সকলে বাদ পড়িয়া যায়, তখন সব সুষমা, সব সৌন্দর্য, সমস্ত মহিমা একটি মুখে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রেমের আতস কাঁচের মধ্যে ঘনীভূত সূর্যালোকের মতো হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেই প্রভায় বিশ্ব উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, তপ্ত হইয়া ওঠে। সে তাপ যে জ্বলন্ত মাণিকের তাপ, হাতে রাখা কঠিন, ফেলিয়া দেওয়া আরও কঠিন। কেবল এ হাত ও হাত করা!

সে কি অশান্তি, কি তীব্রতা, কিন্তু কি সুখকর! এ অনুভূতি যেন সোনার হাতলে গড়া ইস্পাতের তরবারির মতো, কোথায় সোনার শেষ, কোথায় ইস্পাতের সুরু বোঝা যায় না—আগাগোড়াই সমান উজ্জ্বল!

আমার স্বর্গ যে নারীর মুখে ঘনীভূত হইয়াছিল, তার নাম—বলিয়াই ফেলি, এখানে তো আমি একাই আছি, আর সে তো বহুদিনের আগের কথা—তার নাম মঞ্জুলা! আমাদের পাড়ারই মেয়ে, বাল্যকাল হইতে তাকে দেখিতেছি, কিন্তু হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম!

হাসি ঠাট্টা দিয়া তার সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত। বেশ চলিতেছিল, কোন পরিণতির আশা মনে ছিল না। তারপরে কেমন করিয়া জানি না আলাপের মধ্যে হাসির অংশ ক্রমে কমিয়া আসিতে আসিতে বায়ুমণ্ডল থম্‌থমে হইয়া উঠিল। বাতাস যতক্ষণ বয় কোন ভয় নাই, বাতাস পড়িয়া আসিতেই বুঝিতে পারা গেল বৃষ্টি নামিবে। বাদল নামিল।

...যাক্‌ গে সে সব কথা ভাবিয়া কি লাভ? কিন্তু মন যে লাভ লোকসান বিচার করিয়া চলে না—তার কি উপায়? তাই মনে মনে ভাবি। অনেক দিন হইল তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—কুড়ি বছরেরও উপরে। তবু সে আজ আমার কাছে সেদিনের সতেরো বছর বয়সের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবির মতো বিরাজ করিতেছে। বিবাহের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই—কিন্তু আজো তাকে দেখিতে পাই, লাল শাড়ীর আঁচলের প্রান্ত তার কোমরে জড়ানো, মার্জিত কপালের উপর কোঁকড়া চুলের বাতাসে আছাড়খাওয়া; শিউলি ফুলের স্বচ্ছতা তার চোখে, শিউলি ফুলের বৃন্তটি তার অধরে; তার মুখের ভাবে হাসি এবং অশ্রুর যেন অন্তহীন পাশাখেলা। কালস্রোত বহমান, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, তারই খানিকটা পাশের পল্বলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—সেখানে তার গতি নাই, পরিবর্তন নাই। তাই সে আজও সতেরো বছর বয়সের পল্বলে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে।

...আপনার কাছে দেশলাই আছে? চোখ খুলিয়া দেখি, একটি মেয়ে—বয়স দশ এগারো।

কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া দিলাম। মেয়েটি লইয়া ওয়েটিং রুমে গিয়া ঢুকিল। তবে এরাই ওয়েটিং রুমটি

অধিকার করিয়া আছে! মেয়েটি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নহে—ধুম দেখিয়াই বহ্নি অনুমান করিয়াছে।

আবার চোখ বুজিতে যাইতেছিলাম, পূর্বে পশ্চিমের দুইখানা মালগাড়ি প্রতিদ্বন্দ্বী যুগলের মতো বুক ফুলাইয়া পরস্পরের কান ঘেঁসিয়া ছুটিয়া গেল। কাঠবিড়ালি দুটো এই রেশনের দিনেও কোথা হইতে গোটাকতক ডালের দানা সংগ্রহ করিয়াছে।

মেয়েটি দেশলাই ফেরৎ দিতে আসিল। এবার তাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম, সে যেন এক আবিষ্কার! এও কি সম্ভব নাকি? এত মিল?

…তোমার নাম কি খুকী?

সে একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিল—অণিমা রায়।

…তোমরা কোথায় যাবে?

…কলকাতা।

…এখানে কেন এসেছিলে?

সে বলিল,—চেঞ্জে। দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া সে এক দৌড়ে ওয়েটিং রুমে গিয়া ঢুকিল। ভালই হইল। আমি ছবি মিলাইবার সুযোগ পাইলাম। এও কি সম্ভব? দুই মুখে কি এত মিল হইয়া থাকে! এ মেয়েটি যেন সেই মেয়েরই প্রতিচ্ছবি! সতেরো বছরকে এগারো বছরে ঠেলিয়া দিলে যা দাঁড়ায়—তা-ই। অণিমার চুলে, মুখে, চোখে, কপালে মঞ্জুলার মুদ্রাঙ্কন! নিঃশ্বাস ফেলিয়া নূতন চুরুট ধরাইলাম।

ওয়েটিং রুম হইতে একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছে হইবে। প্রৌঢ়ত্ব অধিকারের স্বপক্ষে 'রায়' পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনো বাঁশগাড়ি করিয়া দখল লইতে পারে নাই।

—বাঁচা গেল মশায়, একটা কথা বল্‌বার লোক পেয়ে—এই বলিয়া তিনি আমার পাশে বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই—এখানেও ছারপোকা দেখছি…

…ভিতরে ছারপোকা আছে নাকি?

…আছে নাকি! যে-টুকু রক্ত চেঞ্জে এসে সঞ্চয় করেছিলাম, বেটার

টেনে নিল। তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এরা বেশ কৌশল করেছে, লোকে চেঞ্জে এসে যে-টুকু রক্ত সঞ্চয় করে, যাওয়ার সময়ে ছারপোকার কল্যাণে এখানেই তা রেখে যেতে হয়। যেখানের স্বাস্থ্য সেখানেই থাকে—নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

আমি পুছিলাম—কতদিন হ'ল এসেছেন?

—তা মাস তিন হবে। আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'য়েছিল···তা উপকার হ'য়েছে, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কি গেরো দেখুন না, আটটায় গাড়ি ব'লে এসে ব'সে আছি, খাওয়াসুদ্ধ হয়নি—এখন শুনছি গাড়ি কখন্ আসবে তার ঠিক নেই। একটু থামিয়া বলিলেন—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

—আপনাদের উল্টো গাড়ি—পশ্চিমে।

আমরা যে পূবে যাবো তা কি করে জানলেন? ওঃ অণিমা বলেছে বুঝি! ওর ঠিক মঞ্জুর মতো স্বভাব। ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, মঞ্জু মানে আমার স্ত্রী। একটু বেশি কথা বলে। ওরা আবার বলে আমিই নাকি বেশি বক্‌বক্ করি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—কাশী। (মঞ্জু? কোন্ মঞ্জু?)

—বেশ জায়গা মশাই। সন্ধ্যাবেলা অহল্যা বাই-এর ঘাটের নহবৎ ভুলবার নয়।

—হুঁ। (মঞ্জু? না মঞ্জুলা?)

—কাশী আগে কখনো গিয়েছেন?

—না। (মঞ্জুরাণীও হইতে পারে।)

—কতদিন থাক্‌বেন?

—হুঁ। (ওটা হয়তো পিতৃকুলের নাম নয়, এঁদেরই দেওয়া।)

—ও বুঝেছি। তীর্থভ্রমণে। খুব ভালো মশাই, এখানকার লোক শাস্ত্র মানে না, কিন্তু সায়ান্স তো মান্‌তেই হবে! তীর্থভ্রমণের একটা বৈজ্ঞানিক দিক্ আছে।

—আছেই তো। (দূর ছাই, এর নাম ধাম পুছিলেই তো মিটিয়া যায়।)

—নিন্, একটা সিগারেট ধরান। ওঃ আপনি তো আবার·· ··এই বলিয়া নিজেই একটা সিগারেট ধরাইয়া টান দিলেন। আঃ—

নামধাম, পুছিলেই গোল মিটিয়া যায়। মঞ্জুলার স্বামীর নাম-ধাম জানিতাম, কিন্তু পুছিতে ভয় করে। পাছে জলের স্রোত মরীচিকায় পরিণত হয়। মরীচিকার পথিকের কি বিচার করিবার সাহস আছে?

·· মশাইয়ের নামটি?

আমি নাম এবং ধাম বলিলাম। এবার তাঁহাকে শুধানো যাইতে পারে। আপনার নাম?

·ত্রিদিব রায়। বাড়ি···

আর প্রয়োজন নাই। ইনি মঞ্জুলার স্বামী, অণিমা মঞ্জুলার মেয়ে, ঘরের মধ্যে কয়েক হাত দূরেই সামান্য একটা ইটের যবনিকার অন্তরালে আমার সেই সতেরো বছরের স্বপ্ন বসিয়া আছে। হয়তো একটা তোরঙ্গের উপরে, নয়, ছারপোকাভরা চৌকিতে! মেয়েকে দেখিয়াই মাকে বুঝিয়াছিলাম।

—মা আর মেয়ের স্বভাব এক রকম, কেবলি বকে, কিন্তু ওই পর্যন্ত, চেহারায় কোন মিল নেই।

লোকটা বলে কি? লোকে বলে! এ বিষয়ে আমার চেয়ে কার সাক্ষ্যের মূল্য বেশি?

দাঁড়ান মশাই আসছি। এই বলিয়া সিগারেটের দগ্ধ অংশ মাটিতে ফেলিয়া জুতা দিয়া দলিত করিয়া ওয়েটিং রুমে গিয়া তিনি ঢুকিলেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আজ যে আলোক-রশ্মিকে তুমি দেখিতেছ, বিশ্ব শান্ত বলিয়া আবার একদিন তাহা দেখিতে পাইবে, কেবল সেজন্য কোটি কোটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকা দরকার। সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে তত দীর্ঘ-কাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই, মাত্র সাতাশ বৎসর পরে আমার উন্মার্গগামী আলোকরশ্মি ফিরিয়া আসিল। সে রহিয়াছে ওই পাঁচ ইটের গাঁথুনি যবনিকাখানার অন্তরালে। হয়তো সে-ও নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার আলোকরশ্মির অপেক্ষা করিতেছে। ভুলিয়াও কি জানে যে, নামগোত্রহীন ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের এই ক্ষুদ্র স্টেশনের ছারপোকাখচিত বেঞ্চিতে সে বসিয়া বর্মা চুরুট টানিয়া অশ্রুর মৌসুমিমেঘ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সতেরো

বছরের ফ্রেমে বাঁধানো সেই আমার চিরন্তনী। তারপরে অবশ্য অনেক বছর গিয়াছে; কত সহস্র দিন-রাত্রি সেই সপ্তদশীর জীবনবৃন্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! পদ্মের পাপড়ি পর পর খুলিয়া লইলে পদ্মের কি পরিবর্তন হয়? পদ্মের কি সৌন্দর্য লোপ পায়? বরঞ্চ দলের পর দল খসিতে খসিতে মধুকোষের দিকেই তো আগাইয়া চলে—গন্ধটি আরও নিবিড়তর হইয়া ওঠে! সুভদ্রাহরণের সময়ে অর্জুন যেমন বল্গাটি সুভদ্রার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আমি তেমনি কল্পনার হাতে চিন্তার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া উদ্দামগতিতে মনোরথ ছুটাইয়া চলিয়াছি।

এমন সময়ে—মশাই, উঠুন, উঠুন, খিচুড়ি তৈরি।

ত্রিদিববাবু ওয়েটিং রুমের দরজায়।

—খিচুড়ি? কিসের খিচুড়ি?

—কিসের আবার? মুগের ডাল আস্ত গোল আলু আর পেঁয়াজ দিয়ে?

ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইতেই তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

মশাই, আটটায় ট্রেন ধরবো ব'লে এসেছি, যুদ্ধের দিনের ট্রেন প্রায় স্বর্ণমৃগ হয়ে উঠেছে ধরা দেবার নামটি নেই। তাই আমার স্ত্রী স্টোভ জ্বালিয়ে রেঁধে ফেলেছেন!

একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল কথা আমার স্ত্রীকে তো আপনি চেনেন। আপনার নাম শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন। আপনাদের পাড়ার মঞ্জুলা ঘোষ, এখন বিয়ে ক'রে রায় হ'য়েছেন।

—তাই নাকি? (যেন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না।)

—সে কি মশায়, মঞ্জুতো বললো যে তার নাম করলেই আপনি চিনতে পারবেন।

—মনে পড়ছে বটে! (তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী? তুমি পত্নীরূপে পাইয়াছ বলিয়া আত্মস্থ করিয়া একেবারে পরিপাক করিয়া ফেলিয়াছ। আর আমি পাই নাই বলিয়া সাতাশ বছর ধরিয়া তাহার স্মৃতি রোমন্থন করিয়া চলিয়াছি।)

—যাই বলুন মশাই আপনার স্মৃতির প্রশংসা করতে পারলাম না। পাড়ার মেয়ে একেবারে ভুলে গেলেন?

—ভুলবো কেন? এখন মনে পড়েছে। (আমার স্মৃতি মন্দই বটে। বরঞ্চ এরচেয়ে মন্দ হইলে এই সাতাশ বছর একটু স্বস্তি পাইতাম।)

—মনে পড়েছে, তবে চলুন খিচুড়ি-ভোগ করা যাক্।

তাহার সঙ্গে চলিলাম—এক মুহূর্তের মধ্যেই ইটের যবনিকা উঠিয়া যাইবে।

ওয়েটিং রুমের মধ্যে অন্ধকার, কোথায় কি আছে প্রথমে চোখে পড়িতে চায় না।

এমন সময়ে কোন্ কোণা হইতে একটি কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল—এই যে অমলদা, চিনতে পারেন? সেই কণ্ঠস্বর! সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর সাতাশ বছরের বিস্মৃতির সপ্ততাল ভেদ করিয়া একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু মঞ্জুলা কোথায়?

মঞ্জুলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—কি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? এই যে আমি।

দুটি তোরঙ ও বিছানায় প্রাচীরের আড়াল হইতে শব্দ আসিতেছে। ওইখানেই তো বটে।

ততক্ষণে চোখও অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, দেখিবার সুযোগ পাইলাম—কিন্তু না দেখিলেই বোধকরি ভাল ছিল! ও কে? ও কোন্ মঞ্জুলা? এ কি? এ কে? সাতাশ বছর ধরিয়া অদৃষ্ট এই মুহূর্তটিকে শাণ দিয়া কি মর্মান্তিক করিয়াই না গড়িয়া তুলিয়াছে? আজ সে কি নিষ্ঠুর গৌরবেই না তাহা আমার কল্পনার শিরে নিক্ষেপ করিল! এই কি আমার সতেরো বছরের ফ্রেমে বাঁধানো সপ্তদশী?

ত্রিদিব বাবু বলিলেন, নিন বসে পড়ুন, সেরে নেওয়া যাক্। হঠাৎ কখন স্বর্ণমৃগ এসে পড়বে তার স্থিরতা নেই।

দুইজনে বসিলাম—মঞ্জুলা পরিবেশন করিতে করিতে কত কি বলিয়া যাইতে লাগিল।

—বুঝলেন অমলদা, বিয়ের পরে আমি অনেকবার আপনার খবর নিতে

চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকবারই শুনেছি আপনি দেশে নেই।

—হুঁ।

—আপনি আর বিয়ে করলেন না? এখনো সময় যায়নি, ক'রে ফেলুন।

—তাই ভাবছি। (এর আগে কখনো ভাবিনি, এইবার সত্যই বিবাহের কথা মনে হইল।)

—আমার মেয়ে বেশ গান গাইতে পারে, খেয়ে উঠে শুনবেন।

—বেশ তো। (কালের গতি এমনভাবে আর কখনো প্রত্যক্ষ করি নাই! আমি যখন কল্পনায় বাসর গড়িতেছিলাম, কাল তখন বাস্তবে সমাধি রচনায় নিযুক্ত ছিল।)

—আর একটু খিচুড়ি দিই!

—না, না।

—আপনার সে অভ্যাস যায়নি দেখছি। পেটে হাজার খিদে থাকলেও 'না' বলবেনই।

—এই নিন্।

ত্রিদিববাবু বলিলেন—ও'কে আর গোটাকয়েক আলু দাও।

—দাও। (এ কেমন হইল! এক যাত্রায় পৃথক্ ফল। আমি ও মঞ্জুলা কালের প্রায় এক প্রকোষ্ঠ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সেই মানুষের আজ এই পরিবর্তন? আমার কেন পরিবর্তন হইল না? আমার দৃষ্টি কেন সাতাশ বছর আগেকার ছাপ ধরিয়া রাখিল? আমিও কেন তাহার দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইয়া গেলাম না? দুজনের একই পরিবর্তন ঘটিলে তো দুঃখ ছিল না। কালের স্রোত একই তালে প্রবাহিত হইলে কেহ কাহারো পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেই পারিতাম না। পরিবর্তন অনিবার্য হইলে তার চেয়ে আর কি ভাল হইতে পারে?)

আহারান্তে স্নানের ঘরে হাত মুখ ধুইতে গেলাম। মুখ ধুইয়া যেমনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছি—আয়নায় ও কাহার ছায়া? পাকা চুল; দাগ-ধরা গাল বসিয়া গিয়াছে; সারা মুখে বার্ধক্যের জটিল পাঞ্জার ছাপ?

এ কি আমি? আমিই তো? তবে আমিও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি!

এমন প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের বার্ধক্য ইতিপূর্বে কখনো লক্ষ্য করি নাই! যে-সাতাশ বছর সেই সপ্তদশীর গাঙে প্রবাহিত হইতেছিল, আমাকেও তাহা হইলে সে বাদ দেয় নাই! দুজনে কাল-তরঙ্গের একই উদ্ধত শিখরে যাত্রা করিয়াছিলাম—আজও সেই এক সঙ্গে চলিয়াছি! কালের সম্বন্ধে আমরা সহোদর, সে সম্বন্ধ আজও অবিকৃত আছে দেখিতেছি! নিজের বার্ধক্যে এক-প্রকার অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করিলাম। বোধকরি আর কেহ কখনো নিজের বার্ধক্যে এমন উল্লাস অনুভব করে নাই—এমন অনুভূতি যে হইতে পারে তাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। মঞ্জুলাকে দেখিয়া যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম—এক মুহূর্তে তাহা বুক হইতে নামিয়া গেল। বার্ধক্যের ব্রহ্মাস্ত্রে সজ্জিত হইযা নির্ভয়ে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

মঞ্জুলা হাসিয়া বলিল—অমলদা, আপনি বুড়ো হ'যে পড়েছেন।

হাসিয়া বলিলাম—বয়স তো হ'ল! (এমন সার্থক হাসি অনেকদিন হাসি নাই! বৃদ্ধ হইয়াছি, হইয়াছি বই কি।)

সে বলিল—আমাকে কি রকম দেখছেন?

আমাকে উত্তর দিবার সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়া দিয়া সে বলিল,—আমি সেই রকমই আছি, না?

আমি শুধু বলিলাম,—হাঁ।

মঞ্জুলা যেন খুশী হইয়া বলিল,—ঠিকই বলেছেন আমার কোন পরিবর্তন হয়নি। উনিতো ওই নিয়ে আমাকে সব সময়ে ঠাট্টা করেছেন-ই।

—করবো না! আমি বুড়ো হ'য়ে পড়লাম। আর তুমি থাকবে উর্বশী হ'য়ে—এ কোন স্বামীর প্রাণে সহ্য হয় বলুন।

আমি বলিলাম,—সত্যই তো!

—কিন্তু অমলদা, আপনি এমন অকালে বুড়ো হ'য়ে পড়লেন কেন?

কি আর বলিব! স্বাস্থ্য, পরিশ্রম প্রভৃতি গতানুগতিক যুক্তিগুলি দিলাম।

সে বলিল,—তা নয়, বিয়ে করেননি বলেই।

এমন সময়ে পুবের গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ত্বরা করিতে হইল। অদৃষ্টকে যতখানি নিষ্ঠুর ভাবিয়াছিলাম, ততটা নয় দেখিতেছি। সে

কেবল এক পক্ষকেই আঘাত করিয়াছে. মঞ্জুলাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। বার্ধক্য মঞ্জুলাকে আলগোছে স্পর্শ করিয়াছে, এত লঘুভাবে যে সে-স্পর্শ দেহ ছাড়িয়া মনে গিয়া জমিতে দেয় নাই। আমার দৃষ্টিতে আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, তার চোখে কেবল আমিই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এই মোহকর খাতিরটুকু করিবার জন্য বার্ধক্যকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না।

মঞ্জুলা একটা তোরঙ বন্ধ করিতে করিতে বলিল,—বয়সের সঙ্গে পরিবর্তন হওয়াই ভালো।

তারপরে হাসিয়া বলিল,—অমলদা, এর পরের বার দেখা হ'লে দেখবেন বুড়ো হয়ে পড়েছি।

আমি বলিলাম,—তবে যাতে শীঘ্র দেখা না হয় তার চেষ্টা করবে।

—কেন বার্ধক্য আপনার ভাল লাগে না? ততক্ষণে সে তৈজসপত্র বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

—সকলে সমানভাবে বুড়ো হ'লে অবশ্যই ভাল লাগে।

এমন সত্য কথা জীবনে আর মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। বার্ধক্যের প্রসারিত দুই হাত হইতে দুই বিষের পাত্র লইয়া দুইজনে যুগপৎ পান করিয়াছি; সে না জানিয়া, আমি জানিয়া এই মাত্র তফাৎ। মহাকাল যৌবনে একবার আমাদের প্রতি দয়া করিয়াছিল, বার্ধক্যের প্রথম ধাপে আসিয়া আর একবার দয়া প্রকাশ করিতে ভোলে নাই। আমরা যে কাল-তরঙ্গের একই শিখরের যাত্রী, একই সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রহর বাজিতেছে, সুখে-দুঃখের ছায়ালোক আমাদের জীবনে একই রেখা-সম্পাত করিতেছে, কালের বাটালি দু'জনের মুখে একই রেখাক্ষর ক্ষুদিয়া দিতেছে। বুড়ো হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা সত্য, একশবার সত্য, কেবল সান্ত্বনা এই যে, একই সঙ্গে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছি।

তারপরে ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বিলম্বিত ট্রেনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পাঁচ সাতটা কুলি ডাকিয়া মহা সোরগোল করিয়া মঞ্জুলাদের পূবের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি উল্টো গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। সারি সারি সিসুগাছ মরকতের ঝাণ্ডা তুলিয়া

ক্ষীয়মান দিবসের শোভাযাত্রার উৎসবের আয়োজন সম্পন্ন করিয়াছে। অশ্বথ-গাছের হাজার পাতার নিশানে নিশানে বর্ষীয়ান দিবসের জয়ধ্বনির চঞ্চলতা। আর নিকট সেই টানেলের দূরবীণটা চোখে লাগাইয়া দূরে সূর্যাস্তের দেশে কোন্ সান্ত্বনার যেন সন্ধান করিয়া মরিতেছে।

আজকার প্রভাতটি রাজকন্যা সতীর ঐশ্বর্য লইয়া আমার কাছে আসিয়াছিল, সেই দিনেরই নিরাভরণ সন্ধ্যাটি আবার জন্মান্তের উমার নিরলঙ্কার সৌন্দর্য লইয়া আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার পায়ের কাছে ওই মহাকালের কালনাগ ফণা নত করিয়া হীনবীর্য হইয়া পড়িয়া আছে।

আমার উল্টো গাড়ির ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মাধবী মাসী

মেয়েদের বোর্ডিঙের মেট্রন—মাধবী মাসী। ছোট থেকে বড়, ঝি-চাকর থেকে লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকলেরই সে মাধবী মাসী, এর চেয়ে বেশি পরিচয় তার আর কেউ জানে না। ছোট ছোট মেয়েরা প্রথম যেদিন আসে, পুরাতনীদের সঙ্গে কি তাদের কানাঘুষা হয়, অমনি তারা মাধবী মাসী বলিয়া ডাকিতে সুরু করে। আবার বয়স্ক মেয়েরা যেদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিঙ ছাড়িয়া যায়, তার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া যায়, মাধবী মাসী চললাম। মাধবী হাতের সেলাইটা ক্ষণকালের জন্য রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসে; গাড়ি আসিয়া থাকিলে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বিদায়প্রার্থী মেয়েটি বলে, মাধবী মাসী মনে রেখো। মাধবী কোন কথা না বলিয়া শুধু একবার হাসে; তাহাতে অনেক কিছু বলা হয়। মেয়েটি বুঝিতে পারে। লোকে কেন এমন করিয়া হাসিতে পারে না। তার বদলে কতকগুলো আজে-বাজে বকে—বোঝার চেয়ে অনেক বেশি ভুল-বোঝার সৃষ্টি হয়।

বিকাল বেলা ইস্কুল কলেজ থেকে মেয়েরা ফিরিতে সুরু করে। আগে ইস্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা ফেরে। তারা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে কোন

রকমে বইগুলা ফেলিয়া দিয়া মাধবীর ঘরে আসিয়া ঢোকে—মাধবী মাসী খিদে পেয়েছে। তার পরে কলেজের বয়স্ক মেয়েরা ফেরে, তারা এখন ছুটিয়া চলা ছাড়িয়াছে; ঘরে আসিয়া বই-খাতাপত্র রাখিতে কিছু সময় তারা নেয়, তার পরে একে একে আসিয়া মাধবীর ঘরে বসে। "খিদে পেয়েছে" এ কথাটা মুখে বলে না, কিন্তু মাধবী বুঝিতে পারে। মাধবী একবার হাসিয়া হাতের সেলাইটা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া খাবার ঘরের দিকে যায়—সকলে তাহাকে অনুসরণ করে। জল খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা খেলাধূলা করিতে করিতে যায়, কেহ বা বেড়াইতে বাহির হয়, তখন মাধবী আবার ফিরিয়া আসিয়া সেলাইটা তুলিয়া নেয়। তাহার মন কি ভাবিতে থাকে, অভ্যস্ত আঙুলগুলা কাঁটা চালাইয়া নিয়মিত পথে বুনিয়া চলে। তার আর বিরাম নাই। কাঁটার টানে উলের পুঞ্জীভূত স্ফীত গোলকটা ক্রমে ছোট হইয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ এক সময়ে ফুরাইয়া যায়, তবু আঙুলের চলার বিরাম নাই! এমন সময়ে লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়তো পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ডাক দিয়া বলেন, "মাধবী মাসী, আলোটা জ্বেলে নাও। চোখ দুটো যে যাবে।" মাধবীর ধ্যান ভাঙিয়া যায়, দেখে ঘর অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; সে চট করিয়া বিদ্যুতের আলোটা জ্বালায়; দেখে উল অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে; বিনা সুতায় কি বুননই না সে বুনিতেছিল। একবার সে হাসে। কি মনে পড়ে? হয়তো নিজের জীবনের ইতিহাসটাই মনে পড়ে। তার জীবনও তো বিনা সুতায় বোনা না-হওয়া একখানা কিংখাবের পর্দা। সুতাও নাই, পর্দাও নাই, শুধু অদৃষ্টের হাতের সূচী চালনা আছে, আর তার আঘাত আছে।

খেলা শেষ করিয়া মেয়েরা ফেরে, বেড়াইয়া মেয়েরা ফেরে। প্রথমে সকলে আসিয়া মাধবীর ঘরে একবার হাজিরা দেয়। তাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতা মাধবী মাসীর জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে।

—মাধবী মাসী, অন্তু আজ পড়া পারেনি।

—তাই বই কি! আচ্ছা মাধবী মাসী, মিশরের রাজধানী জেনে কি লাভ হবে?

—নইলে ভূগোল জানবে কি করে?

মাধবী বাদী বিবাদী দুজনের দিকে তাকাইয়া একবার করিয়া হাসে মিশরের রাজধানীর পরিচয় জানার অনুকূলে প্রতিকূলে দু'জনেই সেই হাসিতে নিজের সমর্থন খুঁজিয়া পায়।

মাধবী বলে এবার একটু পড়তে বসোগে।

ছোট মেয়েরা দুড়দাড় করিয়া প্রস্থান করে, বোধ করি, পড়িবার উদ্দেশ্যেই।

বড় মেয়েরা তখনো ওঠে না। তারা কথা বলিয়া যায়, মাধবী বুনিতে বুনিতে শোনে।

—মাধবী মাসী, এবারে আর পাস করতে পারবো না।

—মাধবী মাসী, ও পাস না করলে আমরা সবাই ফেল।

—আচ্ছা, কি যে বলো? এ বছর কতদিন অসুখে ভুগলাম জানো তো!

—পাস করবেই। বড় জোর স্কলারশিপ না পেতে পারো।

—তা হ'লে এম-এ পড়বো কি করে?

অণিমা ও বিনতার কথোপকথন; মাধবী মাসী শ্রোতা।

মিশরের রাজধানীর নাম কাইরো, কাইরো······

—ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—দি গ্রেট······

—অত চেঁচাস্‌নে······কাইরো······কাইরো······

—আস্তে পড়······আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্—দি গ্রেট্······

—বু······বু······বু······

—উঁ······উঁ······উঁ······

মাধবী মাসী হাসিল। মেয়েরা হাসিল। সকলেই বুঝিল ভৌগোলিক রস্ত ও ঐতিহাসিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা করিতে করিতে পরস্পরকে নিরস্ত্র করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার পরস্পরের প্রতি মুখ ভেঙচাইল। পাশের ঘরের অদৃশ্য যুগল মুখভঙ্গী মনে করিয়া আবার সকলে একবার হাসিল। মাধবী মাসীও হাসিল।

বড় মেয়েদের উঠিয়া যাইতে বলিতে হয় না। নিজের গরজেই তাহারা উঠিয়া যায়, লেখাপড়ার গরজ তাদের আছে। তবে লেখা বলিতে চিঠি লেখাও বুঝাইতে পারে, পড়া বলিতে চিঠি পড়া বোঝাও অসম্ভব নয়।

রাত দশটার মধ্যে খাওযা-দাওযা মিটিয়া বোর্ডিঙ নিস্তব্ধ হইযা যায, পাড়াতেও সাড়া-শব্দ থাকে না; কেবল মাধবীর ঘরের বাতিটির বিরাম নাই, আর বিরাম নাই তার আঙুলগুলির। সে অন্যমনে শাদা জমিনের উপর সূতার ফুল কাটিয়া চলিযাছে, ওই অন্ধকার জমিনে জোনাকীর জ্বলা-নেভা যেমন ফুল কাটিতেছে; নিশান্তের প্রকৃতি উন্মুখ ফুলের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইযা তুলিবার উপক্রম করিযা সবুজের জমিনে যেমন ফুল কাটিবার আযোজন করিতেছে; কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোন প্রকার গতির চেষ্টা মাত্র যেন নাই; বিশ্ব যেন রাত্রির অন্ধকারের গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকিযা পড়িযা ঘুরিযা ঘুরিযা হতাশ হইয়া অবশেষে বসিযা পড়িযাছে। কেবল মাধবীর ঘরের ঘড়িটার দুঃসাহসী কাঁটা দুটির দুস্তর কালসমুদ্রের মধ্যে তালে তালে দাঁড় ফেলিবার শব্দ, কেবল মাধবীর আলোকোজ্জ্বল আঙুল ক'টার অভ্যস্ত নিপুণ গতি; এইটুকু শব্দ, এইটুকু গতি না থাকিলে সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে নিস্তব্ধ, নিশ্চল মনে করা যাইত।

২

মাধবীর বিস্তৃত পরিচয অফিসের দপ্তরে হযতো কোথাও আছে। কিন্তু লোকে তার বিষয়ে খুব অল্পই জানে। তার বাড়ি কোন এক দূর পল্লীগ্রামে, নদীর ধারে, আম-কাঁঠালের ছাযায। কিন্তু বাড়ি যাইতে কেহ কখনো তাহাকে দেখে নাই, লোকের যতদূর মনে পড়ে, সে এই বোর্ডিঙেরই যেন সজীব, স্থাবর একটা চিহ্ন। যেমন ওই শিরিষের গাছটা, গভীর ইঁদারাটা, ঝুমকোলতার দেউড়িটা, তেমনি বোর্ডিঙের মাধবী মাসী।

সে অল্প বযসে বিধবা। পরনে শুভ্র থান শাড়ী, গাযের রং ফর্সা, হাসিতে স্বচ্ছতা, সবশুদ্ধ মিলিযা যেন একটি বৃষ্টিস্নাত রজনীগন্ধার ঝাড়। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহার মুখে কেমন একটা ক্লান্ত প্রশান্তির ছাযা; রবিবার বিকালের মধ্যে যেমন একটি বিষণ্ণ ক্লান্তি আছে, চারিদিকের হাঁকডাক, ছুটোছুটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই আছে, কিন্তু

সবই কেমন যেন এক প্রকার মেঘের ছায়াতে ম্লান; মাধবীর মুখে অনেকটা সেই রকমের ভাব।

বোর্ডিঙের মেয়েদের সঙ্গ সে পায় বটে, কিন্তু তাহার কোন সঙ্গী নাই; পুরোপুরি তাহার সঙ্গে কেহ মিশিতে পারে নাই; খানিকটা অগ্রসর হইয়াই থামিয়া যাইতে হয়। যেন সে একটা কাচের আবরণের ওপারের জিনিস, দেখা যায়, কিন্তু হাত পৌঁছায় না। তাহার বয়স কত—এ প্রশ্ন কখনো কাহারো মনে জাগে নাই; অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র সবাই জানে। বোধ করি, মাধবী নিজেও নিজের বয়স ভুলিয়া গিয়াছে। আর মনেই বা থাকিবে কি করিয়া? তুলনায় বয়স সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে। ছোটবেলা মা-বাপ, ভাই-বোন আছে; তারপরে প্রণয়ী আছে, স্বামী আছে; তারপরে আবার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি আছে। কিন্তু মাধবীর তো কেহই নাই। উত্তর মেরুর নির্জনতায় গিয়া কিছুকাল থাকিলে মানুষ যেমন বয়স ভুলিয়া যায়, মাধবীরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে সংসারের, উত্তর মেরুর চিরধবল, চির নির্জন শূন্যতার অধিবাসিনী; তাই তার হাসিতে, বসনে, মুখের ভাবে মেরুসুলভ এক প্রকার শীতল শুভ্রতা। কিন্তু মেরুর বরফের চাপার তলেও নাকি আগ্নেয়গিরি আছে বলিয়া শোনা যায়।

৩

বোর্ডিঙে তো বছরের পর বছর কত মেয়েই আসে, কত মেয়েই চলিয়া যায়; সকলেই মাধবীর স্নেহ পায়, অনেকেই সঙ্গ পায়, কিন্তু কেহ তার সঙ্গী হইতে পায় না। কিন্তু বিনতার সঙ্গে মাধবীর একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, যদি মাধবীর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা শব্দটা ব্যবহার করা চলে!

বিনতার প্রতিদিন মাধবীর কাছে চুল বাঁধা চাই। রবিবার ছুটি বলিয়া চুল বাঁধা কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। চুল-বাঁধার মস্ত সুবিধা এই যে কেহ কারো মুখ দেখিতে পায় না বলিয়া মনের কথা বেশ খুলিয়া বলিতে পারে।

বিনতা পুছিল—আচ্ছা মাধবী মাসী, স্বামীকে তোমার মনে পড়ে?

মাধবী বলিল—না।

বিনতা আবার পুছিল—একেবারে না?

মাধবী বলিল—কিছুই না।

আচ্ছা মাধবী মাসী, তোমার ক'বছর বয়সে বিবাহ হ'য়েছিল।

মাধবী আচ্ছা করিয়া চুলের ফিতা আঁটিতে আঁটিতে বলিল—ন বছরে।

—উনি মারা গেলেন কবে?

ততক্ষণ বেণী প্রায় কুণ্ডলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাধবী বলিল—বিয়ের এক বছর পরে।

বিনতা পুছিল—এই এক বছর তো তাঁকে দেখেছিলে, তবে?

মাধবী খোঁপার উপরে কয়েকটা আঘাত করিয়া সেটাকে মানানসই করিতে করিতে বলিল—

—তিন চারবার।

—তবু মনে পড়ে না?

মাধবী এবার বলিল—মনে পড়ে বই কি?

বিনতা সাগ্রহে বলিল—কি রকম?

—একটা কনুই-এর মতো।

মাধবী বলিল—তার আর কিছু মনে নেই, কেবল তার কনুই-টা মনে আছে।

বিনতা মুখ না ফিরাইয়াও বুঝিতে পারিল মাধবী একবার হাসিল। কিন্তু বিনতা হাসিতে পারিল না। তারপরে কয়েকদিন ধরিয়া বিনতার মনে মাধবীর কনুই-রূপ স্বামীর কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অবশেষে সেটাকে মাধবীর একটা পরিহাস ভাবিয়া লঘু করিয়া উড়াইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অবশেষে অন্যান্য মেয়ের মত বিনতাও একদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিং ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন মাধবীর নামে একখানা চিঠি আসিল; চিঠিপত্র তার নামে বড় আসে না। মাধবী চিঠি খুলিয়া দেখিল, বিনতা লিখিতেছে, আগামী ২৩শে তারিখ তাহার বিবাহ। বিনতার বিবাহ! মাধবী চমকিয়া উঠিল—তবে তো ইতিমধ্যে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে! হিসাব করিয়া দেখিল বিনতার বি, এ পাশ করিবার পরে দুই বছরের বেশি অতিক্রান্ত হইয়াছে।

কিন্তু যেন সে-দিনের কথা মাত্র—যেদিন সে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গল্প করিতেছিল!

বিনতার বিবাহে মাধবীর যাওয়া সম্ভব হইল না। সে নিজের হাতের তৈরী একটি জামা বিনতাকে পাঠাইয়া দিল। আর মনে মনে ওই তারিখটিতে একটা লাল চিহ্ন দিয়া রাখিল। প্রতি বছর ওই দিন একটি করিয়া জামা তার নামে ডাকে পাঠাইয়া দিত।

এই রকম করিয়া দিন যায়, বছর যায়, কিন্তু কতদিন গেল, কত বছর গেল মাধবী তাহা যেন জানিয়াও জানিতে পারে না। একদিন বিকাল বেলা, মেয়েরা যখন খেলাধুলা করিতে গিয়াছে, বোর্ডিঙ যখন শূন্যপ্রায়, তাহার ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ি আসিয়া থামিল। সে সচকিত হইয়া উঠিবার আগেই বিনতা ঘরে প্রবেশ করিল।

—মাধবী মাসী, দেখা করতে এলাম।

মাধবী খুসী হইয়া হাতের সেলাই রাখিয়া বলিল—বিনতা, আয় বোস্। সঙ্গে ওটি কে?

বিনতা বলিল—ওর জন্যই তো এলাম। আমার মেয়ে মমতা। এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।—এই বলিয়া মমতাকে বলিল—নাও, মাধবী মাসীকে প্রণাম করো। আমাদের মাসী। মমতা প্রণাম করিল।

বিনতা বলিয়া চলিল—ওকে বোর্ডিঙে রাখতে হবে। তোমার কাছে ছাড়া কোথায় আর রাখি। তাই তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।

মাধবী উঠিয়া দুইজনকে খাইতে দিল। আহারাদি করিয়া মমতাকে মাধবীর কাছে রাখিয়া বিনতা চলিয়া গেল, সে কন্যার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল।

সারারাত্রি মাধবীর ঘুম হইল না, অভ্যস্ত সেলাইয়ে বারংবার ছেদ পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পাশের ঘরে মমতা ঘুমাইতেছে—বিনতার মেয়ে। তবে এর মধ্যে অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে, অনেক বছর। আচ্ছা, কত বছর দেখাই যাক্ না। হিসাব করিয়া দেখিল প্রায় পনেরো বছর। বিনতার বিবাহের পরে পনোরো বছর। পনেরো-টা জামা তাহা হইলে সে পাঠাইয়াছে। এতকাল সে যন্ত্রচালিতের মতো বছরে বছরে

বিবাহের তারিখে জামা পাঠাইয়া দিত—কখনো হিসাব করিয়া দেখে নাই —কত বছর গেল। এইবার প্রথম মাধবী বছরের হিসাব করিল। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে পনেরো বছর সঞ্চিত হইয়া মমতার জীবনে যুক্ত হইয়াছে, সেই পনেরো বছর তো কাল তরঙ্গের আঘাতে তাহার জীবন হইতেও ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কালের গতি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা—কিন্তু মাধবীর কাছে তাহা অতিশয় অসাধারণ বলিয়া মনে হইল।

বায়ুহীন কাচের পাত্রে কোন পদার্থ রাখিলে তাহা অবিকৃত থাকিয়া যায়, মাধবীও সেই রকম একটা মানসিক কাল শূন্যতার মধ্যে এতদিন যেন ছিল; কাল সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না বলিয়া জরা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এবারে মমতার পরিচয়ের ফাটল দিয়া কাল-জগতের হাওয়া তাহাকে স্পর্শ করিল, জরা অত্যন্ত ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত নিঃসংশয়িত-রূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে সুরু করিল।

মাধবীর কাজকর্ম সমস্তই পুরাতন পথে চলে বটে, কিন্তু সে আর কাল-শূন্যতায় ফিরিয়া যাইতে পারে না; মমতাকে যখনই দেখে অমনি কালের ব্যবহার সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া উঠে। মমতাকে সে ভালবাসে বোর্ডিঙের মেয়ে বলিয়া, তাদের চেয়েও বেশি ভালবাসে বিনতার মেয়ে বলিয়া, কিন্তু তবু তাকে কেন যেন সম্পূর্ণ সহ্য করিতে পারে না! মমতা তাহার কাছে কালের সতর্কবাণী!

একদিন লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন—মাধবী মাসী, তোমার চেহারা এমন খারাপ হ'ল কেন? রাত জেগে সেলাই করা বন্ধ ক'রো। যাওনা, এবার পূজোর ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে এসো গিয়ে।

মেয়েরা বলে, মাধবী মাসী, তুমি কেমন যেন বুড়ো হ'য়ে গেলে!

—ছিঃ ছিঃ, বুড়ো মাসী নিয়ে আমাদের লজ্জা করবে যে!

ঝি-চাকরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—মাধবী মাসীর বয়স হ'য়েছে। আর বেশি দিন নয়!

মাধবী শোনে আর অবাক্ হইয়া ভাবে—মমতার প্রতি কেমন একরূপ অসহিষ্ণুতা অনুভব করে, মমতাকে আরও বেশি করিয়া ভালোবাসে।

আগে সময় কেমন করিয়া যাইত মাধবী বুঝিতে পারিত না, এখন তাহার সময় যাইতে চাহে না। মাধবী সেলাই করিতেছে, পাশের ঘর হইতে মমতার কণ্ঠ শব্দভেদী বাণের মতো তাহার অপসৃত যৌবনের ক্ষীণ লক্ষ্যটার উপরে নির্ঘাত আসিয়া আঘাত করিল; মাধবীর সেলাই হাত হইতে পড়িয়া গেল। মাধবী অনেক কষ্টে একটা পদ্ম তুলিয়াছে, এখন তাহার উপর ভ্রমরটি বসাইলেই নয়, কোথা হইতে মমতার উচ্ছলিত খিলখিল হাসি অদৃষ্টের নিপুণ হস্তনিক্ষিপ্ত পাশার মতো চিক্কণ শব্দ তুলিয়া তাহার জীবন ছকের উপর পড়িয়া সযত্নে সাজানো সব গুটি ওলটপালট করিয়া দিল, মাধবীর ভীত ভ্রমর কোন পথে যে পালায়, সে বুঝিতেই পারে না! অবশেষে মাধবীও বুঝিতে পারে সে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে।

আগের মতোই সে রাত্রি জাগিয়া সেলাই করিতে বসে বটে, কিন্তু রাত্রি জাগাই হয়, সেলাই আর হয় না। সে নিজের হারানো জীবনের দরজায় প্রহরীর মতো একাকী জাগিয়া বসিয়া থাকে। আকাশে তারা নড়ে, পৃথিবীতে শিশির ঝরে, জোনাকীর জ্বলা-নেভা অন্ধকারের জমিতে আগুনের ফুল কাটিতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা প্রত্যেক মুহূর্তটিকে বাজাইয়া বাজাইয়া গ্রহণ করে, কেবল মাধবীর আঙুল আর চলে না, তাহার সূতা আর ফুরায় না, অসমাপ্ত পদ্মের দিক হইতে তাহার দৃষ্টি বিলুপ্ত দিগন্তের দিকে কখন্ নিক্ষিপ্ত হয়, ওখান দিয়াই যে তাহার হারানো যৌবন কোন্ প্রত্যাবর্তনহীন শূন্যতার মধ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

চাকরিস্তান

সমাগত অতিথিদিগের অভ্যর্থনা শেষ করিয়া সিন্ধবাদ তাহার নবম বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সিন্ধবাদ বলিল—বন্ধুগণ, ইতঃপূর্বে আমার আট বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিয়াছি, এবারে যাহা বলিব তাহা সব চেয়ে বিস্ময়জনক। আমি একটা কথাও বানাইয়া বলিব না, দরকারও নাই, কারণ বাস্তব ঘটনাই

এমন বিস্ময়কর যে আপনাদের সন্দেহ হইতে পারে আমি অনেকবার সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া হয়তো বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছি।

আমি বছর দুই পূর্বে বসোরা বন্দরে দুইখানি জাহাজে নানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া বাণিজ্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কিছুদিন আমরা দক্ষিণ দিকে চলিলাম, অবশেষে নারিকেলপূর্ণ একটি দ্বীপকে বামে রাখিয়া আমাদের জাহাজ পূর্বোত্তরে চলিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় একমাস গেল।

এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝড় উঠিল। ঝড় ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। জাহাজের প্রধান নাবিক বলিল যে সে প্রায় ত্রিশ বৎসর জাহাজ চালাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এমন দানবীয় ঝড় জীবনে আর দেখে নাই। আমরা সকলেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া হতাশভাবে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া আমাদের জাহাজের ঝুঁটি ধরিয়া এমন নাড়িয়া দিল যে, মুহূর্তে জাহাজখানা শত খণ্ড হইয়া ডুবিয়া গেল। আমি ফুটন্ত কালো জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম সমুদ্রের ধারে বালুর উপরে আমি পড়িয়া আছি। চাহিয়া দেখি সমুদ্র শান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর জাহাজখানার কোন চিহ্ন কোথাও নাই। আমার সঙ্গীদের কি দশা হইল দেখিবার জন্য আমি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম, কত ঘুরিলাম, কত নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কত ইসারা করিলাম, কিন্তু কেহ যে বাঁচিয়া আছে এমন বোধ হইল না।

সঙ্গীদের আশা ছাড়ায়া দিতেই নিজের কথা স্মরণ হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে, আমি মৃতপ্রায়; পরিধানে একমাত্র বস্ত্র। তখন মনে হইল এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! নিরন্ন নিঃসহায় হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মনে হইল সঙ্গীদের-ই ভাগ্য ভালো—আমার মতো এমন দীর্ঘায়িত যন্ত্রণা ভোগ তাহাদের করিতে হইবে না। ভাবিলাম এখানে তো জনপ্রাণী দেখিতেছি না—আর দেখিলেই বা লাভ কি, তাহারা কি আমার মতো বিদেশীকে সাহায্য করিবে? কিংবা হয়তো অসভ্যদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি—তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে! অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত

হইয়া বালুর উপরে বসিয়া পড়িয়া ভগবান ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে দূরে একটি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম। মনে আশার সঞ্চার হইল। আগুন যখন তখন মানুষও অবশ্য আছে। আমি অগ্নি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সমুদ্রের ধারে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে আর অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। শুনিয়াছিলাম কোন কোন দেশে মানুষ মরিলে আগুনে দাহ করে—ভাবিলাম সেইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতেছে।

আমি আরও কাছে আসিলাম। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল, কাজেই কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। দেখিলাম কাঠের ইন্ধন সাজাইয়া একটি অগ্নিকুণ্ড রচিত হইয়াছে. কিন্তু তাহার উপরে কোন মৃতদেহ লক্ষ্য করিলাম না। এমন সময়ে দেখিলাম একজন জীবিত লোককে সকলে মিলিয়া বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছে। আমি জানিতাম কোন কোন দেশে স্বামী মরিলে স্ত্রীকে সঙ্গে পোড়াইয়া মারা হয়; স্ত্রী মরিলে স্বামীকে অবশ্য পোড়াইয়া মারা হয় না—কারণ বেচারা তো বিবাহের পর হইতেই পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিলাম হয়তো এদেশে স্ত্রী মরিলে স্বামীকে সহমরণে যাইতে হয়—হয়তো বিবাহের সময় এমন কোন শর্ত থাকে। কিন্তু সে যাহা হোক, এখানে মৃত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি দেখিতে পাইলাম না।

তখন কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া এক-জনকে শুধাইলাম—মহাশয়, এ ব্যক্তিকে কেন পোড়াইয়া মারিতেছেন? আমার প্রশ্নে সে বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি বুঝি বিদেশী? আমি বলিলাম—আমি বিদেশী নাবিক, জাহাজ ডুবিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সে বলিল—তবে শুনুন, এ লোকটাকে পোড়াইয়া মারিবার কারণ ইহার চাকরি গিয়াছে! চাকরি গেলে মানুষের জীবনের আর কি সার্থকতা? তখন সে পুড়িয়া মরে—ইহাই এদেশের নিয়ম।···

সিন্ধবাদ অতিথিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বন্ধুগণ, এমন বিচিত্র দেশে বা এমন উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব জীবনে আমি কখনো শুনি নাই। অনেক

কারণে মানুষে আত্মনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু অকৃত্রিম একটা আদর্শের জন্য মানুষে যে আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারে—তাহা এই প্রথম শুনিলাম। আমি তাহাদের দেশের কথা আরও শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহারা আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই লোকটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে লাগিল; খই, ধান্য, মুদ্রা বর্ষণ করিতে থাকিল আর সেই লোকটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে বীরের মতো দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া কাঠকয়লায় পরিণত হইয়া গেল।

সিন্ধবাদ বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ, আশ্চর্য সে দেশের লোকের ব্যবস-বুদ্ধি! সেই কাঠকয়লা তখনি স্বর্ণকারেরা সেরদরে কিনিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিধাতার কি ন্যায়পরতা! যে লোকটা বাঁচিয়া থাকিতে যথেষ্ট স্বর্ণসঞ্চয় করিতে পারে নাই—তাহারই অঙ্গারীভূত দেহাবশেষ এখন রাশি রাশি স্বর্ণ গলিত করিবার কাজে লাগিবে। বিধাতার এমন বিচার আছে বলিয়াই এখনো পৃথিবীতে এত অন্যায়- অত্যাচার সত্ত্বেও লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে দলের একজন আমাকে বলিল—তুমি বিদেশী এখানে কোথায় থাকিবে? বরঞ্চ আমার সঙ্গে চলো। সেখানে আশ্রয় পাইবে, আর কৌতূহল যদি থাকে তো আমাদের দেশের রীতিনীতিও জানিতে পারিবে।

আমি হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলাম। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে লোকটি আমাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিল, নূতন পরিধেয় দিল, আহার্যে পরিতৃপ্ত করিল। প্রচুর বিশ্রাম করিয়া শরীর ও মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইলাম।

আমি লক্ষ্য করিলাম যে সকলেই সেই লোকটিকে বড়-দালানী বলিয়া ডাকিতেছে। আমিও তাহাকে বড়-দালানী বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

২

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রামের পরে বড়-দালালীর কাছে গিয়া বলিলাম—মহাশয়, এবারে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন, লোকটাকে আপনারা পোড়াইয়া মারিলেন কেন?

বড়-দালালী বলিল—আপনাকে গতকাল বলিয়াছি যে লোকটার চাকরি গিয়াছিল বলিয়াই সে পুড়িয়া মরিল। কেবল সে নয়, এদেশে যাহার চাকরি যায়—সে-ই পুড়িয়া মরে; ইহাই এদেশের শাস্ত্রের অনুশাসন।

আমি অবোধ তখনো চাকরির মহিমা ও তত্ত্ব জানিতাম না, তাই প্রশ্ন করিলাম—মহাশয়, চাকরি কি?

বড়-দালালী বলিল—আপনার প্রশ্ন অতিশয় জটিল, ব্যাপারটি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। অনাদিকাল হইতে সনাতন মুনিঋষিগণ ইহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে হাজার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কাজেই আমার মতো সামান্য লোক তাহা বুঝাইতে অক্ষম। তবে সংক্ষেপে বলিতে পারি আমাদের ধর্মের নামান্তর চাকরি। আর এই দেশের নাম চাকরিস্থান।

এই বলিয়া সে বিরাট একখানা মানচিত্র খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—এই যে বিরাট প্রাকৃতিক ত্রিভুজ দেখিতেছেন, ইহাই আমাদের দেশ। পশ্চিম-দিকের ওই অংশটার নাম কাঁচিস্থান, মাঝখানে ওই হিন্দুস্থান তার পূর্বদিগের এই অংশটার নাম চাকরিস্থান বা চাকরিস্তান।

আমি শুধাইলাম—আর ওই যে অংশটা অনশন-ক্লিষ্টের চিবুকের মত সূচ্যগ্র হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—উহার নাম কি?

বড়-দালালী বলিল—ওই অংশটার নাম কেরানীস্থান।

বড়-দালালী বলিয়া চলিল—আপনি যখন চাকরিস্তানে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন আপনাকেও শীঘ্র একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা আপনারও সমুদ্রতীরের লোকটির দশা হইবে।

আমি বলিলাম চাকরি করিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তো আমার নাই।

সে বলিল—চাকরিতে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। ইহা অনেকটা ভগবৎ-সাধনার মতো; বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু হয় না—নিষ্ঠাই আসল।

তখন আমি বলিলাম—এমন কি চাকরি আছে, যাহা বিত্তাবুদ্ধি ছাড়াও করা যায়?

বড়-দালানী বলিল—সব চাকরিই করা যায়, বিশেষভাবে এমন কয়েকটি আছে যাহাতে বিত্তাবুদ্ধি থাকিলেই অসুবিধা হয়।

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া থাকিলাম।

সে বলিয়া চলিল—পাঠ্যপুস্তক রচনা, পত্রিকার সম্পাদনা ও পাঠশালার শিক্ষকতার মধ্যে যে কোনটি আপনি গ্রহণ করিতে পারেন।

অতি অল্প বয়সে একসময়ে আমি মেষপালক ছিলাম, কাজেই পাঠশালার শিক্ষকতা সম্বন্ধে তখন হয়তো কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি; তাই বলিলাম, তবে আমাকে একটি শিক্ষকতা সংগ্রহ করিয়া দিন।

বড়-দালানী আমার অভিপ্রায় শুনিয়া খুশি হইলেন; বলিলেন— আপনার সঙ্কল্প সাধু—কারণ শিক্ষকতার মতো এমন পবিত্র ব্যবসায় আর নাই। স্বর্গের অমৃতের স্বাদ মর্তলোকে দিবার ভার আপনার হাতে থাকিবে; আপনি জাতি গঠন করিয়া তুলিবেন; দেশের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে; লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করিবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলে শিক্ষক শুনিয়া তাহারা বসিবার জন্য আপনাকে মোড়া অগ্রসর করিয়া দিবে; কিন্তু সাবধান আপনার দোকানদারের নিকটে কখনো যেন প্রকাশ করিবেন না আপনি শিক্ষক।

—কেন মহাশয়?

—এই অমূল্যরত্ন যাহারা দান করে লোকে প্রায়ই তাহাদিগকে মূল্য দিতে ভুলিয়া যায়। বেতন আপনি পাইবেন—খাতাপত্র হইতে গলিয়া কতটুকু এবং কবে আপনার হাতে আসিয়া পৌঁছিবে তাহা অনিশ্চিত।

আতঙ্কিত হইয়া শুধাইলাম—সে কি?

—ভীত হইবেন না। জীবিত থাকিতে যদি না পান—তবু জানিবেন আপনার শ্রাদ্ধের সময় নিশ্চয় পাইবেন।

তবু খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম।

বড়-দালানী বলিল—আপনাকে একটি উচ্চ-পাঠশালায় চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিব—সেখানে মাসান্তে না হোক বৎসরান্তে বেতন নিশ্চিত পাইবেন।

৩

এখন আমি একটি উচ্চ-পাঠশালার অধ্যাপক। দেখিলাম ইহাতে যাহা কিছু উচ্চতা তাহা ওই নামেই। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা কোন তরফ হইতেই উঠিল না। কোন তরফ এইজন্যে বলিলাম যে—পাঠশালার শিক্ষক-দের দুইদল কর্তা; একদল কর্তৃপক্ষ, অপর দল—ছাত্রগণ। ইহাদের মধ্যে কোন্ দল বেশি প্রবল বলিতে পারি না, বোধ করি শেষোক্ত দলই কিছু বেশি—কারণ তাহাদের মাহিনা দিবার কথা। মাহিনা দেয় এমন মিথ্যা বলিতে পারি না [পাঠশালা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে কেহ আমাদের ক্ষমা করে না; অন্যত্র যাহা খুশি হোক, তাহাতে আসে যায় না]; ছাত্রেরা কাগজপত্রে বেতন দেয়, কর্তৃপক্ষ আবার আমাদের কাগজপত্রে বেতন দেন। আমাদের কি করিয়া চলে? কেহ দর্জিগিরি করে, কেহ বাজার-সরকারী করে, কেহ পথ ঝাড়ু দেয়, আবার কেহ বা ক্ষেত-খামারের কাজ করে—গোরু তাড়ানো ভালোই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এইভাবে দেশের ছেলেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে; বর্তমানের কাদায় ডোবা, রথচক্র সবলে ঠেলিয়া লইয়া অদূরবর্তী স্বর্গের দিকেই নাকি আমরা চলিয়াছি। লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। সরকার আমাদের কাজে গৌরব অনুভব করিতেছে। ছাত্ররা বলে—স্যার খুব ভালো মানুষ [পার্সেণ্টেজ কাটেন না]; কর্তৃপক্ষ বলে—লোকটি খুব বিনয়ী [বেতন চাহেন না]। আমরা দুই ক্লাসের ফাঁকে অধ্যাপকদের কক্ষে বসিয়া পরস্পরের ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া দিই এবং গত বৎসরের শূন্য নস্যকৌটার মধ্যে আঙুল চালাইয়া দিয়া সবলে নস্য গ্রহণ করি।

বড়-দালানীর সাবধানবাণী ভুলি নাই—দোকানীর কাছে কখনো বলি নাই যে আমি শিক্ষকতারূপ পবিত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত।

মাঝে মাঝে জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে থাকি দশটার সময়ে অজস্র জনতা চাকরি-মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে—কেহ ট্রামে, কেহ বাসে, কেহ রিক্শায়, কেহ কেহ বা মোটরকারে; ওই লোকটা হাঁটিয়া চলিয়াছে কেন? ও কি অধ্যাপক নাকি? তাহাদের মুখে চোখে তীর্থযাত্রীর ব্যগ্রতা!

আবার দেখিলাম বেলা পাঁচটায় সকলে বাড়ি ফিরিতেছে—মুখে পরিতৃপ্তি, হাতে একজোড়া কপি, দেহে অবসাদ, পায়ে—না পায়ে তো জুতা নাই। তবে ও নিশ্চয় কোন এক উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপক।

এই রকম দেখিতে দেখিতে শূন্য উদরে পাকস্থলী যখন তীব্র মোচড়ে খাদ্যাগ্রহ করিয়া উঠিত চাকরকে বলিতাম—এক গেলাস জল দে। শুনিয়াছিলাম শহরের জলে অনেক সময়ে টাইফয়েডের বীজাণু থাকে, সেই ভরসায় অনেকবার জল পান করিতাম। [কিন্তু পাছে আমরা অকালে দেশকে ফাঁকি দিই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।] আর বীজাণু থাকিলেই বা কি? যে জঠরে এম. এ. পাসের বিদ্যা, প্রাত্যহিকী ক্ষুধা নিয়ত পরিপাক হইয়া যাইতেছে, সেখানে মূঢ় বীজাণু কি করিবে?

কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে দর্শনের অধ্যাপকের স্বর কানে আসিল —সক্রেটিস্…

এম. এ. পড়িবার সময়ে সক্রেটিস নামে একটা লোকের নাম শুনিয়াছিলাম। লোকটা 'হেমলক' পান করিয়া মরিয়াছিল কেন? লোকটা কি অধ্যাপক ছিল নাকি? আহা 'হেমলকের' ভরি কত? নিজের অগোচরে হাতখানা পকেটের মধ্যে গেল—ছিন্ন তলদেশ কোন বাধা দিল না। এ কি অধ্যাপকের পকেট কাটিল কে? তবে অধ্যাপকের চেয়েও অসহায় কেহ আছে নাকি? বোধ করি ইনস্যুর কোম্পানীর এজেন্ট! মরি, মরি বিধাতার কি আশ্চর্য বিধান। 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র, এ দেশ!'

আজ মাসের পয়লা। দেখিতে পাইতাম পথে স্ফীতবক্ষ [যাহা ভাবিতেছ পাঠক, তাহা নয়] জনতা বুকপকেটে নোটের তাড়া গুঁজিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। আমরাও কম কিসে? শূন্য মধুভাণ্ডের চতুর্দিকে মধুমক্ষিকার মতো অফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের চারদিকে বার কয়েক ঘুরিয়া হাতের খবরের কাগজখানা কয়েক ভাঁজ করিয়া বুক পকেটে রাখিয়া বুক ফুলাইয়া বাড়ি চলিলাম। পথে অন্য এক উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা— বেচারার মুখ শুষ্ক। সে বলিল—ইস্ বুকপকেট যে ফেটে যাবে—এক তাড়া নোট—আপনাদের ভাগ্য ভালো। ঈর্ষ্যায় বেচারার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

আমি অনুকম্পামিশ্রিত হাস্তে বলিলাম—হেঁ হেঁ! আপনাদের বুঝি—

সে বলিল—সাবধানে যাবেন—কেউ তুলে নিতে পারে।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম—Who steals my purse steals trash!

ধন্য ধন্য শেক্সপীয়ার। শুনিয়াছি তুমি Grammar School এর মাস্টার ছিলে—সেখানেও কি এই ব্যবস্থা ছিল নাকি?

সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; বলিলাম—চলুন এই পথে যাই সোজা হবে।

তিনি বলিলেন—না, না, ওখানে নয়।

—কেন?

—ওখানে একটা মুচি বসে তার ভয়ে।

শুধাইলাম সে আবার কি?

তখন তিনি নিজের জুতা জোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন—দেখুন না, তালি দিতে দিতে এর মৌলিক চামড়ার আর কোন চিহ্ন নাই। একদিন সারাইয়া দিবার জন্য তাহাকে বলাতে সে বলিল—ও জুতা সারাইবার বিদ্যা তাহার নাই। তাহার গুরুজি ছাপরা জিলায় আছে—সে পারে। এখন মুচিটা আমাকে দেখিলেই হাসে। তারপরে বলিলেন—চলুন ওই পথে যাই।

আমি বলিলাম—ও পথে মুদিটা আছে। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন দুইজনে ব্লাকআউটের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া রহিলাম। অন্ধকার ঘনীভূত হইলে গবর্নমেন্টের সামরিক ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দুইজনে নির্ভয়ে প্রস্থান করিলাম।

৪

এমনিভাবে দিন চলিতেছিল—এমন সময়ে একদিন খবর আসিল হনলুলু দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়াছে—তাহার তরঙ্গ নাকি চাকরিস্তানের রাজধানীতেও আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে।

তখন সে ছুটাছুটি! ছেলে-বুড়া, জোয়ান-মুমূর্ষু, তরুণ-তরল, স্ত্রী-কন্যা,

মেসো-পিসি, খুড়ো-খোঁড়া, পুত্র-পিতা, বোবা-রোগা, কালা-ধলা—যে যেদিকে পারিল ছুটিল। পাওনাদার পাওনা ছাড়িয়া ছুটিল, স্ত্রীলোক গয়না ফেলিয়া ছুটিল, গোয়ালা গাভী ফেলিয়া ছুটিল, ড্রাইভার পেট্রোল ছাড়িয়া ছুটিল, ডাক্তার রোগী ফেলিয়া ছুটিল, কবিরাজ হামান-দিস্তা ছাড়িয়া ছুটিল, স্বামী পরস্ত্রী লইয়া ছুটিল! কুলীরা যাত্রীর মাল লইয়া নিজের বাসার দিকে ছুটিল। তিন-দিনের মধ্যে রাজধানী জনশূন্য।

কেবল আমরা অতুচ্ছ হইতে নিম্নতম পাঠশালার শিক্ষকেরা শিবরাত্রির সলিতার মতো শহরে রহিয়া গেলাম। আশা ছিল ছাত্ররা ফিরিয়া আসিবে, আশা ছিল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, আশা ছিল গভর্নমেণ্ট 'কনসিডার' করিবেন, আশা ছিল হনলুলুব তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়া সকল সমস্যার শান্তি করিয়া দিবে। কিন্তু কেহই আসিল না। হায়, শিক্ষকদের সময় মতো মরিবার আশাও সফল হয় না।

আমরা যে বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকিব তার উপায় নাই—পাঠশালার ক্ষুধিত পাষাণে আমাদের গ্রাস করিয়াছে। এখন আমরা চাদর ও আশা গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া নিষ্কামভাবে পাঠশালায় আসি। শূন্য কক্ষে কক্ষে ছাদে কয়েকটি চামচিকা ও মেঝেতে কয়েকজন শিক্ষক—মাঝখানের শূন্য বেঞ্চিগুলিতে বসিয়া বসিয়া যাহারা ক্লাসের সময়ে গল্প করিত—এখন তাহারা হয়তো নেত্রকোণার আমবাগানে হা-ডু-ডু খেলিতেছে।

এমনিভাবে দিন যায়, ক্রমে মাসের পয়লা তারিখও আসে! আমার মুদির মুখমণ্ডল ক্রমশঃ মাড়োয়ারের মৃত্তিকাব বন্ধুরতাকেও ছাড়াইয়া যায়; রাষ্ট্রভাষা না শিখিয়া ভালোই করিয়াছি, সে যাহা বলে তাহার সবটা বুঝিতে পারি না—সবটা বুঝিবার দরকারও হয় না। গোয়ালা পঞ্চগব্যের মধ্যে নিকৃষ্টটার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া শাসায়। ধোপানী মেয়েটা এইবার লইয়া নিরানব্বইবার আসিল। সে সাত ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া রাগে ঘামিয়া নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি. গরগর করিয়া প্রস্থান করিল। আমি বসিয়া বসিয়া দেশের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যত ও আমার লোভনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে থাকি।

এমন সময়ে একদিন কি করিয়া পাড়ায় প্রকাশ হইয়া পড়িল আমি

উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপক! সংবাদটি যন্ত্রের মতো কাজ করিল। মুদি বাকিতে জিনিস দেওয়া বন্ধ করিল। গোয়ালা যাহা দিয়া গেল তাহা দুগ্ধ নয়। বন্ধুরা কথা বলা ছাড়িয়া দিল। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিল। চাকর ঘরের তালা ভাঙিয়া সরিয়া পড়িল। রাস্তার ধারে একদল ছেলে একটা কুকুরকে ঢিল মারিবার উদ্যোগ করিতেছিল—কুকুরটা দন্তভঙ্গী করিতেই তাহারা ভয় পাইল। এমন সময়ে আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল—ওই একটা মাস্টার যায়—ওকে মার। আমার দন্তভঙ্গী করিবার উপায় নাই—বাঁধানো দাঁত, ভাঙিয়া গেলে আর গড়িতে পারিব না, তাই ঢিল হজম করতঃ অবিবেচক বালকদের ক্ষমা করিয়া সরিয়া পড়িলাম। পাড়ায় আমি একঘরে হইলাম।

কয়েকদিন পরে রাজধানীর শিক্ষকদের নিখিল-চাকরিস্তান-উচ্চ পাঠশালা সমিতির অধিবেশন হইল। সেখানে স্থির হইল—শিক্ষকদের চাকরি যখন গিয়াছে তখন দেশের নিয়ম অনুসারে শীঘ্রই পুড়িয়া মরিতে হইবে। তাহার চেয়ে শিক্ষকেরা ঘোড়ার মাঠে যৌথভাবে যদি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে তবে দেশে একটা নৈতিক আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। দশ হাজার শিক্ষক ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় ঘোড়ার মাঠে গলায় দড়ি দিয়া মরা স্থির করিল।

ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে নষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না, কাজেই শিক্ষকদের দলত্যাগ করিয়া সব্যসাচীর মতো দাড়ি-গোঁফ লাগাইয়া আত্মগোপন করিলাম।

৫

শিক্ষকদের আত্মত্যাগ দেখিবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়ার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে কি জনতা! এতদিন তাহারা সিনেমাতে মৃত্যু দেখিয়াছে, আজ সশরীরে মৃত্যু দেখিবার লোভে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত। মাঝে পরিষ্কার জায়গায় সারি সারি লোহার দণ্ড; লোহার দণ্ডে দড়ি দিয়া মরিবে। ব্যবস্থার ত্রুটি নাই; স্বয়ং পৌরসভা ও গভর্নমেন্ট নাকি সহৃদয় হইয়া ব্যবস্থা

করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষকের দল আসিয়া হাজির হইল। ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, হাততালি পড়িল। শিক্ষকদের মুখে স্বর্গীয় ভাব—অস্থিদানের পূর্বে দধীচির মুখে অনেকটা এই রকম জ্যোতি দেখা গিয়াছিল।

পরম মুহূর্ত উপস্থিত হইল। দশ হাজার শিক্ষক গলায় দড়ি পরিয়া 'বিস্ময়ামৃতমগ্ন্ত্বে' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িল, যেন দশ হাজার কলার কাঁদি বাতাসে দুলিতে লাগিল। ওঃ জনতার মধ্যে সে কি উৎসাহ, সে কি আনন্দ, সে কি জয়ধ্বনি! ভিড়ের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—বাঃ স্যার বেশ গিয়েছেন, একসেলেণ্ট!

বাংলার অধ্যাপক নিতান্ত কৃশ ও লঘুকায়; ঝুলিয়া পড়িয়াও মরিতেছিল না; দয়াপরবশ হইয়া দু'জন লোক [বোধ করি ভূতপূর্ব ছাত্র] আসিয়া তাহার পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল—বাংলার অধ্যাপক সাধনোচিত স্থানে প্রস্থান করিল।

ইংরেজীর সাড়ে তিনমণি অধ্যাপক ঝুলিতে উদ্যত এমন সময়ে উৎসাহী একজন ছাত্র ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্যার, একটা suggestion দিয়ে যান; মিণ্টনের Lycidas কবিতার central idea কি?

কর্তব্যনিষ্ঠ সাড়ে তিনমণি ঝুলিয়া পড়িতে পড়িতে অর্ধোক্ত স্বরে বলিয়া ফেলিল—'এথ্'।

উৎসাহী ছাত্র বলিল—বুঝেছি স্যার—'ডেথ'।

দশ হাজার শিক্ষক মরিল। কে বলিল সভ্যতার অগ্রগতি হয় নাই? সেকালের একটা দধীচিকে লইয়া কত গৌরব—আর একালে দশ দশ হাজার দধীচি!

কিন্তু ইহার পরে যাহা ঘটিল তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একদল লোক, ছুরি লইয়া ছুটিয়া গিয়া শিক্ষকদের গলা হইতে দড়ি কাটিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমি পাশের একজনকে শুধাইলাম—ব্যাপার কি?

সে বলিল—উহারা নিখিল-চাকরিস্তান-মুমূর্ষু-রজ্জু-সংগ্রহ কোম্পানীর এজেন্ট। এই দড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিবে। ভাবিয়া দেখুন কত লাভ! প্রত্যেকের গলায় যদি দশ হাত দড়ি থাকে—তবে দশ হাজারে লক্ষ হাত। দড়ির বাজার যা চড়া! কোম্পানী বিনা মূলধনে বেশ দু' পয়সা কামাইবে।

কে বলিল চাকরিস্তানের লোকের ব্যবসা-বুদ্ধি নাই।

আমি সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাহ করিবার জন্য হুলিয়া হইয়াছে। আমি প্রাণভয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হইলাম, যদি কোন বিদেশী জাহাজ দেখি তো এ দেশ হইতে সরিয়া পড়িব। সমুদ্রের তীরে গিয়া দেখি একখানি জাহাজ রহিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি আমারই দ্বিতীয় জাহাজখানি। তাহার নাবিকেরা বলিল—ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহারা যবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হয়। আমার আশা তাহারা ছাড়িয়াই দিয়াছিল—এখন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি জাহাজে উঠিয়া কয়েকমাস সমুদ্রযাত্রার পরে বসোরায় ফিরিয়া আসিলাম।

সিন্ধবাদ তাহার কাহিনী শেষ করিয়া সমাগত অতিথিদিগকে অনেক ধনরত্ন দান করিয়া সেদিনের মতো বিদায় দিল; যাইবার সময়ে বলিল—আগামীবার তাহার দশমবার সমুদ্রভ্রমণের কাহিনী বলিতে চেষ্টা করিবে।

প্রফেসার রামমূর্তি

অবশেষে চাকরিটি গেল।

তারপর কি হইল? ইহাই কি যথেষ্ট নয়? বাঙ্গালীর জীবনে ইহার চেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আপনাদিগকে একেবারে হতাশ করিব না—তারপরেও কিছু ঘটিল। কিন্তু তার আগের কথা প্রথমে বলিয়া লই।

রামনাথবাবু প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক। 'প্রাইভেট কলেজ' কথাটা নিতান্ত স্বতোবিরুদ্ধ—ওরকম পাবলিক জিনিস আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কলেজের ঝাড়ুদার হইতে উচ্চতম ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই ইহার কর্তৃপক্ষ; এমন কি মাঝে মাঝে পথের পথিক ও ফিরিওয়ালা পর্যন্ত ঢুকিয়া শাসাইয়া যায়।

এহেন প্রাইভেট কলেজে রামনাথবাবু অধ্যাপক। আমার অনেক অধ্যাপক বন্ধু আছেন, তাঁহাদের খাতিরে রামনাথবাবুর বেতন কত সে কথাটা চাপিয়া

গেলাম; বেতন যাই হোক নামের আগে ইহারা অধ্যাপক ও প্রফেসার শব্দদ্বয় যোগ করিতে পারেন: ওই শব্দ দুটার এমনি মোহ যে, কৌশলে ব্যবহার করিতে পারিলে অর্থের মোহের প্রতিষেধকের কাজ করে, কলেজের কর্তৃপক্ষ ইহা সবিশেষ অবগত আছেন। লোকনিয়োগ করিবার সময়ে তাঁহারা হাসিয়া বলেন—এখন থেকে তো আপনি অধ্যাপক—মানে 'স্যালারি' যাই হোক্ না—

উভয়পক্ষ হাসিয়া ওঠেন—হেঁ হেঁ হেঁ…

এহেন অধ্যাপক রামনাথবাবু—চাদর কাঁধে ফেলিয়া প্রত্যহ কলেজে যান। অধ্যাপকের দল সর্বদা একখানা চাদর কেন সঙ্গে রাখে, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি; অবশেষে তাঁহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে কোন মুহূর্তে ইহাদিগকে নিকটতম ল্যাম্প পোস্টের সঙ্গে ঝুলিয়া পড়িতে হইতে পারে—তখন পাছে সরঞ্জামের অভাবে পড়িতে হয়—তাই এই ব্যবস্থা!

অধ্যাপকদের মধ্যে বলাবলি হয়—আমাদের মাইনে কম, কিন্তু ছুটি অনেক—

একজন বলে—তার মানে কি জানেন? কতৃপক্ষ জানে টাকা বেশি দিতে পারবে না, তাই সময় প্রচুর দিয়েছে যাতে ওই সময়ে আমরা কিছু কিছু ব্যবসা করতে পারি—

দর্শনের অধ্যাপক রসুনের ব্যবসা করিতে গিয়া ফেল পড়িয়াছেন, তিনি বলেন—ব্যবসা সকলের জন্য নয় হে! ব্যবসা আর বেদান্ত—ও দুটো বড় কঠিন জিনিস।

এমন সময় রামনাথবাবু ঘরে ঢোকেন।

সকলে বলেন—রামনাথবাবু আপনার মত কি?

তিনি ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলেন—ঘণ্টা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, ক্লাস আছে।

রেজেস্ট্রী লইয়া রামনাথবাবু ক্লাসের দিকে যান।

সকলে এমনভাবে ঘড়ির দিকে তাকান, যেন ঘড়িটা এইমাত্র দেখিলেন। মনে মনে রামনাথবাবুর উপরে বিরক্ত হইয়া সকলে উঠিয়া পড়েন।

একজন অস্ফুট স্বরে বলেন—এত শীগ্‌গির ক্লাসে গেলে ছেলেরা ডিমরালাইজড্‌ হয়ে পড়বে যে!

ব্যবসা ও বেদান্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ভূতপূর্ব রস্থনের ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এক ক্লাসে যাইতে আর এক ক্লাসে, আর এক ক্লাসে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের ক্লাসে গিয়া যখন উপস্থিত হন—তখন কেবল রেজেস্ট্রীমাত্র করিবার সময় থাকে!

ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই অতি কঠিন।

এ হেন কর্তব্যপরায়ণ রামনাথবাবুর চাকরি গেল। যাওয়া উচিত হয় নাই তাহা জানি, কিন্তু উচিতমতো কয়টা আজ এ সংসারে হইয়া থাকে?

রামনাথবাবুর দোষ কি? আমি তো কিছু দেখি না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিচারে চাকরির সেরা দোষ তিনি করিয়া বসিয়াছেন। রামনাথবাবুর বেতন-বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন!

কর্তৃপক্ষ বলিলেন—দেখি কি করা যায়।

সহকর্মীরা একবাক্যে বলিলেন—আস্পর্ধা দেখ!

তখন সকলে বিশ বছর পরে, আবিষ্কার করিয়া ফেলিল রামনাথবাবু অধ্যাপনার একান্ত অযোগ্য!

কর্তৃপক্ষ বলিলেন—উনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না—

মেজো কর্তৃপক্ষ বলিলেন—ওর গলার স্বর যথেষ্ট উঁচু নয়—

সেজো কর্তৃপক্ষ বলিলেন—ওঁর উচ্চারণ নেহাৎ সেকেলে—

সহকর্মীরা বলিলেন—সহকর্মী না হলে ওঁর সমস্ত দোষ খুলে বলতাম—

ভূতপূর্ব রস্থন ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নাকের দোনলা বন্দুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নস্যের বারুদ পুরিতে পুরিতে বলিলেন—ওর বাড়ির ঝির সঙ্গে আমার আলাপ আছে কিনা—তোমরা জেনে রেখো আর বেশি দিন নয়—

সকলে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

তিনি বলিলেন—এত সহজ নয়—

ব্যবসা ও বেদান্তে দুই-ই দুরূহ।

এইরূপে সকলের, কর্তৃপক্ষ হইতে ঝাড়ুদারের ঐক্যতানের ফলে রাম নাথবাবুর চাকরিটি গেল!

২

রামনাথবাবু মনের দুঃখে বনে গেলেন। এত স্থান থাকিতে বনে গেলেন কেন? কারণ প্রাইভেট কলেজগুলি এ সংসারের সীমান্তে স্থাপিত—তার পরেই বনের আরম্ভ! এই কলেজগুলিকে আধ্যাত্মিক শ্মশান বলিলেই চলে—এখানে আসিলে সবাই সমান। ছোট-বড়, ভালো-মন্দ, ধনী-নির্ধন, ছাত্র-অধ্যাপক কোন ভেদ এখানে নাই, আর অনির্বাণ যে চিতাগ্নি এখানে জ্বলিতেছে তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সরস্বতী নিরন্তর সহমরণে পুড়িতেছে!

আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি অধ্যাপকদের নিন্দা করিতে বসি নাই। এই আধ্যাত্মিক শ্মশানে মুর্দাফরাসের কাজ করিতে করিতে অধ্যাপকেরা প্রত্যেকে এক একজন হরিশ্চন্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহাদের গুণ বর্ণনার জন্যই কলম ধরিয়াছি। লোকের বিশ্বাস অধ্যাপকেরা ভালো মানুষ অর্থাৎ আত্মরক্ষায় অক্ষম; সত্যভীরু অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা কথা বলেন না; বদান্য অর্থাৎ জিনিস কিনিয়া নগদ দাম দেন; নিরীহ অর্থাৎ ছাত্রদের পার্সেন্টেজ ছাড়া আর কিছু কাটেন না; পক্ষপাতহীন অর্থাৎ দ্বিতীয়পক্ষ বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হ'ন না; উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ দোতলা বাড়িকে তেতলায় পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে; পণ্ডিত অর্থাৎ বোধোদয় ও ফার্স্ট বুক নিশ্চয় পড়িয়াছেন।

কিন্তু কেহ কি জানে অধ্যাপনা করিতে করিতে ইঁহারা কি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন? হাজার হাজার ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া যে বীরত্ব, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, রণকৌশল, বাগ্মিতা, কূটনীতি, সাহস, দুঃসাহস, প্রতিভা ইঁহারা প্রত্যহ দেখান তাহার ফলে অচিরকালের মধ্যে প্রত্যেকে যে যৌগিক ক্ষমতা লাভ করেন সংসারে তাহা যেমন দুর্লভ, তেমনি বিস্ময়কর।

এই গুপ্ত তথ্য কেহই জানে না, রামনাথবাবুও জানিতেন না। তিনি যখন বনে গেলেন ভাবিয়াছিলেন তাঁহার জীবন শেষ হইল—কেবল বিধাতা-পুরুষ জানিতেন এবারে নূতন জীবন আরম্ভ হইল!

বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তিনি দেখিলেন অদূরে একটি ভীষণ-দর্শন ব্যাঘ্র বসিয়া আছে—একেবারে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। রামনাথবাবু

বিচলিত হইলেন—বাঘ শিকারের আশায় লেজ আছড়াইতে লাগিল। রামনাথ-বাবু থামিলেন, বাঘ লাফ দিবার জন্য দেহ সঙ্কুচিত করিল; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দিল—আর ভীত-ত্রস্ত-ব্যাকুল-মুমূর্ষু রামনাথবাবুর মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে লক্ষবার উচ্চারিত অধ্যাপকদের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ছাত্রদের আতঙ্কস্বরূপ সেই বাক্য বাহির হইয়া পড়িল—হোয়াটস্ ইওর রোল?

রামনাথবাবু তারপরে কি হইল আর জানেন না—যখন মূর্ছা ভাঙিল তখন দেখিলেন, তিনি শায়িত আর সেই ভীষণ বাঘটা তাঁহার পায়ের তলায় নিরীহ বিড়ালের মতো পড়িয়া আছে!

ব্যাপার কি? এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? বাঘটাকে দেখিয়া তিনি যত ভীত হইলেন, বাঘটা তাঁহাকে দেখিয়া তার চেয়ে বেশি ভীত হইল! আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তাঁহার মনে হইল এতকাল অধ্যাপনা করিতে গিয়া নিশ্চয়ই কোন আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, যাহার ফলে বাঘ তাঁহার বশ হইয়াছে! না হইবেই বা কেন? বাংলাদেশের বাঘের চেয়ে সাহসী ছাত্রগণ যাঁহার বশীভূত, বাঘ তাঁহার কাছে কোন্ ছার!

তখন রামনাথবাবুর বাঘটার গলায় চাদর বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

ইহার পরে গল্প সংক্ষিপ্ত।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক রামনাথ চক্রবর্তী এখন বিখ্যাত প্রফেসার রামমূর্তি! তিনি সার্কাস পার্টি খুলিয়াছেন। সার্কাসের অন্যান্য খেলা শেষ হইলে তিনি একাকী নিরস্ত্র বন্য বাঘের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেন, দুর্দান্ত বাঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দেয়, তিনি দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলিয়া জিজ্ঞাসা করেন—হোয়াটস্ ইওর রোল? আমার সেই উদ্যত বাঘটা মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ঠপ্ করিয়া পড়িয়া যায়। ভীত দর্শকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাততালি দিয়া উঠে।

কলেজের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে 'পাস' চাহিয়া পাঠান, রামনাথবাবু 'মহৎ প্রতিহিংসায়' অনুপ্রাণিত হইয়া 'পাস' পাঠাইয়া দেন। ভূতপূর্ব সহ-কর্মীরা আসিলে প্রথম শ্রেণীর আসনে বসিতে পায়। রস্কিন-দর্শন-বিজয়ী সেই অধ্যাপক সেই ব্যবসায়ে ঢুকিবার জন্য আবেদন করিয়া ছিলেন; রামনাথ-বাবু বলিয়াছেন—ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই বড় দুরূহ।

প্রফেসার রামমূর্তি আজ ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি; তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মীরা অবসর সময়ে অর্থাৎ ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন।

কেবল দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এই আলোচনায় যোগ দেন না, তিনি তখন নিজের নাকের দোনলা বন্দুকে পরের নস্তের বারুদ নীরবে বসিয়া পুরিতে থাকেন।

আধ্যাত্মিক ধোপা

পলাশপুরের যদুবাবুর ছোট ছেলেটি এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। বন্ধুরা যদুবাবুকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—ছেলেকে পড়াও।

যদুবাবু দেয়ালে পতঙ্গের পশ্চাতে ধাববান টিকটিকির লেজটির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—টাকা কোথায়?

বন্ধুরা বলিলেন—টাকা? সেজন্য ভাবলে চলবে না; জোতব্রহ্মত্র বেচে পড়াও; ঘটিবাটি বাঁধা রেখে পড়াও; সুদে আসলে উঠে আসবে; এ তো একেবারে 'সিওর উইন'।

উপদেশ দিয়া এবং টাকাপয়সার উপায় না দিয়া বন্ধুরা প্রস্থান করিল। যদুবাবু বাড়ির ঘটিবাটির মানসাঙ্ক কষিতে লাগিলেন। টিকটিকিটা মাছিটাকে ধরিয়া প্রায় গ্রাস করিয়াছে।

বিকালবেলা যদুবাবুর নামে এক গোছা চিঠি আসিল। বন্ধুর শুধাইল—কিহে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নাকি? ওটা মন্দ উপায় নয়, বিয়ে দিয়ে সেই টাকায় পড়াও।

বিবাহের সম্বন্ধ নয়। কলিকাতার পাঁচ-সাতটি কলেজ হইতে এবং মফঃস্বলের আটদশটি কলেজ হইতে যদুবাবুকে অভিনন্দন করিয়া পত্র আসিয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষেরা যদুবাবুকে নমস্কারান্তে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমানের অভূতপূর্ব কৃতিত্বে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে; তাঁহারা শ্রীমানকে পড়াইবার বার ভার পাইলে গৌরববোধ করিবেন, ইত্যাদি। সর্বশেষে উল্লেখ আছে

যে, শ্রীমান তাঁহাদের কলেজে ভর্তি হইলে টাকাপয়সার চিন্তা যদুবাবুকে করিতে হইবে না।

যদুবাবু কলিকাতার কুলীন কলেজের পত্রগুলি রাখিয়া মফস্বলের পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যদুবাবুর তৈজসপত্র এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

বন্ধুরা বলিলেন—কলেজগুলো প্রথমে যাচাই করে নিয়ো—কে কি দিতে চায় দেখে ভর্তি ক'রো, নইলে ঠকে মরবে।

বন্ধুরা যদুবাবুকে চিনিতে পারে নাই—নতুবা অস্থানে এমন উপদেশ দিত না।

তারপরে একদা শুভদিন দেখিয়া সপুত্রক যদুবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

২

শিয়ালদহ স্টেশনে নামিতেই হোটেলের চাপরাশধারী আরদালীর মতো একপাল লোক যদুবাবু ও তাঁর পুত্রের উপরে আসিয়া পড়িল।

যদুবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমরা হোটেলে উঠবো না।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—হোটেল কোথায়? আমরা কলেজের লোক; দেখছেন না আমার চাপরাশে লেখা আছে বজ্রবাহু কলেজ। কেমন চকচকে চাপরাশ দেখছেন!

আর একজন তাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ওর চাপরাশ চকচকে মানে কি জানেন? নূতন কলেজ! আমার চাপরাশে দেখুন মরচে ধরছে, মানে বনেদী কলেজ, বীরবাহু কলেজের নাম শোনেন নি! বাংলাদেশের বারো আনা গ্র্যাজুয়েট এই কলেজ থেকে বেরিয়েছে।

বজ্রবাহু হটিবার লোক নয়। সে বলিল—ওদের কলেজ নয়, হাট; ওখানে কি পড়া হয়, রামচন্দ্র! আমাদের কলেজে সাতজন প্রফেসার পি-এইচ. ডি, পনর জন পি. আর. এস, বার জন গোল্ড মেডালিস্ট; ছাব্বিশ জনের কলকাতায় বাড়ি আছে—আর পঁয়ত্রিশ জনের ওজন আড়াই মণের উপর।

বীরবাহু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিদ্যা হচ্ছে মাথার জিনিস—ওজন দিয়ে কি হবে?

বজ্রবাহু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ওজন দিয়ে কি হবে—শুনুন একবার কথা! আমাদের কলেজের প্রফেসাররা মোটা মাইনে পায়, খায় দায় ভালো, তাই মোটা হয়েছে।

তারপরে সে গলার স্বর নামাইয়া বলিল—জানেন স্যার, ওদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মৃগীরোগ আছে।

বীরবাহু প্রটেস্ট করিবার আগেই যদুবাবু বলিলেন—তাতে আমার কি ক্ষতি?

বজ্রবাহু একটি ছাত্রমোহন হাসি হাসিয়া বলিল—ক্ষতি এই যে ওদের কলেজের প্রফেসারেরা চাকরি রাখবার জন্য মাঝে মাঝে মূর্ছা যায়। বুঝলেন না স্যার, প্রিন্সিপালের মৃগীরোগ থাকাতে কে কতবার মূর্ছা যায় সেই হিসাবে ওদের মাইনে বাড়ে। এখন আপনি বিচক্ষণ লোক বিবেচনা করে দেখুন, প্রফেসারেরা মূর্ছা গেলে ছাত্র পড়াবে কখন?

এমন সময় 'ভারতবন্ধু' কলেজ অগ্রসর হইয়া বলিল—স্যার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমাদের কলেজে যারা চাকরি পায় না, তারাই ওসব কলেজে যায়।

যদুবাবু বলিলেন—আপনারা এখন যান, আমি বিবেচনা করে যেখানে খুশি যাবো।

ইহা শুনিয়া তিনজনেই সমস্বরে বলিল—এ তো ঠিক কথা—উনি বিবেচনা করে যাবেন।

এই বলিয়া তিনজনে পিতা-পুত্রকে ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল।

'বীরবাহু' পিতাকে ধরিল, 'ভারতবন্ধু' পুত্রের হাত ধরিল, 'বজ্রবাহু' একেবারে শিকড় ধরিল অর্থাৎ পুত্রের দুই পা শক্ত করিয়া ধরিল। 'ভারত-বন্ধু' হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, বিষম টানে তার জামা খুলিয়া 'ভারতবন্ধুর' হাতে চলিয়া আসিল।

পুত্র কাঁদিয়া উঠিল—বাবা, আমার পিরাণ।

'বজ্রবাহু' অমনি পকেট হইতে একমুঠ লজেঞ্চুস বাহির করিয়া তাহার

মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল—খোকা, কেঁদো না, তোমাকে সিল্কের জামা তৈরী করে দেবো।

এই বলিয়া পুত্রকে কাঁধে ফেলিয়া সতীদেহবাহী পাগল মহাদেবের মতো দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল। অগত্যা যদুবাবুও সেই ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

'ভারতবন্ধু' পুত্রের জামা ও 'বীরবাহু' পিতার সুটকেস লইয়া প্রস্থান করিল।

যদুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে 'বজ্রবাহু' হাসিয়া বলিল—সেজন্য চিন্তা করবেন না, সময়মতো সব ফিরে পাবেন।

ট্যাক্সি ছুটিল।

৩

বজ্রবাহু কলেজে এডমিশন বোর্ড বসিয়াছে। ছোট একটি ঘর, আল-মারীর প্রাচীর সাজাইয়া সেটাকে ক্ষুদ্রতর করিয়া তোলা হইয়াছে। মাঝখানে একখানা বনেদী টেবিল অর্থাৎ অতিশয় পুরাতন ও জীর্ণ; চারপাশে কতকগুলি সজীব চেয়ার অর্থাৎ ছারপোকা-অধ্যুষিত; মাথার উপরে বিদ্যুতের পাখা এবং সেই পাখার নিচে এডমিশন বোর্ডের মেম্বারদের মাথা। মেম্বারগণ সেই সব সজীব চেয়ারে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তির মতো উপবিষ্ট।

সবচেয়ে ভালো গদি-আঁটা চেয়ারে যদুবাবু বসিয়া আছেন। তিনি পকেট হইতে একটি মরিচাধরা টিনের বাক্স বাহির করিয়া একটি বিড়ি বাহির করিলেন। অমনি 'এডমিশন বোর্ড' সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই যিনি বজ্রবাহু কলেজের এজেন্ট সাজিয়া স্টেশনে গিয়াছিলেন—এখন তিনি ভাগলপুরী সিল্কের জামা-চাদরে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বেশে একখানি চেয়ারে আসীন। তিনি অর্থাৎ ভূমণ্ডলবাবু (পাঠক, আমি কি করিব, ওটা তাঁর পিতৃদত্ত নাম; পিতৃদত্ত নামের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য দরজির বিল বাড়াইয়াও ক্রমশঃ তিনি ভূয়িষ্ঠ হইতেছেন।) একটি সিগারেটের বাক্স যদু-বাবুর সম্মুখে আগাইয়া দিলেন। যদুবাবু নিজের টিনের বাক্স হইতে বিড়িগুলি

বাহির করিয়া বাক্সের সব কয়টা সিগারেট তার মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া একটি ধরাইলেন।

যদুবাবু ইঙ্গিতে পাখা বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলবাবু শুধাইলেন—স্যার, পাখা বন্ধ কেন?

যদুবাবু বলিলেন—নইলে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়—পয়সা নষ্ট করে কি লাভ!

যদুবাবু যেন নিজের পয়সাতে কেনা সিগারেট টানিতেছেন! যদুবাবু জুন মাসের দুপুরবেলার বন্ধঘরে সিগারেট টানিতে লাগিলেন, আর বজ্রবাহু কলেজের এডমিশন বোর্ড বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এতকাণ্ড যার জন্য যদুবাবুর সেই পুত্রটি কোথায়? মধু (যদুর পুত্র যে মধু হইবে ইহা জানিবার জন্য আশা করি মিলজ্ঞ কবি হইবার প্রয়োজন নাই) এখন রাহুগ্রস্ত শশিকলার মতো কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্রোড়ে আসীন।

সুপার (ওটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সংক্ষেপ—তাঁহার মাহিনা না কমাইয়াও কথাটাকে ছোট করিতে পারি!) শুধাইলেন—আচ্ছা বাবা, তোমাদের বাড়ির উত্তর দিকে একটা উঁচু টিলা আছে, নয়?

মধু বলিল—কই, না। উত্তর দিকে তো ধানক্ষেত।

সুপার বলিলেন—তারপরে?

মধু বলিল—তার পরে তো বিল।

সুপার বলিলেন—তারপরে?

মধু ভাবিয়া পাইল না তারপরে কি?

সুপার দুই চোখে স্নেহবৃষ্টি করিয়া বলিলেন—কেন? হিমালয় পর্বতের কথা পড়নি?

মধু প্রবেশিকায় প্রথম হইয়াছে, সে বলিল—সে তো ভারতবর্ষের উত্তর দিকে।

সুপার হাসিয়া বলিলেন—তবেই তোমার বাড়ির উত্তর দিকে হলো।

মধু তাঁহার বিদ্যার পরিধি দেখিয়া বিস্মিততর হইল—আগেই তাঁহার উদরের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে যদুবাবুর ধূমপান শেষ হইয়াছে, পাখা আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এডমিশন বোর্ডের কপালের ঘাম ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে।

তখন যদুবাবু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পকেট হইতে এক-খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। চশমাটাকে ভালো করিয়া মুছিয়া নাকের খাঁজে বসাইয়া বলিলেন—তা হলে কি কি দিচ্ছেন?

সুপার তখন পুত্রকে ছাড়িয়া পিতার দিকে মন দিলেন।

তিনি বলিলেন—জানেন তো স্যার, কবীর সাহেব কি বলেছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদবতাওয়ে,
জ্ঞান কর উপদেশ,
তব্‌ কয়লা কি ময়লা ছোড়ে,
যব্‌ আগ্‌ কর পরবেশ।"

এই বলিয়া তিনি তাঁর দুটি চোখকে দুটি সন্ধানী বাতির মতো যদুবাবুর চিত্তাকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—অতর্কিত প্রতিকূলভাবের বিমান আসিবামাত্র যাহাতে ধরা পড়ে।

তাঁর চোখের চশমার একটা খোপে কাঁচ আছে আর একটা শূন্য; এক চোখে হাসি পিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত, অন্য চোখে জল ফোঁটা ফোঁটা পুত্রের মাথায় পড়িতেছে; এক চোখে দয়া, অন্য চোখে ধিক্কার; এক চোখ চাকোরের মতো সুধা প্রার্থনারত, আর এক চোখে চাতকের মতো তৃষ্ণায় বুকফাটা; এক চোখে শিব আর এক চোখে শিবাণী। এইরূপে যুগল চোখের হরগৌরী-দৃষ্টি যদুবাবুর দিকে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পাঁচ মিনিট ধরিয়া রহিলেন।

অন্তদিকে 'এডমিশন বোর্ড' আশা-আশঙ্কায় দণ্ড পল গুণিতে লাগিলেন। এডমিশন বোর্ডের নিকট সুপারের ওই দৃষ্টি কলেজের জাতীয় সম্পত্তি—কত আসন্ন বিপদ যে ওই দৃষ্টিতে কাটিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। একবার জাঁদরেল এক D. P. I. কলেজ পর্যবেক্ষণে আসিয়া কি একটা গলদ যেন ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ওই দৃষ্টি তাঁহার উপরে গিয়া পড়িল—সাহেব টলিতে টলিতে মোটরে গিয়া উঠিলেন—কথাটি পর্যন্ত বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

পাঁচ মিনিট ঘর নিস্তব্ধ।

কিন্তু হায়, জগতে অজেয় বোধ করি কিছুই নাই। যদুবাবু কিনা বলিয়া উঠিলেন—ওসব তো বুঝলাম. বিকালবেলা ফল খাবার জন্তে মাসে গোটা দশেক টাকা দিতেই হবে। বুঝলেন না, ফ্রুলের রস খেলে তবে তো মাথা ঠিক থাকবে।

হা হতোস্মি! এডমিশন বোর্ডের মেম্বারদের সমতালে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—আর সেই সমবেত নিঃশ্বাসের বাতাসের দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারখানা কাঁপিয়া উঠিয়া ছবির মেয়েটার মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি ফুটিল।

আর এই পরাজয়ে সুপারের আত্মগ্লানির চেয়ে শাস্ত্রগ্লানি অধিকতর হইল। তবে কি শাস্ত্র অভ্রান্ত নয়? নতুবা এদৃষ্টি তো ব্যর্থ হইবার নয়! বাড়ি ফিরিয়া একবার ঘেরণ্ড সংহিতাখানা দেখিতে হইবে—আর অমনি গুরুঠাকুরকেও প্রণামী পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৪

পাঠক, ব্যাপার আর কিছুই নয়! আজ সেই বেলা দশটা হইতে—এখন বেলা পাঁচটা, এডমিশন বোর্ডের দরকষাকষি চলিতেছে। যদুবাবু বলিয়াছেন নিম্নলিখিতরূপ টাকা ও সুবিধা পাইলে তিনি মধুকে (যে অচিরকালের মধ্যে বঙ্গদেশের মুখোজ্জল করিবে) বজ্রবাহু কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে পারেন!

(ক) মাসিক বৃত্তি—৩০৲ টাকা।

(খ) বই কিনিবার জন্য এককালীন—৯৩।৶০ আনা।

(গ) নূতন ধুতি জামা খরিদের জন্য—৫৩।০ আনা।

(ঘ) শিয়ালদহ স্টেশনে জিনিসপত্র খোয়া গিয়াছে, তার ক্ষতিপূরণ—১৫০৷৵৫ আনা।

(ঙ) যদুবাবুর একবারের যাতায়াতের খরচ—১৩।০ আনা।

(চ) যদুবাবুর মাসে একবার করিয়া পুত্রকে দেখিতে আসিবার যাতায়াতী খরচ—ঐ।

(ছ) পুত্রের মাসিক হাতখরচ—১২৷৷০ আনা।

(জ) পিতার মাসিক কলিকাতায় আসাকালীন হোটেল খরচ দৈনিক ২।০ আনা হিসাবে।

(ঝ) মধুকে গ্রীষ্মাবকাশে দার্জিলিংএ এক মাস থাকিবার খরচ—১৫০৲।

(ঞ) ঐ যাতায়াতী খরচ—নূতন টাইমটেব্‌লে যে ভাড়া লিখিত থাকিবে তাহা।

(ট) পূজাবকাশে মধুকে পুরীতে একমাস রাখিবার খরচ ১৫০৲ টাকা।

(ঠ) তথায় যাতায়াতী ভাড়া—(ঞ) ধারায় লিখিত মতো।

(ড) বড়দিনের ছুটিতে ভারতবর্ষে cultural tour করিবার খরচ ২৫০৲ টাকা।

(ঢ) যদুবাবুর সম্মানার্থ গরদের ধুতি চাদর এক জোড়া—২২৷৷০ আনা।

(ণ) মধুর বিকালবেলা ফল খাইবার বাবদ মাসিক ১০৲ টাকা।

এডমিশন বোর্ড ভাবিতেছেন—বাপ্‌রে কত লম্বা ফর্দ!

যদুবাবু মনে মনে আক্ষেপ করিতেছেন—বর্ণমালার এখনো অনেকগুলি অক্ষর বাকি রহিয়া গেল।

গোলমাল বাধিয়াছে—মূর্দ্ধন্য ণকে লইয়া।

ভূমণ্ডলবাবু বলিলেন—স্যার, লেটেস্ট ওপিনিয়ন হচ্ছে যে, ফল খাওয়াটা শরীরের পক্ষে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়।

যদুবাবু কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা সচিত্র খাদ্যতত্ত্ব বাহির করিয়া বিশেষ একটা অধ্যায় খুলিয়া ভূমণ্ডলবাবুর হাতে দিলেন; বলিলেন—পড়ে দেখুন।

ভূমণ্ডলবাবু সচিত্র খাদ্যতত্ত্বের 'ফলাহার' অধ্যায় পড়িতে লাগিলেন।

যদুবাবু বলিলেন—বুঝলেন, এ এমন বেশি কিছু নয়, 'ভারতবন্ধু' কলেজ এমন কি খেন্তির বিবাহের সাহায্যবাবদও কিছু দিতে স্বীকার করেছিলেন।

তারপরে টীকা করিয়া বলিলেন—খেন্তি আমার ছোট মেয়ে। টীকার কোন প্রয়োজন ছিল না।—কিন্তু আমি ওখানে দিতে রাজী নই। ওখানে মেয়েরা পড়ে কিনা। জানেন তো ঘি আর আগুন—অর্থাৎ—

এই পর্যন্ত বলিয়া বিস্মৃত যৌবনের একটা মরচে-ধরা হাসি নিক্ষেপ

করিয়া ভূমণ্ডলবাবুকে বলিলেন—আমরাও তো এক সময়ে যুবক ছিলাম—কি বলেন ?

ভূমণ্ডলবাবু তখন কমলালেবুর গুণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি মুখ তুলিয়া শুধাইলেন—কি ?

যদুবাবু কিঞ্চিৎ ভুল করিয়াছেন। ভূমণ্ডলবাবু কখনো যুবক ছিলেন না। তিনি জন্মিয়াই মাস্টার—যাঁহারা জাত মাস্টার তাঁহাদের কাছে জীবনের চরম বিভাগ সিনিয়র ও জুনিয়ার; যৌবন, বার্ধক্য—ও সব কেবল মায়া।

জগতে এমন সহিষ্ণুতা নাই, যাহা অসীম; এডমিশন বোর্ডের সভ্যরা মাস্টার হইলেও সজীব চেয়ারের তীব্র আক্রমণে তাঁহাদের ধৈর্য নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। কর্ণ নাকি বজ্র-বৃশ্চিকের দংশন সহ্য করিয়াছিল, ছারপোকার আক্রমণ তাহাকে সহিতে হয় নাই—নতুবা মহাভারতের গতি অন্য রকম হইত !

এডমিশন বোর্ড যদুবাবুর 15 points স্বীকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তারপরে জলখাবার আসিল। যদুবাবু নিজের প্লেট শেষ করিয়া একে একে মেম্বারদের সকলের প্লেট শেষ করিয়া কেবল ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলি বাদ রাখিয়া (যদুবাবু আবার নিরামিষাশী, তাই বোধ করি সজীব টেবিল-চেয়ার এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল) উঠিয়া পড়িলেন। আর এডমিশন বোর্ড নিস্তব্ধ বিস্ময়ে যদুবাবুর great hunger লক্ষ্য করিয়া নিজেদের বর্তমান ও মধুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন !

সকলে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছেন—এমন সময়ে টেবিলের নিচ হইতে একটা সুবৃহৎ কুকুর বাহির হইয়া ছুটিয়া পালাইল।

একজন বলিল—ইস্, কত বড় কুকুর !

আর একজন বলিল—কি রকম লোম—যেন বিলিতি কম্বল !

তাঁহারা অন্য এক ঘরে গিয়া দেখিতে পাইলেন পাঁচ-সাত শত ছেলে কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আট-দশ জন কেরানী টেবিলে কি লিখিয়া চলিয়াছে। যদুবাবুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিল।

ভূমণ্ডলবাবু বলিলেন—এরা আমাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ পয়সা দিয়ে পড়বে।

আর যে ঘরে আমরা ছিলাম, সে ঘরে সব সরস্বতী অর্থাৎ ভালো ছেলের দল—যারা পড়বে অথচ পয়সা দেবে না।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া যদুবাবু বাসায় ফিরিয়া আসিলেন

৫

গভীর নিশীথে যদুবাবুর ঘরের দরজায় টোকা পড়িল। তিনি দরজা খুলিয়া দিতেই 'বীরবাহু' প্রবেশ করিলেন।

'বীরবাহু' বলিলেন—স্যার, আমরা কিন্তু 'ফ' পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন—তার মানে?

'বীরবাহু' বলিলেন—ওরা 'ণ' পর্যন্ত concession দিয়েছে, আমরা তার পরে আরও কয়েক দফা জুড়ে দিয়ে 'ফ' পর্যন্ত যেতে সম্মত আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন—আপনি 'ণ'র কথা কি করে জানলেন?

এবারে 'বীরবাহু' হাসিলেন। দুর্যোধনের মুকুট ছলনা করিয়া লইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির বোধ হয় এমনি করিয়া হাসিয়াছিল!

'বীরবাহু' বলিলেন—কুকুরটা দেখেছিলেন?

যদুবাবু বলিলেন—হাঁ।

'বীরবাহু' বলিলেন—আমিই সেই কুকুর।

যদুবাবু বিস্ময়ের মুখ-ব্যাদানকে একটি হাই তোলাতে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

—তবে বলি, শুনুন স্যার, ওরা কি কি concession দেবে জানবার জন্য আমি কাল রাত্রে একটা কুকুরের মেক-আপ করে গোপনে গিয়ে, টেবিলের নিচে বসেছিলাম—সব শুনে ফেলেছি।

যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু কুকুর সাজলেন কি করে?

'বীরবাহু' বলিলেন—আজকাল সিনেমার যুগে মেক-আপের কত উন্নতি হয়েছে। তা' ছাড়া এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন? মানুষের কুকুর সাজা তো সহজ! কত কুকুর মেক-আপের জোরে মানুষ বলে চলে যাচ্ছে।

যত্নবাবু বলিলেন--তা না হয় হলো! কিন্তু আপনারা শিক্ষক, আপনাদের এই নিচ কাজ কি করা উচিত? আপনাদের উপরে ভার জাতিগঠনের-

জাতিগঠনের কথা শুনিয়া 'বীরবাহু' সেই জুন মাসের গভীররাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যত্নবাবু বলিলেন—কাঁদছেন কেন?

'বীরবাহু' বলিলেন বড় দুঃখে! তবে শুনুন এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

জাতিগঠন কেউ চায় না—সকলেই চায় নিজের নিজের স্বার্থ। গভর্ণমেণ্ট চায় মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে, লীডারেরা চায় নিজের দল বজায় রাখতে, সাংবাদিক চায় কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা ঠিক রাখতে, দেশের লোকে চায়—কি চায় জানি না, বোধ করি বিনা হাঙ্গামায় জীবনযাপন করতে! কারো উপরে কোন ভার নেই—কারো কোন দায়িত্ব নেই—সব ভার এই মাস্টারদের উপর?

যত্নবাবু বলিলেন—আপনারা যা পারেন—করুন না!

'বীরবাহু' বলিলেন—না, ও রকম করে কিছু হয় না, হবার নয়। যে-ভার সকলে চেষ্টা করলে তবে বহন করা সম্ভব তা কেবল মাস্টারদের উপর ছেড়ে দিলে কেন চলবে? আর সমাজে আমাদের কি কোন মর্যাদা আছে? আমরা মন্ত্রী নই, লীডার নই, সাংবাদিক নই, খেলোয়াড় নই, সিনেমা-স্টার নই—এমন কি ছাত্রও নই।

গভর্নমেণ্টের আমরা চক্ষুশূল, যেহেতু আমাদের জন্যই নাকি দেশে শিক্ষিতের (!) সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। লীডারেরা আমাদের ঘৃণা করে, সাংবাদিকরা আমাদের কৃপা করে, অভিভাবকেরা (মাহিনা না জানা পর্যন্ত) আমাদের সম্মান করে; আর ছাত্ররা আমদের উপর এমন নিষ্করুণ যে, পরিপূর্ণ ধর্মঘটের দিনেও সব ছেলে ক্লাস ছেড়ে যায় না। দুই-চারজনের জন্য পূর্ণোদ্যমে আমাদের চীৎকার করে যেতে হয়, আর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখেন তা এই অন্ধকারে বলতেও সাহস হচ্ছে না। কেবল যখন মাহিনা বাড়াবার কথা বলি, তখন শুনি—এ প্রতিষ্ঠান নাকি আমাদেরই! আমাদের বেতন এতই কম যে, নিজের স্ত্রীর কাছেও বলতে লজ্জা বোধ

করে! পেটে ক্ষুধা নিয়ে কি জাতিগঠন করা যায়? যারা নিজের উদরান্ন সংস্থান করতে অক্ষম, দেশের লোক তাদের উপর জাতিগঠনের ভার দিয়েছে। কি ভণ্ডামি! দেশের লোকের ভাবটা এই রকম যে, আমরা নিজের নিজের উন্নতি করি—তোমরা দুপুরবেলা আমাদের ছেলেমেয়েকে পড়াবার ছলে কলেজে আটকে রাখো—যেন তারা ট্রাম-বাস চাপা না পড়ে।

আমরা উদরান্নের জন্য কেউ দর্জির দোকান করি, কেউ বড়লোকের বাড়ি ম্যানেজারি করি, কেউ ওকালতি করি, কেউ গরুর রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের গোরুর ঘাস নিজেই কাটি, আর যারা প্রাইভেট টিউশনের নামে ছাত্রের পিতার হাটবাজার করে তারা তো আমাদের মধ্যে নিতান্ত সাত্ত্বিক। দেশশুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর—আমরা আধ্যাত্মিক ধোপা! এত ফাঁকি বিধাতা কি ভাবে সহ্য করবেন।...

এই বলিয়া তিনি কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন—যেন বিধাতা ওখানে টিকটিকির মতো ছাদে লেপ্‌টিয়া বিরাজ করিতেছেন।

যন্ত্রবাবু বলিলেন—যা বলছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু আপনাদের কলেজে তো এমন রেষারেষি থাকা উচিত নয়!

উচিত নয় বুঝি!—'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু ক্ষুধিতের কি তত্ত্বজ্ঞান আছে? ছাত্রসংখ্যার উপরে যেখানে মাস্টারদের বেতন নির্ভর করে—সেখানে কাণ্ডজ্ঞান, ভদ্রতা, সৌজন্য—এসব কথা বাতুলতা মাত্র! একটি ছাত্রকে যদি ভালো করে পাস করাতে পারি, তা দেখে হাজার হাজার ছাত্র আসবে, দেওয়ালীর রাতের পতঙ্গের মতো একটি উজ্জ্বল দীপশিখাকে লক্ষ্য করে। এসব উচিত নয়, অন্যায় অনৈতিক সবই জানি। কিন্তু ক্ষুধা যে নিয়মিত দুই বেলা পায়; আসন্ন বিবাহ-যোগ্য মেয়ের বয়স যে দাড়ির মতো বিনা সাধনাতেই বেড়ে চলে, পুত্রকন্যার কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যুভীতির চেয়ে অর্থচিন্তা প্রবলতর হয়। আর কিছুদিন বাদে দেখবেন চা-বাগানের আড়কাঠির মতো কলেজের এজেন্ট দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দাদন করে আসবে। স্বার্থপর ব্যবহারের জন্য যদি দেশের আর কাউকে দোষ না দেন—তবে শুধু মাস্টারদের দোষ দিলে কেন চলবে?

তারা তো মানুষ, ক্ষুধিত মানুষ—A hungry nation has no philosophy!—এই পর্যন্ত বলিয়া 'বীরবাহু' থামিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যদুবাবু বলিলেন—আপনাদের 'ফ' ও ওঁদের 'ণ'—দুইই থাক।

—তার মানে?

যদুবাবু বলিলেন—ছেলেকে পড়াবো না।

'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—সে কি? তবে কি করাবেন?

যদুবাবু বলিলেন—পৈতৃক কিছু ব্রহ্মত্র আছে—তাই গিয়ে চাষ করবে!

'বীরবাহু' বলিলেন—তাতেও যে পয়সা লাগবে?

যদুবাবু বলিলেন—কিছু ঘটিবাটি এখনো আছে।

'বীরবাহু' বলিলেন, যেন আপন মনেই—ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট হওয়া ছেলে কলেজে না পড়ে শেষে চাষ করবে! কি সর্বনাশ—দেশের হলো কি?

যদুবাবু বলিলেন—যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—

—কেন?

আপনাকে কিছু জমি দেবো—চাষ করবেন।

—চাষ করবো?—'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিলেন, এতক্ষণে তাহার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রোধে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে, ধিক্কারে বলিতে লাগিলেন—আপনি কি মনে করেন? আমি চাষ করবো? আমি হবো চাষা? আমি কাল্‌চারের পথ ছেড়ে এগ্রিকাল্‌চার ধরবো? কৃষ্টি ছেড়ে ধরবো কর্ষণ? ধিক্!

বিস্মিত যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু এত অপমান সহ্য করে—

—অপমান? 'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন—না হয় দুটো কথা এখানে শুনতে হয়—কিন্তু তা বলে চাষা হতে পারিনে।—এই বলিয়া তিনি যদুবাবুর প্রতি একটা ধিক্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় যেন ভুল করিয়াই যদুবাবুর সিগারেটের কৌটাটা হাতে করিয়া লইয়া গেলেন।

* * * *

যদুবাবু তখনি নিদ্রিত পুত্রকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া রওনা হইলেন। অত রাত্রে ট্রেন নাই—তবু তিনি স্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকা স্থির করিলেন। কি জানি ভোর হইবামাত্র যদি আবার কলেজের এজেণ্টরা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঘুমের ঘোরে মধু জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, এবারে কোন্ কলেজ?

চাষের নাম শুনিয়া পাছে ছেলে আপত্তি করে তাই তিনি বলিলেন—এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ!

গভীর রাত্রে সপুত্রক যদুবাবু হোটেল ত্যাগ করিলেন, ম্যানেজার ঘুমাইতেছিল, কাজেই বিল শোধ আর করিতে হইল না।

পরদিন তাঁহারা পলাশপুরে গিয়া পৌঁছিলেন। যদুবাবুর তৈজসপত্রের দুর্ভাগ্য—এ যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল না!

অতি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কথনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নীচু রাস্তায় বাসখানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত! আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃ-কম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়িয়া, ঝুলিয়া এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলী। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহ-যাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার

টিকি, কাহারো দু'আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছান অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দু'খানা এত পুষ্ট অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠোমা শুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি? ধাক্কা না দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি?—পথের পাশেই গভীর নালা। বোধ করি কেহই বাঁচিত না! মুখ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—নো চান্স! যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো। কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয়, 'No change' —অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর-ব্যূহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুঁতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনি চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট —আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নীচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয় বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি,

টাক ও পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্রস্তর খণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরৎ করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ভাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাঙলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্য মসৃণ দু'খানি বাহু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ, তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে পড়িয়াছিল! কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলা দেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, দুএকখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দু'খানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, অলঙ্কারগুলা কোন আসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে এমন কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ স্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মানিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয়স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড় কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মানিবাসের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলঙ্কারের ইতিহাস বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু আসন্ন অস্ত আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্রসহায় অনন্য-অলঙ্কার সেই শূন্য মণিবন্ধ, কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দু'টি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল কোথায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্পসামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরী করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কখনো তারা ভিড়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা

নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প্‌.ফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে দুইয়ের মিলন; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিঁড়ে মিলিত দুই আকার হয়ে যায়—এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ; বিবাহের হোমানলে দুইআধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে!

অমিত-শমিতার বিবাহ হ'ল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা; একালের বোতল বললো, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটার একবার খোঁজ খবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেন্দুবাবুর গ্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। তারিণীচরণের চিঠি এলো—শমিতরা জাতের এক আধ ধাপে নীচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার

মতো—কারণ শুটিতে স্বর্ণসূত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌছবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্যে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফর্মাল প্রটেষ্ট' জানালেন, অথচ আর ভাষা এমন হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবার অনুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হ'ল, যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈত-পাঠে পরিণত হ'ল। মেয়েদের সময় ধার্য হ'ল সকালে; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারটার কাছ ঘেঁসে রইলো একটা দেখা-শোনার দিগন্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈত সাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ু-জীবীরূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো—কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা জগতের পরলোক, অর্থাৎ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে। সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো প্রেমের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকে একসঙ্গে চোখে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়তো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভব করলো। মাঝে মনে হ'ত সব মেয়েই এসেছে বুত— যেন ও-দিকটা শূন্য—সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি

তখন তাকে রহস্যে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাষ, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ—বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার!—আমেরিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন। অমিতের মনে হ'ল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হ'ল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হ'ল—ক্লাস যে শুধু স্বচ্ছ হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। এতদিনে সে জনতা ভেদ ক'রে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হ'ল।

তারপরে এলো তারা পোস্ট-গ্রাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই বা কি হ'ত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়; বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মা-র মূল্য এখন শূন্য। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন ক'রে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল

তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও-টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি ব'লেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হ'ল তাঁর কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্য একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদেব জীবনও চলা শুরু করলো—কখনো বা দুঃখের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসিব অজস্রতায়, আবার কখনো বা পঙ্কিল আবর্তনের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রেব ছত্রে ছত্রে পুবাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্য-কারিতাব জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীন কালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রযেছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দুবাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

চিঠি পড়ে শমিতা বললো—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বললো—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড করে নিলো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে

গেল। স্বাস্থ্য তার কোনদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হ'ল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, ওই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে।

অমিত বলে—ও-টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও-টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও কত দিতে পারতো, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম ক'রে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণসূত্রে টান দিচ্ছেন। আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

২

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কিনা ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না!

অমিত বললে,—কিন্তু চাকরী না করলে চলবে কি করে?

শমিতা বললো,—তুমি চলে গেলে আমার চ'লে কি সুখ? শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথাকোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?

শমিতা শুধু বললো,—সে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল; শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন, তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল, সেই জন্যেই তো ওর পুরা নাম রাজযক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণ-তন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষ্মা-বাসগুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দু-বাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তাঁর মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়; ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো ব'লে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কিনা? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি করে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো, মহা সত্যকথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না, চালাতে হয়। শমিতা কিছু সঞ্চয় ক'রেছিল, তার সঙ্গে মা'য়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মতি হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করলো। বললো—শমি, একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখছিল? দেখছিল সকাল বেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদ বিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখলো, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না!

অমিত ভাবলো—এখন আর বৃথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে? শমিতা চাকরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বললে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কষ্ট সুস্থ সময়ে

অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

৩

এই রকমে সুখে দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ-বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের-সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহ দয়া-মায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়, নিরন্তর তারা মানুষের ফুসফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌঁছবার নিশ্চিততম, সরলতম, একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমত্ব-হীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী, মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ; মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোন কালে তাদের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। তারপরে হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায় —একই সঙ্গে দুইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হ'যে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্ত্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুললো না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হবে। তা'ছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা! এ-ক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হ'ল না। ও ভাবলো—এ-ক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক্। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহঙ্কারই বা করি কেন?

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুললো। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাস্'এর কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দু'জন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘটতে পারতো। যাক্, কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলমে—আর নয়। তখনি চুড়ি ক'গাছা খুলে রেখে দিলাম। কেমন ভাল করিনি?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন খসে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিঁদুরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোন দিক্‌প্রান্তে রাখলো না। এতদিন শমিতার নব নব মিথ্যাভাষণের শেষ আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসের কর্তৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে—

"শমি,

তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরকমে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি প'ড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেন নি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠলো। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা আরও বেশি সুখী হ'ত না! হয়তো হ'ত—নিশ্চয় ক'রে কে পরের মনের কথা বলতে পারে!

বিপত্নীক

অবশেষে ঘুমের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল, ভাবিলাম ঘুম যখন হইবে না অন্তত ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। একটু সুবিধাও ছিল, আগেকার মতো আলোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু চোখ বুজিতে গিয়া দেখিলাম অসুবিধা অনেক; প্রথমত এদিক ওদিকে মানুষের ঠেলায় দেহটা তিন চার জায়গায় মোড় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, তার উপরে আবার শরীরের তলায় গোটা চার পাঁচ ছোট বড় বোঁচকার গুঁতা। এরকম অবস্থা পঞ্চ-মুণ্ডীর শব সাধনার অনুকূল হইতে পারে—কিন্তু ঘুমের নয়; চোখ খুলিলে ছোট বড় মাঝারি, নূতন পুরাতন, তোরং বাক্স, স্যুটকেস প্যাঁটরা, পুঁটলি পোঁটলার দুঃস্বপ্ন, চোখ বন্ধ করিলে তামাক বিড়ি চুরুট সিগারেট, গাঁজাও আছে বোধ হয়—প্রভৃতির কুজ্ঝটিকা। এর উপরে আবার গাড়িটা অতর্কিতে থামিয়া গিয়া সর্বাঙ্গে মস্ত একটা করিয়া কনুইয়ের গুঁতা মারে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের এক কামরার বাঙ্কের উপরে আমি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়া আছি। গাড়ি বেলা আট-টায় কলিকাতা পৌঁছিবার কথা—কিন্তু গাড়িখানা যেখানে সেখানে যেমন খুসি থামিতে থামিতে চলিয়াছে, সময়মতো পৌঁছানর আশা সবাই ছাড়িয়া দিয়াছে—সবারই বেশ নির্বিকল্প অবস্থা। দেশলাই-এর স্ফুরিত আলোকে গাড়ির ওই প্রান্তের জনপিণ্ডটাকে চোখে পড়িতেছে—এর মাথা, ওর পা, তার কোমর কারো বা ঘাড়ে মিলিয়া একটা নিহত কীচকের মর্দিত দেহ। ওরা ঘুমাইতেছে। আর ঠিক আমার নীচেই একটা দল ঘুমের আশা ছাড়িয়া বিড়ি সিগারেট টানিতেছে। কাহারো চেহারা দেখিতে পাইতেছি না, তবে মাঝে মাঝে নূতন বিড়ি ধরাইবার সময়ে দেশলাই-এর ক্ষিপ্রালোকে নাকের ডগা, গোঁফ থাকিলে গোঁফ, কাহারো চশমার ঝলমলানি চোখে পড়ে। তবে অন্ধকারে প্রত্যেকের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য এতক্ষণে চিনিয়া গিয়াছি। স্ফুরিত আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরে ও চেহারাতেও মিলাইয়া লইতে পারিয়াছি—ওই যার বোঁচা নাক, গলার আওয়াজ তার বেজায় মোটা, চশমা ও গোঁফওয়ালার স্বপ্ন ভাঙা ভাঙা; মোটা লোকটার, ক্ষণিক দীপ্তিতেও তাহার আয়তন না বুঝিয়া

উপায় নাই, গলার স্বর সরু, স্বরে আর চেহারায় সামঞ্জস্য করাই কঠিন। তিনজনেই বোধ হয় এক স্টেশনে উঠিয়াছে, একই জায়গার যাত্রী, হয়তো আত্মীয়স্বজনও হইতে পারে। এ-সবই তাহাদের আলাপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সরু আওয়াজ বলিল—ভাগ্যিস নিবারণকে সেকেণ্ড ক্লাসে দিয়েছিলাম। ওর এখন ঘুম দরকার।

মোটা আওয়াজ বলিল—আর ঘুম! জীবনের এক পর্ব শেষ হয়ে গেল। আর ঘুম—

সরু আওয়াজ বলিল—ঘুম না হোক্, বিশ্রাম তো চাই।

মোটা আওয়াজ বলিল—ক'বছর হ'ল হে, পাঁচ নয়?

কিছুক্ষণ পরে সরু বলিল—ছয় বছর। বোধ করি, সে মনে মনে মানসাঙ্ক কষিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সরু মোটা কেহই নিজের কোট ছাড়িবার নয়। ছয় আর পাঁচে যখন রীতিমত কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবার উপক্রম, তখন সেই ভাঙাগলার ভাঙা কাঁসা খন্‌খন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল—নাও বাপু, একটু ঘুমোও তো! ছয়ও নয়, পাঁচও নয়—সাড়ে পাঁচ; হ'ল তো।

একটু চুপ। বিড়ির আলোটা স্থান পরিবর্তন করিল। বুঝিলাম, ভাঙা-গলা মোটাগলার মুখ হইতে বিড়িটা টানিয়া লইল। ও গোটা-দুই খুব জোর টান মারিয়াছে—অনেকটা ধোঁয়া বিড়ির আলোয় দেখা গেল। তারপরে ভাঙা কাঁসা সুরু করিল—তোমরা যার হ'য়ে দুঃখ করছ, দেখগে সে এতক্ষণ সুখস্বপ্নে ভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে!

এবারে সরু মোটা যুগপৎ ভাঙাগলার প্রতি সাঁড়াশি আক্রমণ করিল।

—কি যে বল্‌ছ, সবাই তোমার মতো নয়!

—নিবারণ কত ভালবাসতো আমি তো জানি।

ভাঙা বলিল—ভালবাসা তো আমি অস্বীকার করছি না। স্ত্রীকে সবাই ভালবাসে, তাই ব'লে সে মারা গেলে আর বিয়ে করতে হবে না, এমন কোন্ শাস্ত্রে আছে শুনি?

—বিয়ে করবে না কেন? তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় আজই বিয়ের কথা ভাবতে সুরু করেছে।

—শাস্ত্রের কথা নয় ভাই মনের কথা। পাঁচ বছরের ঘরকন্না, তার উপরে…

…তার উপরে দুটি ছেলেমেয়ে? আরে সেই জন্যই তো আরো বেশি বিয়ে করা দরকার।

মোটাগলা এবারে হাসিল—

এ যে ব্যাধির চেয়ে ওষুধ অনেক বেশী উৎকট ছোট ছেলেমেয়ে মা মারা গেলে অবশ্যই কষ্ট পাবে, কিন্তু কতদিন? একটু বয়স হ'লেই আর কষ্ট পাবে না। কিন্তু দু-বছরের কষ্ট দূর করবার জন্যে এক সৎমা জুটিয়ে দিলে সারাজীবন যে কষ্ট পেতে হবে।

সরুগলা আর একদিক হইতে আক্রমণ করিল—কিন্তু নূতন যাকে বিয়ে করবে সে মেয়ে কেন পরের ছেলের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে? অবশ্য দায়ে পড়ে সবাই রাজি হয়—কিন্তু তাকে দিয়ে পরের ছেলে মানুষ করিয়ে নেবার অধিকার কারু নেই! সমাজ তার উপরে অন্যায় করে—সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে আগের পক্ষের ছেলেমেয়েগুলো, সারাজীবনের দুঃখকষ্টে

সরুগলা নিজের বাগ্মিতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, খুব সম্ভব ওটা দম লইবার অবসর।

মানুষের সুখদুঃখের কথা নাকি উপর হইতে বিধাতা শোনেন। সত্য কিনা জানি না, তবে আমি তাহাদের এই আলাপ বাঙ্কের উপর হইতে শুনিলাম। না শুনিলেও ক্ষতি ছিল না। বিধাতার শুনিয়াও মানুষের লাভ হয় না। পরের গুহ্য বিষয় পারৎপক্ষে না শোনাই উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে পরের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইহারা যেমন নিরঙ্কুশ—না শুনিয়া উপায় কি? মোটের উপরে বুঝিলাম, নিবারণ নামধেয় এক ব্যক্তির সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। তাহারা কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। তবে স্বয়ং নিবারণ পাশের এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বিরাজমান। সে নিদ্রিত কি জাগরিত এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। নিবারণকে একবার দেখিতে পাইলে হইত।

সরুগলা পুছিল—আচ্ছা, তুমি নিবারণের বিয়ের জন্য এত ক্ষেপে উঠলে কেন শুনি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া মোটাগলা পুছিল—হাতে পাত্রী আছে নাকি হে?

ভাঙাগলা সুরু করিল—নাঃ, ঘুমোতে দেবে না দেখছি! পাত্রী থাকা-থাকি আবার কি? কুলীনের ছেলে বুড়ো হ'লেও তার পাত্রীর অভাব হয় না—আর নিবারণ তো ছেলেমানুষ। কল্‌কাতায় পৌঁছে দেখো ঘটকের যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবে না।

মোটাগলা বলিল—বাইরের ঘটকের চেয়ে ভিতরের ঘটককে আরো বেশি ভয়।

—সে ভয় নেই।

—তবে তোমার এত উৎসাহ কেন?

ভাঙাগলা বলিল—আমি নিবারণের জন্যই বলছি। যদি বিয়ে করে তবে এখনি ক'রে ফেলুক। নতুবা—

—তবে শোনো—সে এক গল্প, মানে গল্প নয়, এক ট্রাজিক কাণ্ড। সে অনেক দিনের কথা। আজো ভুলিনি—কখনো ভুলবো না। সেই জন্যেই তো আমি বিপত্নীককে সর্বদা বিয়ে করতে উপদেশ দিই। বিপত্নীকে বিয়ে করলে অনেক হাসাহাসি করে—আমি চুপ ক'রে থাকি—আমার মনে অনেক দিন আগের সেই ঘটনা মনে পড়ে যায়।

একটু দম লইয়া আবার সে সুরু করিল:

অনেক দিন আগে পশ্চিমের এক শহরে থাকতাম। তখন আমার বয়স অল্প। কত হবে?—বোধ করি দশ-বারোর বেশি নয়। একদিন হঠাৎ নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে একদল লোক শহরে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা অনেক দূর থেকে আসছে—সারাটা পথ হেঁটেই এসেছে; সঙ্গে কারো পয়সা-কড়ি ছিল না, তীর্থদর্শনে চলেছে দেওঘরে। বেচারাদের অনেক কয়দিন খাওয়া হয়নি। এতগুলো লোককে কে আর খেতে দেবে? ও-দেশটাই যে গরীবের দেশ। কোনো কোনো দিন এক মুঠো ভুট্টা জুটেছে, কোনদিন তা-ও জোটে নি। যখন তারা শহরে এসে উপস্থিত হ'ল, যেন একদল কঙ্কাল! বাজারের কাছে এসে সব বসে পড়লো। তখন না আছে, তাদের উঠ্‌বার শক্তি, না পারে ভালো ক'রে কথা বলতে। বাজারের

লোক তাদের গিয়ে ঘিরে ফেলল্। কি ব্যাপার! কোত্থেকে আস্‌ছ? সব ব্যাপার শুনে তখনি একজন লোক গেল মুস্তফি-ডাক্তারের কাছে। তিনি শহরের সব বিষয়ের নেতা। মুস্তফি বললেন—ওদের ওষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি। তখনি টাকা নিয়ে বাজারে এসে উপস্থিত হ'লেন। বাজার থেকে খাবার কিনে তাদের খেতে দিলেন। ক্ষুধার সে কি লোলুপ মূর্তি! কোনো দিন সে খাওয়ার ছবি ভুলবো না। তারপরে চালডাল যোগাড় ক'রে তাদের রান্নার যোগাড় ক'রে দিলেন। পয়সা দিয়ে চাল-ডাল কিনতে হ'ল না। দোকানদারেরা ক্ষুধিত তীর্থযাত্রীর নাম শুনেই বিনা পয়সায় সব দিল। বিশেষ মুস্তফিবাবু এসেছেন—তাঁর কাছে সবাই জীব-মৃত্যুর ঋণে বাঁধা!

আমরা ছোট ছেলেরা আশেপাশে ঘুরচি, ফাই-ফরমাস্ খাটছি, জলটা পাতাটা এগিয়ে দিচ্ছি! তারপরে তারা সবাই যখন খেতে বসলো—শহরের লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। কাঙালীভোজন দর্শনেও নাকি পুণ্য আছে। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলে—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—এটা শুধু তারই ভূমিকা। বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটা গলি ছিল। হঠাৎ তার মধ্যে এক সোরগোল। ব্যাপার কি? খাওয়ার জায়গা থেকে সবাই ছুটলো সেইদিকে? ছোট্ট গলিটা ভিড়ে নিরেট হ'য়ে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে আমাদের মাথা তলিয়ে গেল—কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে শুনলাম—সাব্-জজ নাকি কলমি গোয়ালিনীর হাত চেপে ধরেছিলেন।

শহরে একজন পেন্সন প্রাপ্ত সাব্‌জজ থাকতেন, বয়স সত্তরের ধারে-কাছে,—সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট লোক। ঘরে নাতিনাতনি আছে—তবে স্ত্রী অনেক-কাল হ'ল গত হয়েছেন। কলমি গোয়ালিনি আধা বয়সের একটি মেয়ে। সে এই গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল—সাব-জজবাবু তাকে অনুসরণ ক'রে গলিতে ঢুকে পড়েন—আর হঠাৎ এসে তার হাত ধরেন। সে ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—আর তখনি লোকজন জুটে গেল। এ সব তো পরে শুনেছি। তখন সেই জনতার যে অবস্থা! কেউ রাগ করলো, বললো—মারো ওঁকে। বেটা বেড়ালতপস্বী। কেউ কেউ বিদ্রূপ করতে লাগলো—সে কি অশ্রদ্ধার হাসি! এতদিন যাকে বড় বলে না মেনে উপায় ছিল না—তাকে হঠাৎ

নীচের ধাপে দেখে মানুষের সে কি আত্মপ্রসাদের হাসি! সব্বাই ছি ছি করতে করতে চলে গেল। মুস্তফীবাবুর চেষ্টায় ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। সাব-জজবাবু লজ্জায় শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

মোটা ও সরু যুগপৎ বলিল—এ কেচ্ছা এখানে ফাঁদবার অর্থ কি?

—অর্থ সেদিনকার জনতাও বুঝতে পারেনি—আর তোমরাও বুঝতে পারলে না দেখছি।

মোটাগলা একটু রাগতভাবেই যেন বলিল—এর মধ্যে বুঝবার আবার কি আছে? একটা বুড়ো লম্পটের কাহিনী। পৃথিবীতে সত্যই ঘৃণার যদি কিছু থাকে তবে তা বৃদ্ধ লম্পট। ছি ছি! এই বলিয়া নিজের নৈতিক তাপে নিজেই হাত-পা সেঁকিতে লাগিল।

সরুগলা আবার সূক্ষ্ম সমালোচক। সে বলিল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়াতে তোমার ঐ সাব-জজ বাবুকেই দেখেছি এবং দেখে হেসেছি।

—তার কারণ ওই প্রহসন তাকে নিয়ে হাসবার জন্যেই লিখিত। নাট্যকার শুধু কার্যটা দেখিয়েছেন তাই সেটা হয়েছে প্রহসন। শিল্পরীতি বদলে ওর কারণটা নিয়ে যদি নাটক লিখতেন, তবে হ'ত সেটা ট্রাজেডি। তখন হাসি না পেয়ে—

—কান্না পেতো?

—ট্রাজিডির উদ্দেশ্য কাঁদানো নয়—ভাবানো—আত্মদর্শনে সাহায্য করা বলতে পারো।

সরুগলা বলিল—আচ্ছা আমরা যেন কিছু বুঝিনি, তুমি কি বুঝেছ তাই শুনি না।

ভাঙাগলা বলিল—আমিও গোড়াতে তোমাদের মতই ভুল করেছিলাম, হেসেছিলাম, ধিক্কার টিটকারিতে যোগ দিয়েছিলাম। বিশেষ তখন তো আমার বুঝবার বয়স নয়। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, ঘটনাটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তারপরে কালক্রমে নিজের দুঃখের সঙ্গে ওই সাব-জজবাবুর দুঃখ জড়িয়ে, নিজের অভিজ্ঞতার পরিপূরক সাব-জজবাবুর ওই অভিজ্ঞতাকে ক'রে নিয়ে, এতদিনে ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝেছি।

দুই গলাই নীরব। সে বলিয়া চলিল—ওই যে ক্ষুধিত লোকগুলিকে

খাওয়াবার জন্যে শহরের লোক আগ্রহ প্রকাশ করেছিল—সংসারে ক্ষুধার ওই এক মূর্তি। তার আর এক মূর্তি সাব-জজবাবুর কলমির হাত ধরে টান দেওয়াতে। মানুষে শুধু কার্যটাই দেখে, কিন্তু যে দীর্ঘ কারণ পরম্পরার ঠেলায় কার্যটা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, তা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষুধার এক মূর্তিকে তৃপ্ত করা ধর্মকার্য ব'লে মনে করি—অথচ ক্ষুধার আর মূর্তিকে…কি বলাবা…এই অন্ধকারেও বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে! কিন্তু যা সত্য তা অন্ধকারেও সত্য! অতি পবিত্র চন্দন কাঠের আগুনেও তো হাত পোড়ে! একে তোমরা দুর্নীতি বলে সমর্থন না করতে পারো—অন্তত সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহস যেন থাকে। সত্য যদি মুখনিবাসী হ'ত, তবে মুখ চাপা দিয়ে সত্যকে থামানো যেতো। কিন্তু যার বাস মানুষের স্বভাবের মধ্যে তাকে থামাবে কি ক'রে? হিতোপদেশ, চাণক্য-শ্লোক, বোধোদয় দিয়ে স্বভাবের সেতুবন্ধ সম্ভব নয়।

—তাই তুমি নিবারণকে—

…হ্যাঁ, তাই আমি তাকে অতি শীঘ্র বিয়ে করে ফেলতে বলি। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবশ্যই তার দুঃখ হয়েছে, কিন্তু সেটা মনের ধর্ম। মন দুঃখিত ব'লে কি দেহ তার ধর্ম ভুলবে? কেন ভুলবে? আর মানুষ মাত্রেই দেহধর্মের বশীভূত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও দেহধর্মের নিয়মে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

"…বেরিলি কি বাজার মে পানি গিরারে—আউর লাঠি গিরা রে।",

গাড়ির অপর প্রান্তের পিণ্ডীভূত জনতার কণ্ঠ হইতে গান উঠিল—'বেরিলি কি বাজার মে…।' বেরিলির বাজারের এই অভূতপূর্ব পতনের শব্দে এতক্ষণের চটকা ভাঙিয়া পার্শ্ববর্তী বাস্তবে ফিরিয়া আসিলাম।

বেরিলির সঙ্গীতে মনে হইল রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে, নিদ্রিত জনপিণ্ড সহজাত শক্তির বলে তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছে। ওঃ, গাড়ির মধ্যে এত ধোঁয়া জমিয়াছে যে কামরাখানা শিকলে বাঁধা না থাকিলে এতক্ষণে বেলুনের মতো আকাশপথে উড়িতে সুরু করিত! কাঁচের শার্সির দিকে তাকাইয়া মনে হইল বাহিরের গাছপালার একটা ঝাপসা রেখা যেন দৃশ্যমান, যেন রবার দিয়া ঘষিসা মোছা পেন্সিলের অস্পষ্ট দাগ—আর তার উপরে গোটা

কয়েক তারা। একবার জানালাটা খুলিয়া দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু অনুরোধ করিলে কেহ উঠিবে না, নিজে উঠিয়া খুলিতে গেলে পার্শ্ববর্তী নিদ্রাভারাতুর দেহটাকে আরও একটু এলাইয়া দিয়া আমাকে স্থানচ্যুত করিবে। রাত্রিশেষের শেষ মুহূর্তে সকলেই সারা রাত্রির বিঘ্নিত নিদ্রার শোধ তুলিয়া লইতে ব্যস্ত। অতএব পূর্ববৎ পড়িয়া থাকিয়া কাঁচের শার্সির ঘষা রেখাটার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিন গলাই স্তব্ধ—বহুক্ষণের আলাপে ক্লান্ত কিম্বা হঠাৎ হয়তো ঘুমের দুরাশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। ওদিকে বেরিলি বাজার শ্রেণীর সঙ্গীত সত্ত্বেও অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ। হয়তো আমার কান তেমন সজাগ নয় বলিয়াই স্তব্ধ মনে হইতেছিল—মনের মধ্যে সাবজজবাবু ও নিবারণ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নিবারণবাবু কি কালক্রমে সাবজজবাবুতে পরিণত হইবে না? না, কুলীনের ছেলে ভাসিয়া ওঠামাত্র ঘটক বোয়ালে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দুটাই সমান দুঃখকর। সাবজজবাবুর পরিণাম দুঃখের, কিন্তু তাই বলিয়া সদ্য বিগত-পত্নীক শানাই বাজাইয়া পুনরায় বিবাহে চলিয়াছে—এ চিত্রও কম মর্মান্তিক নয়। সংসারের পথ সুখদুঃখের মধ্যগামী হইলে সংসার এমন দুর্বিসহ হইত না; সংসারে পথের একদিকে এক রকম দুঃখ, আর একদিকে আর এক রকম দুঃখ, একদিকে তার অতলস্পর্শী খাদ, অপর দিকে আকাশস্পর্শী চূড়া যতো বুদ্ধিমানই হও না কেন, এক সঙ্গে দুটা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ কখনই পাইবে না। সংসারে সেই বুদ্ধিমান, সেই সৌভাগ্যবান্, তাহাকেই আমরা ঈর্ষা করি, যে দুটা মারের মধ্যে একটাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ পথিকেই দুই হাতের মার খায়।

বাহিরে বনরেখার একটানা ঝাপসা ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া বৃক্ষত্ব পাইয়াছে। আকাশের তারা দুটা নাই। গরমের দিন হইলে এতক্ষণে বেশ আলো হইত। গাড়িটা গোটা কয়েক বিষম ঝাঁকুনি দিয়া অনেক-গুলা লাইন পার হইল। গতিও কমিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় কোন স্টেশন আসন্ন।

এতক্ষণে সরুগলা, মোটাগলা, ভাঙাগলার চেহারা দিব্যি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের স্বরে, মতে, চেহারায় বেশ মিলাইয়া লইয়াছি। গাড়ির

শূন্য আকাশ কালো মাথায় এবং ক্লান্ত চোখে ভরিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ যাহারা নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে, অসম্ভাবিত আকারে ঘুমাইতেছিল, এবারে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া রাত্রের অভদ্রতা, পদাঘাত প্রভৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসন্ন স্টেশনের চায়ের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে।

চায়ের আগ্রহ আমারও ছিল, তাই গুটি গুটি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বেঞ্চির এক টেরে বসিলাম। কিন্তু মনে চায়ের আগ্রহের চেয়েও বেশি ছিল নিবারণকে দেখিবার ইচ্ছা। ভাঙাগলার ওকালতিতে মনঃস্থির হইয়া গিয়াছিল যে নিবারণের বিবাহ করা উচিত—কিন্তু তৎপূর্বে একবার নিবারণকে দেখিতে পাইলে হইত।

রানাঘাট। চা, খাবার, কাগজ, গরম দুধের বহুবিধ চিৎকারে যেন শব্দের মৌচাক ভাঙিয়া পড়িল। সব চেয়ে বেশি জটলা ধূমায়িত চায়ের স্টলের কাছে। প্রাতঃকালের কুয়াশা, উনুনের ধোঁয়া, পেয়ালার বাষ্প মিলিয়া বেশ একটা নীহারিকালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

তিন গলা একত্র হইয়া গলা ভিজাইবার জন্য জানলা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চা-করের উদ্দেশে ডাকাডাকি করিতেছে। এমন সময়ে সরুগলা হাঁকিয়া উঠিল—নিবারণ, নিবারণ রাতে ঘুম হ'য়েছিল তো? কেমন ছিলে?

চায়ের উমেদারদের মধ্যেই নিবারণ একজন। আমি নিবারণকে চিনিতাম না, কিন্তু চিনিবার প্রয়োজনও ছিল না—সহস্রের জনতার মধ্যেও তাকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। মানুষের মুখে চোখে হাবেভাবে সর্বাঙ্গে যে এমন সূচীভেদ্য নৈরাশ্য থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মেঘলা রাত্রের কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো তার ভাব। চুল রুক্ষ, দাড়ি গজাইয়াছে, কাপড়জামা এলোমেলো—চোখের অনাসক্ত উদাস দৃষ্টি। চা-পান করিবার আশায় সে দোকানে গিয়াছিল, কিন্তু চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তিন গলায় তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকিতে একবার সে ফিরিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু উত্তর দিল না। অর্থ বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে যেন এক জগতের লোক, এই সব আনাগোনা, ভালমন্দর সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছি,

কিন্তু পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মূর্তি এই প্রথম দেখিলাম। দুঃখ অন্ধকার, নৈরাশ্য কুয়াশা; দুঃখ বিশ্বকে ঢাকিতে গিয়া অন্তত নিজকে প্রকাশ করে, কুয়াশা বিশ্বকেও ঢাকে নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে না; দুঃখ দুর্বিষহ, নৈরাশ্য অসহ্য। নিবারণের পত্নীবিয়োগের নৈরাশ্য। আমি চা-পান করিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম কি? হয়তো রাত্রির তর্কের জের টানিয়া সত্যই কিছু ভাবিতেছিলাম; কিন্তু না, না, নিবারণের বিবাহের প্রশ্ন আর উঠিতেই পারে না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনজনে নিবারণকে ডাকিতে লাগিল—সে একবার তাকাইল, কিন্তু গাড়ী ধরিবার জন্য কোনরূপ উদ্যম করিল না। সে একই স্থানে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শীতকালীন গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক লুপ্ত, আজ সে কুয়াশা নিবারণের নৈরাশ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন গাঢ়তর!

চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ

একদিন বিকাল-বেলা এক সরাইখানায় চারজন পথিক আসিয়া পৌঁছিল। সরাইখানার মালিক তাহাদের যথা সম্ভব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পথিকরা অনেক দূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, গত রাত্রি তাহাদের সকলেরই বৃক্ষতলে কাটিয়াছে, আজ সরাইখানায় বিশ্রাম ও আহার করিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা একটি কক্ষে বসিয়া আহার করিয়া লইল এবং তারপরে পরস্পরের পরিচয় লইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনিত না—এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম পথিক বলিল যে, সে একজন শিক্ষক। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি, তাই সে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে পশুপতিনাথের পীঠস্থান। কয়েকজন সঙ্গীর সাথে সে সেখানে গিয়াছিল। দেবদর্শন-সারিয়া ফিরিবার পথে তাহারা পথ হারাইয়া এক বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে তাহারা এক গাছের তলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভোর-বেলা যখন সে জাগিল, দেখিল যে তাহাদের সঙ্গীরা নাই, তৎপরিবর্তে তাহাদের কঙ্কাল কয়খানা পড়িয়া আছে। বোধ হয় কোন শ্বাপদে খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু

সে একা বাঁচিল কিরূপে? তখন তাহার মনে পড়িল সে যে শিক্ষক, সে যে জাতিগঠনের রাজমিস্ত্রি—শ্বাপদ বোধ হয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি এ শ্বাপদটা তাহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হইত, তবে কি আর তাহার রক্ষা ছিল? কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, হাজার ছাত্র শাসাইয়া এমন শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে—সামান্য শ্বাপদে তাহার কি করিবে? যাই হোক, আর যে-কারণেই হোক, সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সারা দিন চলিবার পরে সে এই সরাইখানায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই তাহার পরিচয়।

তখন দ্বিতীয় পথিক আরম্ভ করিল। সে বলিল যে, সে একজন সাহিত্যিক। গোরক্ষপুরে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সেখানে সে গিয়াছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় যখন মহতী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে এক কালান্তক ভূমিকম্প স্থরু হইল। ফলে অট্টালিকার ছাদখানি পড়িয়া সকলেই মারা গেল—কেবল সে অক্ষত-দেহে রক্ষা পাইয়াছে।

তাহার শ্রোতারা বিস্ময়ে বলিল—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সাহিত্যিক বলিল আপনারা জানেন না, আর জানিবেনই বা কিরূপে আপনারা তো সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যিকদের মাথা বড় শক্ত। হেন ছাদ নাই—খসিয়া পড়িয়া যাহা তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ, হেন ভূমিকম্প নাই যাহাতে তাহারা টলে, হেন অগ্নিকাণ্ড নাই—যাহাতে তাহারা পোড়ে।

শিক্ষক বলিল—তবে অন্য সবাই মরিল কেন?

সাহিত্যিক বলিল—সে মহতী সাহিত্য সভায় আমিই ছিলাম একমাত্র সাহিত্যিক। ইহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইতেছেন—কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখুন সাহিত্য সভায় পারৎপক্ষে সাহিত্যিকরা কখনো যায় না—এক সভাপতি ব্যতীত। তাই তাহারা পিষিয়া মারা গেল—আর আমি যে শুধু বাঁচিয়া রহিলাম তা-ই নয়, আমার মাথায় লাগিয়া একখানা পাথরের টুক্‌রা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গেল। এই সেই ধূলি।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে এক কৌটা ধূলি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপরে বলিল—সাহিত্যিকদের বেলায় শিরোধূলি কথাটাই অধিকতর প্রযোজ্য।

তারপরে গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। ইহাই আমার পরিচয়।

তৃতীয় পথিক বলিল—মহাশয়, আমি একজন চিকিৎসক। হজরতপুরে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিয়া সেখানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে কোন চিকিৎসক ছিল না। আমি সেখানে গিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র হজরতপুরের সমস্ত অধিবাসী নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল যে মহামারীর হাতে যদি বা বাঁচি—মহাবৈদ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে?

নগরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি কুৎসিত ও বীভৎস বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম—তুমি পালাও নাই কেন?

সে বলিল—আমার ভয়েই তো সকলে পালাইতেছে, আমি পালাইতে যাইব কেন? আমার নাম মহামারী। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তোমার গর্ব বৃথা, সকলে আমার ভয়েই পালাইয়াছে, আমার নাম মহাবৈদ্য। ইহা ইহা শুনিবামাত্র সে প্রাণভয়ে পলায়ন সুরু করিল। কিছুকাল পরে দেখি হজরতপুরের নাগরিকগণ মহামারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিল—মহামারী আমাদের শত্রু নয়, মিত্র; যেহেতু তাহার কৃপাতেই আমরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া পরম ভাগবত ইংরাজ সৈন্যের মতো দৃঢ়পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুগণ, ইহাই আমার ইতিহাস।

তখন চতুর্থ পথিকের পরিচয় দিবার পালা।

সে আরম্ভ করিল—মহাশয়, আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সারা দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যখন দান করিতে নামিব এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে—বৎস, তুমি যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ—এখন স্নান করো, করিবামাত্র তোমার মুক্তি হইয়া যাইবে, আর তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

সে বলিল—মহাশয়, মুক্তি কাম্য ইহা জানিতাম, কিন্তু কখনো সন্ত

মুক্তির সম্ভাবনা ঘটে নাই। আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্নান না করিয়াই পলায়ন করিলাম। রাত্রে পথ ভুলিয়া গেলাম, কোথা হইতে যে কোথায় গেলাম জানি না—তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

তাহার কাহিনী শুনিয়া অপর তিন পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পরিচয় কি?

ইহা শুনিয়া চতুর্থ পথিক বলিল—আমি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা—যাহার বাংলা 'সিনেমা স্টার'।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—তাহার অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বিস্ময়কর—তবে সিনেমা স্টারের পক্ষে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই ভাবে পরস্পরের পরিচয় সাধনের পালা উদ্‌যাপিত হইতে চার জনে মিলিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিল; চারজনেই আশা করিল যে, রাতটা আমোদ-আহ্লাদে ও আরামে কাটাইতে পারিবে। এমন সময়ে সরাইখানার মালিক প্রবেশ করিল। সে অতিথিদিগকে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া সেখানে যতদিন খুসী কাটাইতে অনুরোধ করিল, বলিল—তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সে দৃষ্টি রাখিবে। তারপরে কি যেন মনে পড়াতে সে একটু হাসিয়া বলিল—এই সরাইখানার সমস্ত ঘরই অধিকৃত—কেবল একটিমাত্র ঘর খালি আছে।

পথিকরা বলিল—একটি ঘরেই আমাদের চলিবে।

সরাইখানার মালিক বলিল—ঘরটি নীচের তলাতে কাজেই একটু স্যাঁৎসেতে—

পথিকরা বলিল—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঘরে তক্তপোশ আছে তো?

মালিক বলিল—তক্তপোশ অবশ্যই আছে—কিন্তু একখানা মাত্র, কাজেই আপনাদের তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে, সেই জন্যই স্যাঁৎসেতে মেঝের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া আর কোন অসুবিধা নাই। আপনাদের মধ্যে কে তক্তপোশে শুইবেন তাহা আপনারা স্থির করিয়া ফেলুন, আমি আর কি বলিব? এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তখন পথিক চারজন বিব্রত হইয়া পড়িল। কে বা তক্তপোশে শুইবে

আর কারা বা মেঝেতে শুইবে! তাহারা সেই ঘরটায় গিয়া দেখিল সরাইখানার মালিকের কথাই সত্য। ঘরের মেঝে বিষম ভেজা, তার উপরে আবার এখানে সেখানে গর্ত, ইতস্ততঃ আরশুলা, ইঁদুর, ছুঁচো নির্ভয়ে পরিভ্রমণশীল, এক কোণে আবার একটা সাপের খোলসও পড়িয়া আছে। আর এক দিকে একজনের মাপের একখানা তক্তপোশ—সেটাও আবার অত্যন্ত জীর্ণ।

চারজনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ছুঁচো-গুলো চিক্‌ চিক্ শব্দে পলায়ন করিল—যেন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে তক্তপোশে শুইবে? কাহার শরীর খারাপ? চারজনেরই শরীরেব অবস্থা সমান।

তখন শিক্ষক বলিয়া উঠিল—এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে যাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—সে-ই তক্তপোশে শয়ন করিবে, অপর তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া তিনজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—ইহা অত্যন্ত সমীচীন—আর ইহা শিক্ষকের যোগ্য কথা বটে। কিন্তু কাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী তাহা কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? পরীক্ষার উপায় কি?

তখন সাহিত্যিক বলিল—আমি একটা উপায় নির্দেশ করিতে পারি। আসিবার সময়ে দেখিয়া আসিয়াছি কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের কেহ চেনে না। আমরা চারজন চার পথে সেই গ্রামে প্রবেশ করিব। নিজেদেব অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া পবিচয় দিব—ইহার ফলে গ্রামের লোকদের কাছে যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে তাহারই জীবনের মূল্য সর্বাধিক। তক্তপোশে শয়ন করিবার অধিকার তাহারই।

সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তিনজনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তখন চিকিৎসক বলিল—তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ কি? এখনো অনেকটা বেলা আছে—এখনি বাহির হইয়া পড়া যাক, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই ফিরিতে হইবে।

সিনেমা স্টার বলিল—আশা করি, আমরা সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া সত্য কথা বলিব।

ইহা শুনিয়া শিক্ষক বলিয়া উঠিল—হায় হায়, যদি মিথ্যা কথাই বলিতে পারিব তবে আজ কি আমার এমন দুর্দশা হইত!

তখন সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের দিকে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

২

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চার বন্ধু ফিরিয়া আসিল। সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া সত্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজের নিজের পরিভ্রমণ কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

প্রথমে শিক্ষক বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল—আমি উত্তর দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর গিয়া একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখিলাম—ভাবিলাম এখানেই আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই দয়ালু গৃহস্থ আমাকে বসিবার জন্ত একটি ঘোড়া আগাইয়া দিল। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলাম। সদাশয় গৃহস্থ আমাকে আপ্যায়িত করিয়া আমার পরিচয় শুধাইল। আমি বলিলাম যে, আমি একজন বিদেশী শিক্ষক—পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র গৃহস্থ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—ওরে রামা, ঘোড়াটা ঘরে তুলিয়া রাখ, বাহিরে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি পরিত্যক্ত ঘোড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলাম—আজ আপনার বাড়ীতে রাত্রি কাটাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—তোমাকে যে আশ্রয় দিব তাহার স্থানাভাব। আমি বলিলাম যে, অন্তজায়গা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ আপনার গোয়াল ঘরে নিশ্চয় স্থান হইবে। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—গোয়াল ঘরেই বা স্থান কোথায়? দশ-বারোটা গোরু আছে। কোনটাকে বাহিরে রাখিতে সাহস হয় না—রাত্রে বড় বাঘের ভয়। আজকাল গোরুর যা দাম জানো তো?

আমি কহিলাম—গোরুর চেয়ে শিক্ষকের জীবনের মূল্য কম?

সে বলিল—কি যে বলো? একটা যেমন তেমন গোরুও আজকাল পাঁচ শো টাকার কম মেলে না? আর দশ টাকা হইলেই একটা শিক্ষক মেলে। এখন তুমিই বিচার করিয়া দেখো।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমরা যে জাতিগঠন করি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—তার মানে তোমরা গোরু চরাও। কিন্তু রাখালের চেয়ে গোরুর মূল্য অনেক বেশি।

আমি বলিলাম—আপনার ছেলে নিশ্চয় শিক্ষকের কাছে পড়ে!

সে বলিল—পড়িত, এখন পড়ে না। এক সময়ে তাহার জন্য একজন শিক্ষক রাখিয়াছিলাম। সে এখন আমার গোরুর রাখালী করে—কারণ সে দেখিয়াছে যে, শিক্ষকের চেয়ে রাখালের বেতন ও সম্মান অনেক বেশি। তবে তুমি যদি রাখালী করিতে চাও, আমি রাখিতে পারি—আমার আর একজন রাখালের আবশ্যক! আর তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, গোরুই যদি চরাইবে তবে এমন গোরু চরাও যাহারা দুধ দেয়। দুধ দেয় না এমন মানুষ গোরু চরাইয়া কি লাভ? যাই হোক, তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝিবে—তবে বাপু এখানে তোমার জায়গা হইবে না। ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শিক্ষকের জীবনের কি মূল্য। সেখান হইতে সোজা সরাই-খানায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

তখন চিকিৎসক তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিল—দক্ষিণ-দিকের পথ দিয়া আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অনুমানে বুঝিলাম বাড়ীটি কোন ধনীর—কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ও আশেপাশে লোকজনের উদ্বিগ্ন চলাচল দেখিয়া কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিতেছিল তাহাকে শুধাইলাম—মশায়, ব্যাপার কি? এ বাড়ীতে আজ কিসের উদ্বেগ?

সে বলিল—আপনি নিশ্চয় বিদেশী, নতুবা নিশ্চয় জানিতেন। তবে শুনুন, এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—এই বাড়ী গ্রামের জমিদারের। তাহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়—এখন শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত—যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হইয়া থাকে যমে মানুষে টানাটানি—তাহাই চলিতেছে। বোধ করি যমেরই জয় হইবে।

আমি বলিলাম—এ রকম ক্ষেত্রে যমেরই প্রায় জয় হইয়া থাকে—তার কারণ চিকিৎসক আসিয়া যোগ দিতেই যমের টান প্রবলতার হইয়া ওঠে; ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন যে চিকিৎসক আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত রোগী প্রায়ই মরে না। কিন্তু তারপরেই কঠিন।

সে লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল—এ তথ্য আপনি জানিলেন কি করিয়া?

আমি সগর্বে বলিলাম—আমি যে একজন চিকিৎসক।

তখন সে বলিল—আপনার ভাগ্য ভাল, এ গ্রামের চিকিৎসকেরা কেহই রোগীকে নিরাময় করিতে পারে নাই—আপনি গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন। সফল হইলে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিবেন।

আমি ভাবিলাম, সত্যই আমার ভাগ্য ভালো। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। সফল হইলে আর সরাইখানার ভাঙা তক্তপোশে রাত্রি না কাটাইয়া জমিদার বাড়ীতেই আদবে রাত্রি যাপন করিতে পারিব।

তখন আমি ভিতরে গিয়া নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া রুগী দেখিতে চাহিলাম। আমাকে চিকিৎসক জানিতে পারিয়া জমিদারের নায়েব সসম্ভ্রমে বসিতে দিল। সম্যক্ পরিচয় পাইয়া বলিল—হাঁ, রুগীর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আপনি যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন তবে দশ হাজার মুদ্রা ও সরিফপুর পরগণা পাইবেন। আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তখন নায়েবের আদেশে একজন ভৃত্য আমাকে ভিতর মহলে লইয়া চলিল। পথে অনেকগুলি ছোট বড় কক্ষ পার হইয়া যাইতে হয়—একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে পাশাপাশি তিন-চারটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছে কেন?

চাকরটি বলিল—অসময় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

—সে কি? ইহারা কে?

—ইহারা মৃত এবং মৃত চিকিৎসক।

—মরিল কেমন করিয়া?

—চিকিৎসা করিতে গিয়া।

—চিকিৎসায় তো রুগী মরে।

—কখনো কখনো চিকিৎসকও মরে—প্রমাণ সম্মুখেই।

এই সব বাক্য বিনিময়ে আমার চিত্ত উচাটন হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—ব্যাপার কি খুলিয়া বলো।

সে বলিল—বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে কি? হয়তো জীবন দিয়াই আপনাকে বুঝিতে হইবে। জমিদারবাবু বড়ই প্রচণ্ডস্বভাবের লোক। চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি চিকিৎসককে প্রচুর ধনরত্ন দিবেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি চিকিৎসক ব্যর্থকাম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন ইহাও তেমনি সত্য-প্রমাণ তো নিজেই দেখিলেন।

—আগে আমাকে এ কথা বলা হয় নাই কেন?

—তাহা হইলে কি আর আপনি চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতেন?

—কিন্তু চিকিৎসক মারিয়া ফেলার ইতিহাস তো কখনো শুনি নাই।

—জমিদারবাবুর ধারণা আনাড়ি চিকিৎসক যমের দূত। তাহাদের মারিয়া ফেলিলে যমের পক্ষকে দুর্বল করিয়া রুগীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কই আসুন—

আমি তৎক্ষণে জানালার শিক ভাঙিয়া, পগার ডিঙাইয়া ছুটিয়াছি—আমাকে ধরিবে কে? যদিচ পিছনে আট-দশটি পাইক পেয়াদা দৌড়াইয়াছে দেখিতে পাইলাম। এক ছুটে সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল, তারপরে বলিল আজ আমাকে এই স্যাঁৎসেতে মেঝেতেই শুইতে হইবে, তা হোক। আমের কাঠের চেয়ে এই ভেজা মেঝে অনেক ভালো।

এবার সাহিত্যিকের পালা। সে বলিল কি আর বলিব! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি—বন্ধু চিকিৎসকের মতো আমিও মৃত্যুর খিড়কি দরজার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম—নেহাৎ পরমায়ুর জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

সকলে উৎসুক হইয়া শুধাইল—ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন।

সাহিত্যিক বলিয়া চলিল—পূর্বদিকের পথ দিয়া গ্রামে গিয়া তো প্রবেশ করিলাম। সে দিক্‌টায় রজকপল্লী রজকপল্লী দেখিলেই আমার রজকিনী রামীকে মনে পড়িয়া যায়, কোন্ সাহিত্যিকের না যায়? রজক কিশোরী-

দের লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়াছি—হ্যাঁ—চণ্ডীদাস রসিক ছিল বটে, সজোরে পাথরের উপরে কাপড় আছড়াইবার ফলে দুই বাহু ও সংলগ্ন কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন সুপুষ্ট হইয়া ওঠে যে, অপরের প্রশস্ত নীল শাড়িও তাহা আবৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ কাপড় আছড়াইবার সময়ে উক্ত প্রত্যঙ্গদ্বয় শরীরের তালে তালে শূন্যে বৃথা মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে তাহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের মন না ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—সাহিত্যিকদের তো কথাই নাই। এমন সময়ে একটি রজক কিশোরী আমাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ফিরিয়াছে, ফিরিয়াছে।

ফিরিয়াছে? কে ফিরিয়াছে? হ্যাঁ, ফিরিয়াছে বই কি? আমার মধ্যে দিয়া চিরদিনকার চণ্ডীদাস ফিরিয়া আসিয়াছে—রজকিনী রামীর শীতল পায়ে বুঝিলাম জগতে দুটি মাত্র প্রাণী আছে—আমি চণ্ডীদাস আর কিশোরী রজকিনী রামী। দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে একদল কিশোরী জুটিয়া গেল—জগৎ রামীময়, আর তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল জগৎ আমিময়। এ রকম অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া উপায় কি?

একজন বলিল—ফিরিয়াছে।

(ফিরিয়াছে বই কি! না ফিরিয়া কি উপায় আছে?)

আর একজন বলিল—অনেকদিন পরে।

(সত্যিই তো! চণ্ডীদাসের পরে আজ কত যুগ গিয়াছে!)

তৃতীয়া বলিল—ঠিক সেই চেহারা, ঠিক সেই হাবভাব।

(এমন তো হইবেই। মানুষ বদলায়, প্রেমিক কবে বদলিয়াছে?)

চতুর্থী বলিল—কেবল যেন একটু রোগা মনে হয়। (ওগো শুধু মনে হওয়া নয়···এযে অনিবার্য বিরহসঞ্জাত-কৃশতা।)

পঞ্চমী কিছু বলিল না—কেবল আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

(ওগো বৈষ্ণব কবি, তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে অঙ্গের পরশে কিবা হয়। আজ আমারও ঠিক সেই প্রশ্ন।)

অপরা বলিল—কিন্তু লেজটা যেন কাটিয়া দিয়াছে?

লেজ? কার লেজ? এবার চণ্ডীদাস-থিওরিতে সন্দেহ জন্মিল।

এবারে আমি প্রথম কথা বলিলাম—আমি প্রেমিক চণ্ডীদাস।

তাহারা সমস্বরে বলিল—হাঁগো হাঁ, তাহার ঐ নামই ছিল বটে!

এই বলিয়া একজন একটা কাপড়ের মোট আনিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—আমি তো চাকর নই।

তাহারা বলিল—চাকর হইতে যাইবে কেন? তুমি যে গাধা।

আমি গাধা!

বলিলাম—সে কি? আমি যে মানুষের মতো কথা বলিতে পারি।

রসিকা বলিল—অনেক মানুষ গাধার মতো কথা বলে, একটা গাধা না হয় মানুষের মতো কথাই বলিল—আশ্চর্যটা কি?

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—আরে, আরে, আমি যে সাহিত্যিক?

—তবে আর তোমার রাসভত্বে সন্দেহ নাই—কারণ যাহারা মধুর স্বাদ নিজে গ্রহণ না করিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া মরে—তাহারা যদি গাধা না তবে গাধা কে?

তখন অপর এক কিশোরী বলিল—ও দিদি, এ' যে বশ মানিতে চায় না—কি করি?

কিশোরীর দিদি যুবতী বলিল—প্রেমের ডুরি খানা আন তো?

প্রেমের ডুরি শুনিলেও দেহে রোমাঞ্চ হয়।

দেখিতে পাইলাম একজন মোটা একটি কাছি আনিতেছে।

তবে ওরই নাম প্রেমের ডুরি। ও ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য তো আমার হইবেই না—এমন কি পাড়াশুদ্ধ লোকের হইবে না। তখনই ছুট। কিশোরীরা দৌড়ায় বেশ! প্রায় ধরিয়াছিল আর কি? উঃ, পথ বিপথ লক্ষ্য করি নাই—এই দেখুন হাঁটুর কাছে ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তবু ভালো যে প্রেমের ডুরিতে বদ্ধ হই নাই।

এই বলিয়া সে থামিল তার পরে বলিল—তবু ভালো যে আজ ভিজা মেজেতে শুইতে পাইব, প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িলে গোয়ালে ঘুমাইতে হইত।

তাহার কাহিনী শেষ হইলে সকলে মিলিয়া সিনেমা স্টারের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুর্থ পথিক তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে সুরু করিল।

বন্ধুগণ, আমি পশ্চিমদিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি পুকুরের ধারে একটি মেলা বসিয়াছে। স্থান কাল পাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে সামাজিক ধাপে আমার জীবনের মূল্য বিচারের ইহাই যথার্থ স্থান। আমি তখন পুকুরের জলে নামিয়া ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করিলাম। আপনারা ভয় পাইবেন না, সহস্রবার ডুবিয়াও কি করিয়া না মরিতে হয় তাহার কৌশল আমাদের আয়ত্ত। ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা অভিনয় মাত্র। আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি ডুবিয়া মরিতেছি, তোমরা আমাকে বাঁচাও! আমার আর্ত আহ্বান শুনিয়া সকলে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ জলে নামিল না।

আমি বলিলাম—আমি ডুবিলাম বলিয়া—শীঘ্র বাঁচাও।

তাহারা বলিল—আগে তোমার পরিচয় দাও তবে জলে নামিব।

আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাইবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন—তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।

তাহারা এক বাক্যে বলিল—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে তোমার ডুবিয়া মরাই ভালো।

আমি বলিলাম—আমি চিকিৎসক।

তাহারা বলিল—অনেক মারিয়াছ, এবারে মরো।

—আমি সাহিত্যিক।

—ডুবাইতে পারো আর ডুবিতে পারো না?

—আমি সাংবাদিক—শুনিয়া তাহারা ঢেলা মারিল।

—আমি সাধুপুরুষ—শুনিয়া তাহারা হাসিল।

—আমি বৈজ্ঞানিক—শুনিয়া তাহারা সাড়া শব্দ করিল না।

—আমি গায়ক—শুনিয়া কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমি খেলোয়াড়—শুনিয়া দু-একজন জলে নামিতে উদ্যত হইল।

—আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা।

তাহারা বুঝিতে পারিল না। তখন বলিলাম—যাহার বাংলা হইতেছে 'সিনেমা স্টার'।

ইহা শুনিবামাত্র মেলার সমস্ত জনতা একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পুকুরের জল স্ফীত হইয়া উঠিয়া মেলার জিনিষ পত্র ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সকলেরই মুখে—হায় হায়! গেল গেল! দেশ ডোবে, জাতি ডোবে, সমাজ ডোবে, রাজ্য সাম্রাজ্য সভ্যতা আদর্শ ডোবে তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল সিনেমা স্টার ডুবিলে সমস্ত গেল! হায়, হায়! গেল, গেল!

সকলে মিলিয়া আমাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল। সকলে অর্থাৎ আবাল বৃদ্ধ নর নারী যুবক যুবতী বালক বালিকা কিশোর এবং কিশোরী।

আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ জোক লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত—নানাস্থানের মাপ। তারপরে চুলের রং, ঠোঁটের রং, নখের রং, দাঁতের রং, চোখের রং। এ সব টোকা হইয়া গেলে আমার জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন সুরু করিল। আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আগামী কল্য তাহাদের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছি।

চতুর্থ পথিকের অভিজ্ঞতা শুনিয়া অপর তিনজনে বুঝিতে পারিল আজ রাত্রে তক্তপোষে শুইবার অধিকার কাহার।

চার বন্ধুতে আহারান্তে শয়ন করিল। সিনেমা স্টার তক্তপোশে শুইল—অপর তিনজনে সেই ভেজা মেঝের উপরে।

তক্তপোশশায়ী সিনেমা স্টারের নিদ্রার তালে তালে যখন নাসিকা গর্জন চলিতেছিল, তখন তিনজনে মশা, মাছি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি তাড়াইয়া বিনিদ্র-নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছিল। সারারাত ছুঁচোগুলো চিক্ চিক্ করিয়া ঘরময় দৌড়িয়া বেড়াইল—তিনজনের কানে তাহা বিদ্রূপের ফিক ফিক হাসির মতো বোধ হইল। ঘরের একপ্রান্তে একটা সাপের খোলস পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা নির্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিল। কপালে যাহাদের দুঃখ সাপেও তাদের স্পর্শ করে না।

একটি ঠোঁটের ইতিহাস

বিশ্বকর্মা যে-ঘরটাতে বসিয়া মূর্তি তৈয়ারি করেন, সে-ঘরটা সর্বদা তালা চাবি বন্ধ থাকে। যখন তিনি শিল্প কার্য করিতে থাকেন, ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেন। বাহিরে গেলে শক্ত তালা চাবি আঁটিয়া যান। এমন কি দু'চার দণ্ডের জন্যে বাহির হইলেও তালা চাবি আঁটিতে কখনো ভোলেন না। তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বড়ো ভয়। নাবালক ছেলেটা সর্বদা গুল্‌তি তৈরি করিবার জন্যে নরম মাটি খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পিতার শিল্প শালাব মতো এমন তৈরি কাদার তাল আর কোথায় সুলভ! কিন্তু বিশ্বকর্মার বয়স হইয়াছে। একদিন ঘর বন্ধ না করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবসরে ছোট ছেলেটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা সম্পূর্ণপ্রায় মূর্তি পড়িয়াছিল; গুল্‌তির মাটির লোভে সে তার ঠোঁটে যেমনি হাত দিয়াছে, অমনি বিশ্বকর্মার আওয়াজ কাণে গেল,—'ঘরে কে রে? নম্ভ বুঝি, দাঁড়া আসছি।' গুল্‌তি সংগ্রহ আর হইল না, নম্ভ এক দৌড়ে পালাইল। বিশ্বকর্মা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। নম্ভর হাতের চাপে মূর্তির নীচের ঠোঁট-টা সে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহা আর বুড়া বিশ্বকর্মার ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়িল না। তারপরে যথাসময়ে সেই মূর্তি জেলা মেদিনীপুরের গোবিন্দ মণ্ডলের ঘরে আকাট মণ্ডল রূপে ভূমিষ্ঠ হইল। এই গল্প সেই আকাট মণ্ডলের কাহিনী কিংবা আরও বিশিষ্টভাবে বলিতে গেলে বিশ্বকর্মার অসাবধানতায় এবং নম্ভর গুল্‌তির লোভে তাহাব ঠোঁট যে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছিল—ইহা তারই ইতিহাস। একটি তরল মতি বালকের জন্যে সারা জীবন একটা মানুষকে কত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহা শুনিলে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, অপরাধ করিলেন বিশ্বকর্মা আর ফল ভোগ করিল নির্দোষ আকাট মণ্ডল। নম্ভকে দোষ দিয়া লাভ নাই—সে বালক-মাত্র—ফলাফল বিচার তাহার স্বভাব নয়।

আকাট মণ্ডলের জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার জননীর মৃত্যু হইল রাগে দুঃখে গোবিন্দ মণ্ডল ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে সদ্যোজাত শিশুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিল—'দেখনা,

বেটা মাকে মেরে ফেলেছে, আবার হাসছে!' সত্য সত্যই আকাটের দন্তহীন শিশু মুখে একটা হাসির আভা লাগিয়া ছিল। পার্শ্ববর্তীরা তাকাইয়া দেখিল এবং বিস্মিত হইল। সকলেই মনে মনে বুঝিল—এ ছেলে অপয়া।

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে হাসিটি শিশুর স্বেচ্ছাকৃত নয়। ওই যে নস্তুর হাতে তাহার নীচের ঠোঁটে একটু চাপ লাগিয়াছিল, তার ফলে ঠোঁট-টা এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে—যাহাতে বিদ্রূপ-সঞ্জাত একটা হাসির ছাপ ওখানে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এ হাসি যেমন তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, তেমনি তাহা দূর করিবার শক্তিও তাহার নাই, বস্তুতঃ ওটা হাসিই নয়। কিন্তু সংসারের সকল মানুষতো আর আমার পাঠকের মতো বিচক্ষণ নয়, তাহারা এত তলাইয়া বুঝিতে চায়· না; সে শক্তি, সে ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা ওটাকে হাসি বলিয়াই মনে করিতে লাগিল —এবং তাহাদের ভুল বোঝার ফলাফল ভোগ করিতে করিতে আকাট মণ্ডল জীবন যাপন করিতে সুরু করিল।

গোবিন্দ মণ্ডল আকাটকে বেশিদিন বাড়ীতে রাখিল না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কয়েকদিন আগে তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিল। আর আনিল না। মাতুলরা ধার্মিক, ধর্মের পুরস্কারস্বরূপ আকাটকে লাভ করিল। তাহাদের অনেকগুলি গোরু ছিল, রাখাল ছিল না, আকাট রাখালের কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না। পাড়ার লোকেরা নিতান্ত অধার্মিক —ভাগ্নেকে দিয়া রাখালের কাজ করানো তাহাদের ভাল লাগিল না; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। কাজেই ধার্মিক মাতুলগণ তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল—বলিল, দেখো, ভাগ্নে ও ছেলের মধ্যে আমরা কোন ভেদ করি না। কিন্তু তাহার গোচারণের খ্যাতি গুরু-মহাশয়ের কানে উঠিয়াছিল, তিনি আকাটকে বলিলেন—ওরে তুই মাঠে গিয়ে আমার গরুগুলো দেখ্। ওতেই হবে বাবা, গুরুর আশীর্বাদে ওতেই তোর বিদ্যা হবে। অতএব আকাট পুনরায় মাঠে গেল। পড়িবার সময়ে সে গোরু চরায়, এমনি করিয়া কয়েক বছর গোরু চরাইবার পরে গোরুর

চড়া দাম দেখিয়া গুরুমহাশয় গোরুগুলি বেচিয়া দিলেন! তখন আর আকাটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া গুরুমহাশয় মাতুলদের বলিলেন আকাটের পড়া শেষ হইয়াছে। মাতুলরা তাহাকে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল।

সেই স্কুলে গিয়া প্রথম দিনেই তাহার বাঁকা ঠোঁট তাহাকে বিপদে ফেলিল। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিরে বড়ো যে হাসছিস্। সে বলিল—কই পণ্ডিতমশাই, হাসছি কই? তবে রে বেটা মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন—তোর কিছু হবে না, বেটা আকাট মুখ্যু। সেই হইতে পিতৃদত্ত নামটার পরিবর্তে গুরুদত্ত ওই বিশেষণটা তাহার গায়ে আটকাইয়া গেল। লোকে তাহাকে আকাট বলিয়াই ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে মৌলিক নামটা ভুলিয়াই গেল। আমরাও তাহাকে ওই নামেই উল্লেখ করিয়া আসিতেছি।

এই ঘটনার পর হইতে তাহার উপরে পণ্ডিতমহাশয় কেমন যেন জাত ক্রোধ হইয়া গেলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—'কিরে হাসছিস্ যে বড়ো।' আকাট বলিত—'কই হাসলাম পণ্ডিতমশাই!' পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন—দেখ তোরা ও হাস্‌ছে কিনা। সহপাঠীগণ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিত আকাটের মুখে হাসিই বটে। একদিন ব্যাপারটা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। ফলে পণ্ডিত-মহাশয় তাহাকে খুব এক চোট মারিলেন। আকাট কাঁদিতে লাগিল। তখন তিনি ছাত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, দেখেছিস্ বেটার বজ্জাতি। চোখে জল কিন্তু মুখের হাসিটি যায়নি—এমন শয়তানকে ইস্কুলে রাখবো না। যা দূর হয়ে যা। আকাট সেদিনের মত ইস্কুল ত্যাগ করিল এবং পরেও আর ইস্কুলে গেল না। তাহার পড়াশোনা ওইখানেই শেষ হইল।

অতঃপর আকাট চাকুরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিল। একটি সাহেবী অফিসে চাকুরি পাইল। Lift-এর দরজা খোলা ও বন্ধ করা তাহার কাজ। সারাদিন একজায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে lift-এর দরজা খুলিয়া দেয়; আবার লোক উঠিলে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; lift হুস করিয়া পাতাল-

পুরীতে নামিয়া যায়। এই ভাবে তাহার কাল যায়—হঠাৎ তাহার একদিন সৌভাগ্যোদয় হইল। একদিন lift হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে বড়ো সাহেবের চোখ পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন 'I like such a smiling face' এরকম smiling face নাকি ইণ্ডিয়াতে সদাসর্বদা চোখে পড়ে না। বড়ো সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস খানসামার কাজ দিলেন। মাহিনাও অবশ্য বাড়িল। আকাট ভাবিল বিধাতা এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন কিম্বা বিধাতা বরাবরই প্রসন্ন কেবল মানুষের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই তাহার যত কষ্ট। সে বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া মানুষকে মনে মনে বাপান্ত করিয়া, নূতন কোট ও চাপরাশ পরিয়া বড়ো সাহেবের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বেশিদিন দাঁড়াইয়া রহিতে হইল না। সেদিন বড়ো সাহেব তাহার মেমের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অফিসে আসিতে-ছিলেন। দরজার কাছে আকাটকে দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—Grinning Idiot! এবং গর্জনের পিছনে শিলাবর্ষণের মতো একটি প্রচণ্ড ঘুষি তাহার নাকে আসিয়া পড়িল।

এখন সাহেবী অফিসের একটি সুনিয়ম এই যে এরকম চড় ঘুষিটা খাইলে অন্যত্র তাহার ঔষধ সন্ধান করিতে হয় না। সরকারী খরচে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই অফিসের ডাক্তার আকাটের নামে একটি পটি বাঁধিয়া দিল। দেশী আফিসে এমন বিধান শৃঙ্খলা নাই। সেখানে চড়-চাপড় খাইলে নিজের খরচে ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়।

পটি বাঁধা নাক, আকাট অসুখের বাবদ তিনদিন ছুটি পাইল। সে বাসায় ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হইল? বিধাতাপুরুষ তো অবিবেচক নহেন, সাহেবও সদয়, তবে তাহার নাকটা বদ্ধপটি হইল কেন? এমন সময়ে নাকে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হইলে সে ঔষধের তুলি লইয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নার ভিতরে হাসিতেছে কে? সে চমকিয়া উঠিল! তার নিজেরই তো ঠোঁট বটে! এদিকে নাকটা জ্বলিয়া যাইতেছে; ঠোঁটের হাসি সেই জ্বলুনিকে যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিল। আর একটু হইলেই সে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া

দিয়াছিল আর কি! সে রাগে দুঃখে আয়নার সুমুখ হইতে সরিয়া আসিল সরিয়া আসিল বটে কিন্তু সেই বিদ্রূপের হাসিটা মন হইতে কিছুতেই সরিল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল—এবং প্রতিদিনের স্তূপীকৃত ধিক্কার জমিয়া উঠিয়া এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল যাহার আড়ালে ওই হাসিটা প্রচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উর্ধোৎক্ষিপ্ত শিখরের তুষারের শুভ্রতায় সেই বিদ্রূপের হাসির নির্জীব ছটা অনির্বাণ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এতদিন তাহার হাসি দেখিয়া অপরে রাগিত, এবার তাহার রাগিবার পালা, নিজের উপরে। সারাদিন ওই হাসি। আবার ঘুমের মধ্যেও ওই হাসিটা নিঃশব্দে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া তাহার স্বপ্নকে পীড়িত করিতে থাকে। স্বপ্ন ও জাগরণের ভীতির সাঁড়াশি আক্রমণে আকাট পাগল হইয়া যাইবার মতো হইল।

কিন্তু সে পাগল হইল না। তার কারণ সংসারে পাগলামির একমাত্র ধন্বন্তরি ঔষধ সে পান করিয়া বসিল। আকাট বিবাহ করিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলে। তখন তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বাস্তবরূপ দেখে না, পরস্পরের স্বপ্ন দেখে। যতদিন স্বপ্ন চলে, কোন বালাই থাকে না, কারণ স্বপ্ন চালনার কোন খরচ নাই। কিন্তু ক্রমে স্বপ্ন কাটিয়া আসিতে থাকে, আর বাস্তবরূপ ধীরে ধীরে চোখে পড়িতে আরম্ভ করে।

এতদিন আকাট তাহার পত্নীর স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেদিন মোক্ষদা-সুন্দরীকে চোখে পড়িল। মোক্ষদাসুন্দরী তাহার স্ত্রীর নাম বটে। মোক্ষদাকে চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাট দেখিল তাহার একটা নাক আছে, আর নাকে আছে একটা মস্ত নথ।

ওদিকে মোক্ষদারও চোখে পড়িল—তাহার স্বামীর ঠোঁটে একটা বিদ্রূপের হাসি। মোক্ষদা ভাবিল ওই হাসিটা নিশ্চয় তাহার নথটা লক্ষ্য করিয়া। কারণ অনেক স্থানেই তাহার নথটা হাসি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে কখনো ভাবিতে পারে নাই তাহার স্বামীও এটা লইয়া বিদ্রূপ করিবে।

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বড় যে হাসছ! একটা দিতে তো পারো না।

স্বামী বলিল—হাসলাম আবার কই ?

স্ত্রী বলিল—আমি যেন কিছু বুঝি না ! বয়স কত অনুমান করো !

এখন মোক্ষদার বয়স লইয়া একটু গোলমাল ছিল। তাহার বয়স পিতৃপক্ষ কম বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিল। এটা এমন নূতন কিছু নহে। পুরুষের বয়স চাকুরীর খাতায় কম করিয়া লিখানো হয়। আর মেয়েদের বয়স বিবাহের বেলায়।

স্বামী-স্ত্রীতে এই ঝগড়া সুরু হইয়া গেল। কোন্ স্বামী-স্ত্রীতে না ঝগড়া না হয়। এখনকার দিনে যমুনা পার হইয়া মথুরায় গিয়া বিরহ যাপনের সুবিধা নাই। দাম্পত্য ক্রোধের কুটিলা গতিই এখন যমুনার কাজ করে। কাজ করিবার ফলে উভয়ে কিছুদিন (কয়েক ঘণ্টাও হইতে পারে) মাথুর পালা উদ্‌যাপন করে—তারপরে আবার ভাব-সম্মিলন।

কিন্তু সাধারণ স্ত্রীর তুলনায় মোক্ষদাসুন্দরী কিছু বেশি অভিমানী, বিশেষ তার দুর্বল স্থান ওই নথটা। নথটা নাকি তাহার পরলোকগতা মাতার সম্পত্তি, ·তাই বিশেষ যত্নে সে নাকে ধারণ করিত, অবশ্য পাকা সোনায় তৈরী—সেটাও অন্যতম কারণ।

একদিন গভীর রাত্রে মোক্ষদা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার স্বামীর ঠোঁটে সেই বিদ্রূপের হাসি। ভাবিল স্বামী নিদ্রিতা পত্নীর নাকে নথটা দেখিয়া হাসিতেছিল—এখন ঘুমের ভান করিতেছে। আকাট সত্যই ঘুমাইতে-ছিল—হাসিটা তাহার স্বাভাবিক—অর্থাৎ অস্বাভাবিক। স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল। বলিল—ঘুমিয়েও কি একটু শান্তি পাবো না ?

আকাট বলিল—অশান্তি কি ? ঘুমোও না।—ঘুমোও না !

তোমার কি হচ্ছিল ?

আকাট বলিল—ঘুম !

—বটে ! আর মিথ্যে বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝি !

সে যে কি বোঝে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিল না বটে, কিন্তু পরদিনই সে বাপেরবাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে শ্বশুরবাড়ীর যাবতীয় অস্থাবর লইয়া গেল। কেবল স্থাবর বলিয়া বাড়ীটি লইতে পারিল না।

আকাট বুঝিল যে তাহার দাম্পত্য-জীবন শেষ হইল। ওই বিদ্রূপের

হাসিটাই ইহার মূল। তখন সে লোটা কম্বল লইয়া, গেরুয়া পরিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সংসার ছাড়িল।

আকাট শুনিয়াছিল সন্ন্যাসীরা বনে যায় কিন্তু বন যে ঠিক কোথায় তাহা সে জানিত না। বাংলা দেশের লোকে সুন্দরবনের নাম জানে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নামটাও জানে। সন্ন্যাসীর প্রতি বাঘের আচরণ কি রকম সে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আকাটের হইল না। কাজেই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া বিন্ধ্যাচলের একখানা টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ীখানা তৃতীয় শ্রেণীর। তার একান্তে দুইজন সাহেবী পোষাক পরিহিত যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে ইহলোক, পরলোক, সন্ন্যাস, সংসার আসক্তি, 'ত্বয়া, হৃষীকেশ', 'মাফলেষু', ইত্যাদি গভীর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এসব আলোচনার অধিকার তাহাদের আছে, কারণ তাহারা জীবন-বীমার দালাল। এখনি বর্ধমানে নামিয়া জীবন-বীমার শিকার সন্ধান সুরু করিবে।

যুবকদের মধ্যে ক বলিল—ভোগের দ্বারাও ত্যাগের ভূমিকা সৃষ্টি করতে হয়। ভোগ না করিলে ত্যাগ করা যায় না।

'খ' বলিল—ত্যাগই যদি করতে হয় তবে আবার ভোগের উৎপাত সৃষ্টি কেন?

'ক' বলিল—মেঘ না হলে কি বৃষ্টি সম্ভব? মেঘটা সঞ্চয়—বৃষ্টি ত্যাগ!

'খ' বলিল—আমাদের দেশে কত সাধু-সন্ন্যাসী আছেন—সবাই কি ভোগী ছিলেন?

'ক' বলিল—যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী এক সময়ে ভোগী ছিলেন—তাঁরাই ত্যাগে শান্তি পেয়েছেন। যাঁরা ভোগের বস্তুর অভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের cynic বলা যেতে পারে।

এমন সময়ে 'ক'-র দৃষ্টি আকাটের দিকে পড়িল—এবং তাহার ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটি সে দেখিতে পাইল।
তখন সে 'খ'কে ডাকিয়া বলিল—ওই দেখ এক গেরুয়াধারী। কিন্তু ওর ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটা লক্ষ্য করেছ? ওর ভোগের মূল ক্ষয় হয়নি।

ভোগের ইচ্ছা ওর ষোল আনা আছে, কিন্তু সংসার ওর সম্বন্ধে কৃপণ। ওই হাসি দিয়ে সে সংসারকে ধিক্কার দিচ্ছে।

'খ' সমস্তই দেখিল। এমন চাক্ষুষ প্রমাণের পরে আর তর্ক চলে না। তাই সে একটি সিগারেট ধরাইল।

আকাট দেখিল সে আবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বিন্ধাচল যাওয়া তার আর হইল না। সে 'থানা জংশনে' নামিয়া পড়িল। স্টেশনের পাশে এক বটগাছতলায় সে আস্তানা পাতিল। কিন্তু গেরুয়া একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। সন্ন্যাসী দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার শিষ্য জুটিতে সুরু করিল। তাহার শিষ্যরাও সেই হাসিটি লক্ষ্য করিল—তাহারা গুরুর নাম দিল 'হাসিয়া বাবা'।

সারা জীবন সে হাসির কুফল ভোগ করিয়া আসিয়াছে—এইবারে হাসির সুফল ভোগ করিবার তাহার পালা! শুধু সুফল নয় সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, সন্দেশও ছিল। বিধাতাপুরুষকে একেবারে নির্দয় বলা যায় না—ওই অনিচ্ছাকৃত হাসিটি যদি তিনি দিয়া থাকেন, তবে তাহার বাবদ এবার অমৃতবণ্টনও তিনিই করিলেন। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাত্রে তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে—ইহাই হইল তাহার সব চেয়ে বড় মাহাত্ম্য। হাজার হাজার বছরের দুঃখে কষ্টে যে দেশের লোক হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা ওই হাসির ছটায় আধ্যাত্মিক স্বর্গের চরম দীপ্তি দেখিতে পাইল। এবং তাহার ফল স্বরূপ আকাটের বৃক্ষতলাশ্রিত আস্তানা অচিরকালের মধ্যে সুবৃহৎ মন্দিরে পরিণত হইল। ইহাতে বিধাতাপুরুষ বিস্মিত হইলেন কিনা জানি না, তবে আকাট হইল। কিন্তু অনেক ঠেকিয়া তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল—তাই সে কিছু প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর হইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। এইভাবে দীর্ঘকাল 'থানা জংশনে' সে কাটাইল। তাহার নাম ও খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—কাজেই বহু লোকের মোহ মুক্তির দলস্বরূপ বহুতর ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর সঞ্চয় করিয়া অবশেষে একদিন 'হাসিয়া বাবা' দেহরক্ষা করিল।

এইরূপে আকাট মণ্ডলের জীবন শেষ হইল। কিন্তু একেবারে শেষ

হইল না। শিষ্যরা গুরুর দেহ সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপরে প্রকাণ্ড এক মঠ তৈয়ারী করিয়া দিল—তাহার নাম দিল 'হাসিয়া বাবার মঠ।'

হাসিয়া বাবা স্বর্গে গেল। নস্তর বালকসুলভ অনবধানতায় সারা জীবন সে দুর্ভোগে ভুগিয়াছে—তাহাই সে বিধাতার কাছে নালিশ করিল। বিধাতা নথীপত্র দেখিয়া ন্যায়বিচার করিলেন। আকাটের পুণ্যফল নস্তর হিসাবে জমা করিয়া দিলেন—কারণ নস্তু-ই তাহার পুণ্যের কারণ। আর আকাটের মাটির পিণ্ডটাকে চটকাইয়া শিল্প শাখার একান্তে ফেলিয়া রাখিলেন—নূতন মূর্তি তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে! ইহার পরেও কে বলিবে যে বিধাতাপুরুষ নিরপেক্ষ নহেন।

প্র. না. বি-র সঙ্গে কথোপকথন

বহুকালের বাসনা ছিল জগদ্বিখ্যাত লেখক প্র. না. বি-র সঙ্গে একবার দেখা করিব। কলিকাতায় তাঁহার সন্ধান না পাইয়া who's who পরিচয় গ্রন্থে দেখিলাম তিনি মধুপুরে থাকেন। মধুপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্টেশন হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে কোন অসুবিধা হইল না, ছোট জায়গায় বড়লোক থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নয়।

তাঁহার বাড়ী পৌঁছিয়া শুনিলাম তিনি শিকার কবিতে বাহির হইয়াছেন—এখনি ফিরিবেন। চাকরে আমাকে একটি কক্ষে বসাইল। শীতকাল। সকালবেলা। ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বাহিরে রোদে বেড়ানো আরামজনক। বাগানের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলাম। বিস্তৃত বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীটা বড় বলিলে বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না—এ যেন একটা দুর্গ। রাজপুতানার একটা মরু-দুর্গ সশরীরে তুলিয়া আনিয়া সাঁওতাল পরগণার মাঠের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

বাগানে আম গাছ, পেয়ারা গাছ, আতা গাছ, তা ছাড়া বড় বড় শাল, মহুয়া, হরীতকীও প্রচুর। ফুলের গাছের মধ্যে গাঁদা—জলন্ত ফুলে উজ্জ্বল। প্রাচীরের গা দিয়া একসার স্থলপদ্মের গাছ। স্থলপদ্মের সময়

শরৎকাল—কিন্তু তখনো কিছু কিছু ফুল ছিল। মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটা বেদী। সেই বেদীতে গিয়া বসিলাম।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু আসিয়াছেন। আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া পূর্ববর্ণিত সেই কক্ষে গিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু কক্ষের মধ্যে এ কে? সাত ফুট লম্বা, ব্রিচেস্‌-পরা, চাপ দাড়ি গালের দুইদিকে ভাঁজ করিয়া তুলিয়া দেওয়া প্রৌঢ় এক ব্যক্তি! পাতিয়ালা বা আলোয়ারের মহারাজা হইলেও হইতে পারে।

উক্ত ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া আমার করমর্দন করিয়া বলিলেন—আমার জন্য আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'য়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত; আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম।

তবে ইনিই জগদ্বিখ্যাত প্র. না. বি।

আমি বলিলাম—না, না, কষ্ট আর কি? বাগানে ঘুরে দেখ্‌ছিলাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এবারে দেখিলাম ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মরা ভালুক পড়িয়া আছে। প্র. না. বি বলিলেন—এটাকে আজ শুয়া পাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করলাম। ক'দিন থেকে জন্তুটা লোকের ক্ষেত-খামারের উপর বড়ই উপদ্রব করছিল। শীতকালে ভালুকের উপদ্রব বড় হয় না, বসন্তকালে মহুয়া ধরতে আরম্ভ করলে এরা ছোটনাগপুরের দিক থেকে পালে পালে এসে উপস্থিত হয়। তখন দিনে তিন চারটে পর্যন্ত মেরেছি।

আমি বলিলাম,—আপনার যে শিকারের অভ্যাস আছে তা জানতাম না।

তিনি হাসিয়া বলিল—গোড়ায় মানুষ শিকার ক'রে হাত পাকিয়েছি—এখন জন্তু শিকারে আর বেগ পেতে পেতে হয় না। নৈতিক বিচারে পশু বড় কিন্তু বুদ্ধিটা মানুষের বেশি এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

আমার তখন প্র. না. বি-র শ্লেষ-তীক্ষ্ণ রচনার কথা মনে পড়িল।

প্র. না. বি বলিলেন চলুন যাই বাইরে গিয়ে রোদে বসা যাক্‌।

দু'জনে বাহির হইলাম। বাগানের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকের ছোট একটি কাঠের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীটা অদ্ভুত। কাঠের

একটা স্তম্ভের উপর উপর ঘরটি—যেদিকে খুশী ঘোরানো চলে। তিনি ঠেলা মারিয়া ঘুরাইয়া বাড়ীটাকে রৌদ্রমুখী করিলেন। তারপরে আমরা দু'জনে বসিলাম।

খান কয়েক আরাম কেদারা ছিল।

প্র. না. বি বলিলেন—বাড়ীটার নাম রেখেছি সূর্যমুখী। যে দিকে সূর্য থাকে সে দিকে মুখ করে দি।

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন—সে কি হাসি, সে কি শব্দ—যেন পাহাড়ের গা বাহিয়া তুষার স্তূপ ধসিয়া পড়ি—যেমন শব্দ, তেমনি শুভ্রতা!

আমি বলিলাম—আপনি বিখ্যাত লেখক কিন্তু সেই জন্যই যে শুধু দেখা করতে এসেছি তা নয়। আপনার নামের সঙ্গে আমার নামের আদ্যাক্ষর সাদৃশ্যে অনেকে আমাকে প্র. না. বি মনে করে থাকবে। সেটা আমার পক্ষে গৌরবের হ'লেও—আপনার পক্ষে অপমানের, তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি।

প্র. না. বি আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ক্ষমা চাইবেন কেন? তাহলে আমাকেও তো ক্ষমা চাইতে হয়। কারণ আপনার অনেক লেখার জন্য আমি অভিনন্দন পেয়েছি; বহু লোক আমাকে আপনি মনে করেন।

তারপরে বলিলেন—এ বড় মন্দ মজা নয়। আমরা দু'জনে ভিন্নলোক—অথচ বাঙালী পাঠক কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন কেন হয়? তিনি বলিলেন—এটা মানসিক আলস্য ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙালী জাতের মধ্যে একটা শান্তি এসেছে, সমস্যা সমাধান করবার সহজতম পন্থা তারা এখন চায়। কোন সমস্যাকে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে সমাধান করবার ধীরতা তাদের নেই। অথচ অনেক সমস্যা আছে যার সমাধানের পক্ষে কিছুকাল ঝুলে থাকা আবশ্যক। যেমন ধরুন, গাছের ফল। তাকে সংগ্রহ করবার আগে দেখ্‌তে হয় ডালে ঝুলে থাক্‌বার কাল তার পূর্ণ হ'য়েছে কিনা।

ক্রমে বাংলা সাহিত্যের কথা উঠিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এখন রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাকে মনে করেন।

প্র. না. বি বলিলেন—আমার মতে নজরুল ইসলাম ও মোহিত মজুমদার —এঁরা দু'জনে এখন কবিশ্রেষ্ঠ।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—এঁদের দুজনের নাম আপনার এক সঙ্গে মনে হল?

—কেন হবে না? নজরুলের creative energy বেশি—কিন্তু শিল্প-জ্ঞান বড় কাঁচা। মোহিতবাবুর creative energy কাজির চেয়ে কম কিন্তু শিল্পচৈতন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। যে-পরিমাণে তাঁর শিল্পচেতনা আছে সে পরিমাণে Poetic energy থাকলে তিনি great poet হ'তে পারতেন। কাজির শিল্পচেতনা ও Poetic energy সমমূল্য হ'লে তিনিও great poet হ'তে পারতেন।

আমি বলিলাম—আপনি নিজেকে কেন বাদ দিলেন?

প্র. না. বি বলিলেন বাঙালী কবিদের মধ্যে আমাকে ধরলে বেচারাদের প্রতি অবিচার করা হয়। আমাকে পৃথিবীর মহা কবিদের সঙ্গে বিচার করবেন—হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়র—প্রভৃতির আমি সগোত্র।

—এ বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি ভাবিলাম ঠিক প্র. না. বি-র মতই হইয়াছে বটে। লোকে এই সব কথা শুনিলে রসিকতা মাত্র ভাবিবে—কিন্তু তাহারা তো এই হাসি দেখিতে পাইল না!

তিনি বলিলেন—আমি জানি লোকে আমাকে অহঙ্কারী ভাবে কারণ আমি নিজের কথা সর্বদা বলি—কিন্তু ঠিক তার উল্টো; বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে সে নিজের কথা বলে। অহঙ্কারী ব্যক্তিই অন্যের কথা আলোচনা করে। বিনয়ী জানে যে তার বুদ্ধি সামান্য—খুব বেশি হ'লে কেবল নিজের কথাই তার পক্ষে জানা সম্ভব। অন্যের মনের কথা সুদ্ধ জেনে ফেলেছি—এতখানি স্পর্ধা যার—তাকে অহঙ্কারী ছাড়া আর কি বলবো?

এমন সময়ে ভৃত্য চা আনিয়া হাজির করিল।

প্র. না. বি আমাকে চা ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দেখিলাম তিনি নিজের চায়ে চিনি নিলেন না। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—আপনি ভাবছেন আমি চায়ে চিনি খাইনে কেন? না, কোন রোগের

জন্ম নয়, পাছে মিষ্টি খেয়ে স্বভাব মধুর হ'য়ে ওঠে সেই ভয়ে চিনি খাওয়া ছেড়েছি।

বুঝিতে পারিলাম না তাঁহার কথা সত্য না ঠাট্টা! প্র. না. বি-র লেখা পড়িয়া পাঠকেরও ইহাই নিশ্চয় মনে হয়।

কথায় কথায় বাংলা নাটকের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন—গত ১০।১২ বছরের মধ্যে দু'খানি ভালো বাংলা নাটক বেরিয়েছে। রবিমৈত্রর মানময়ী গার্লস স্কুল আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুরুষ।

বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন—বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই নেই—অতীতও ছিল না। তারপরে বলিলেন—বাংলা নাটক সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল, কিন্তু সে সুযোগ বাঙালী লেখক নিতে পারেনি। বাংলা দেশের নিজস্ব বস্তু ছিল যাত্রা। বাঙালী যখন ইংরেজি শিখ্‌তে আরম্ভ করলো, তখন যদি সে বিদেশী আদর্শের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এদেশে আমদানীর চেষ্টা না ক'রে যাত্রার শিল্পকে পরিবর্তন করে নিতে পারতো, তবেই প্রকৃত বাঙালীর নাট্যশিল্প গড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু একথা তখন কারো মনে হয়নি। সাহিত্যিক সব শিল্পকলার মধ্যে নাটক-ই হচ্ছে সব চেয়ে একান্ত-ভাবে স্বদেশী। ওর মধ্যে বৈদেশিক ভেজাল চলে না। বিদেশী এদিকের আদর্শে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা সম্ভব—কিন্তু নাটকে তা একেবারে অচল। যাত্রা শিল্প উঁচুদরের নয়, কিন্তু সেক্সপীয়র সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে যে নাট্যকলা পেয়েছিলেন—তা যাত্রার চেয়ে উঁচুদরের ছিল না। নিজের প্রতিভায় তিনি তৎকালীন নাট্যশিল্পকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকলায় পরিবর্তন করে গিয়েছিলেন। এদেশে যে সেক্সপীয়র জন্মায় নি, তাতে বিস্মিত হচ্ছি না—কিন্তু সেক্সপীয়রের বাস্তবজ্ঞান যে কারো হয়নি—সেটাই বিস্ময়ের।

এখন আর যাত্রা শিল্পকে পরিবর্তন করা সম্ভব না। একে তো ও শিল্পটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে—ওকে আর জীবিত বলা চলে না। সজীবেরই পরিবর্তন সম্ভব—মৃতের নয়। তারপরে আমরা ভ্রান্ত শিল্প আদর্শ অনুসরণ

ক'রে এতদূর চলে এসেছি যে আর ফেরা সম্ভব বলে মনে হয় না। কাজেই বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ যে আছে এমন কথা বলি কি ক'রে?

অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম; বলিলাম—আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পাইলাম।

প্র. না. বি হাসিয়া বলিলেন—আমিও কম আনন্দ পাইনি। এখানে লোকজন বড় কেউ আসে না। আবার একদিন এলে খুশী হ'ব।

তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম—এই কথোপকথন লিখিয়া দেখিব—তাহা হইলে পাঠকদের প্র. না. বি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে—আর আমরা যে দুইজন লোক একথাও বুঝিতে পারিবে।

নূতন বজ্র

দেবরাজ ইন্দ্র কৈলাস-শিখরে মহাদেবের নিকটে গিয়া বলিলেন—দেবাদিদেব, সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।

মহাদেব শুধাইলেন—কি হইয়াছে বৎস?

ইন্দ্র বলিলেন—পুনরায় দৈত্যেরা স্বর্গ কাড়িয়া লইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

মহাদেব বলিলেন—দধীচির হাড়ে গড়া সেই বজ্রখানা আছে না?

ইন্দ্র বলিলেন—আছে। তাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম কিন্তু ফল হইল না। তার পরে একটু থামিয়া বলিলেন—'এ সব দৈত্য নহে তেমন।'

মহাদেব কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—বৎস, ঠিক হইয়াছে।

ইন্দ্র বলিলেন—হইবেই তো।—এই বলিয়া ইন্দ্রের সভাকবি বৃহস্পতি যে সংস্কৃত শ্লোকটা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আবৃত্তি করিলেন।

মহাদেব বলিলেন—যদিও উহার অর্থবোধ হইল না, তবু আশা করি উহা আমার প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইন্দ্র বলিলেন—আপনি যথার্থ বুঝিয়াছেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তবে শোন বৎস, বঙ্গদেশের রাজধানীতে যাও। সেখানকার সবচেয়ে বড় ময়দার গুদামের পাশে সবচেয়ে বড় সংবাদ পত্রের অফিস। সেই অফিসে ঢুকিয়া সম্পাদককে দেখিতে পাইবে. তাহাকে দেবতাদের উপকারের জন্য নিজের অস্থি দান করিতে বল। সেই অস্থি দিয়া বজ্র গড়িয়া নিক্ষেপ কর—জগতে এমন দৈত্য নাই, যাহারা সে অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে পারে।

ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সম্পাদক তো সামান্য মানুষ!

মহাদেব ইন্দ্রের অজ্ঞতায় হাসিয়া বলিলেন—বৎস, সম্পাদক সামান্য মানুষ নয়! যাও, দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

ইন্দ্র মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

২

মহাদেব কিছু কম করিয়া বলিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের অফিসের একদিকে ময়দার গুদাম, একদিকে বৃহৎ গোশালা, একদিকে কশাইখানা, আর একদিকে জেলখানা—মাঝখানে সেই অফিস।

দরজায় শুণ্ডহীন গণেশের মত দুই ভোজপুরী দারোয়ান বসিয়া বাম করতলে খৈনি টিপিতেছে; ইতস্ততঃ কৃশকায় বিরলভূষণ কালিঝুলি মাখা কম্পোজিটারের দল ঘুরিতেছে—যেন মহাদেবের সব অনুচর; ভিতরে কয়েকটা মুদ্রাযন্ত্র ভীষণ আর্তনাদে রত,—যেন লৌহদানব। দোতালার সিঁড়িটা এতই খাড়া যেন স্বর্গের দিকে উঠিয়াছে;—যাহোক—ইন্দ্রের স্বর্গে ওঠা অভ্যাস ছিল বলিয়াই তাহা দিয়া কোনমতে উঠিয়া সম্পাদকের খাস কামরায় গিয়া পৌঁছিলেন। সহকারীগণ পরিবৃত সম্পাদককে দেখিয়া তাঁহার নয়ন সার্থক হইল। সম্পাদকের টাকের উপরে ঘন ঘন বিশ্বচক্র অবর্তিত হইতেছে—ইহা দেখিয়া সত্যই তাঁহার মনে হইল যে ইনি সামান্য মানুষ নহেন। কিন্তু উপরে চাহিতেই দেখিলেন বিশ্বচক্র নয়, বিদ্যুতের পাখা ঘুরিতেছে, তারই ছায়া সম্পাদকীয় মসৃণোজ্জ্বল টাকে প্রতিফলিত হইতেছে।

সম্পাদক তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া খানিকটা 'খৈনি' মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন; তার পরে এক টিপ নস্য লইয়া নাকে পুরিলেন, একপাত্র কি যেন তরল সুগন্ধি পান করিলেন, অবশেষে একটা সিগারেট ধরাইলেন—এই রূপে নেশা চতুষ্টয় চর্চা সমাধা করিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গদ্য না পদ্য?

ইন্দ্র বুঝিলেন—স্তোত্রপাঠের কথা হইতেছে। তিনি সম্পাদক-বন্দনা পদ্যে লিখাইয়া আনিয়া ছিলেন, তিনি পদ্যে সম্পাদক বন্দনা পাঠ করিলেন।

সম্পাদক খুসি হইয়া বলিলেন—বাঃ, বেশ তোমার হাত।—হাসিবার সময়ে সোনায় বাঁধা দুটি দাঁত ঝলক মারিয়া উঠিল।

শুধাইলেন—কেন আসিয়াছ?

ইন্দ্র বলিলেন—মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সম্পাদক আশাভঙ্গের সুরে বলিলেন—ওঃ মহাদেব!—আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি লাটসাহেব।

সহকারীর দল তালে তালে মাথা নাড়িয়া উঠিল!

সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন—দরকারটা কি?

ইন্দ্র বলিলেন—আর কিছুই নয়, স্বর্গ উদ্ধারের জন্য আপনার প্রাণ দিতে হইবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বলিলেন—মাত্র এই? তবু ভাল, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছ।

বড় সহকারী বলিলেন—আমাদের দাদা প্রাণ দিতে কৃপণ নহেন।

মেজো সহকারী বলিলেন—কবি তো ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
ফেলিব সবারে গালিতে পাড়ি
যত দেশ আছে বিকাতে পারি,
যত ছেলে আছে বকাতে পারি,
দেশের জন্য ঠকাতে পারি
ক্রমে হবে মোর ওজন ভারি

তবে আর কি বা চাই
পরাণের সাধ তাই!

সম্পাদক লজ্জায়, স্নেহে গলিয়া বলিলেন—কি ছাই বলিস্—যাঃ, আজ থেকে তোর পাঁচসিকে মাইনে বেড়ে গেল।

অতঃপর সেজো সহকারী আরম্ভ করিল—জানেন মশাই, দাদা কতবার প্রাণ দিয়াছেন—একবার যুধিষ্ঠির পার্কে, একবার ভীমসেন পার্কে, একবার রঘুপতি পার্কে, একবার যাজ্ঞসেনী পার্কে, কত আর বলি? প্রাণ দিতেই আছেন।

ছোট সহকারী বলিল—দেখুন না, দাদার জ্ঞান আর গর্দান কেমন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সম্পাদক বলিলেন—আঃ, তোরা থাম না। নিজের প্রশংসা আর শুনিতে পারি না। এই তিনি আরম্ভ করিলেন—

আপনি আত্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আমার আর আছে কি? কিছু টাকা, খান কয়েক বাড়ী, দু'খানা গাড়ী, আর কয়েক মণ মাংস—এ ছাড়া আর আমার আর কি আছে? এমন কি বিবাদ পর্যন্ত করিবার অবসর পাই নাই। দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য এখানে স্থাণুবৎ বসিয়া টাকের পেরিস্কোপে চরাচরের প্রতিবিম্ব ফেলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি—

মেজো বলিল—দাদা আমাদের জ্ঞান সমুদ্রের সাবমেরিন।

সেজো বলিল—প্রতিদিনের দৈনিক কাগজ এক একটি টর্পেডো—তার ঘায়ে যে কত মিলন, কত প্রণয়, কত মস্তিষ্ক, কত সভা ভাঙিতেছে তার ইয়ত্তা নাই।

সম্পাদক বলিলেন—স্বার্থত্যাগের কথাই যদি উঠিল—তবে বলি, আমার মত স্বার্থত্যাগী কয় জন আছে? আমি দেশের জন্য প্রতিদিন এক গণ্ডা মুরগী, দু'ডজন ডিম, আড়াইটা খাসি, এক হন্দর রুটি, একশত পান্তুয়া, অর্ধমণ দই, চার বোতল 'হোআইট হর্স' খাইয়া থাকি। ডাক্তারে বলে—শেষে যে সন্ন্যাস রোগে মারা যাবেন। আমি বলি—ডাক্তার, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস রোগে ছাড়া আর কিসে মারা যাবে? আমি যে ইকনমিক সন্ন্যাসী, এতে আমার ক্ষতি কত দেখুন; আগে লাগিত ৫নং জুতা—এখন লাগে ১৩নং

জুতা। কত বেশি দাম দিতে হয়! আগে জামা তৈরী করিতে লাগিত ৫ গজ কাপড়—এখন লাগে ১৷৷ থান—আবার দেখুন, কত বেশি দাম দিতে হয়।

আরও দেখুন, দেশের জন্য সত্য মিথ্যার ভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছি; ভাল-মন্দর দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়াছে! আত্মপর বোধ নাই; শত্রুমিত্র জ্ঞান নাই এমন কি, মানুষকে আর মানুষ বলিয়া মনে হয় না। আর্টের জন্যই যেমন আর্ট—আমি তেমনি দেশের জন্যই দ্বেষের সাধনা করিতেছি। স্বার্থত্যাগ আবার কাহাকে বলে?

তার পরে দেখুন, দেশের জন্য আমার কলম সিঁধকাঠি হইয়া উঠিয়াছে—ইহা যদি স্বার্থত্যাগ না হয় তবে স্বার্থত্যাগ কি? বুড়া দধীচি এমন আর কি করিয়াছিল? জীর্ণ অস্থি কয়খানা দেওয়াতে এমন আর কি মাহাত্ম্য! আমি মরিলে না হয় আমার অস্থি কয়খানা লইয়া যাইবেন।

ইন্দ্র বলিলেন—কিন্তু আমরা যে আর অপেক্ষা করিতে পারি না।

সহকারীরা কোরাসে বলিয়া উঠিল—দাদার যে এত মাহাত্ম্য জানিতাম না। দধীচির হাড়ের চেয়েও তাঁহার হাড় দৃঢ়তর! অহো কি লোকের সাহচর্যের সৌভাগ্যই না করিয়াছি।

সম্পাদক ঘাড়ের উপরে টার্কিশ-তোয়ালেখানা ফেলিয়া বলিলেন—একটু বসুন, আমি আসিতেছি।

সম্পাদক গেলে ইন্দ্র সহকারীদিগকে বলিলেন—আপনারাও মহানুভব ব্যক্তি, আপনাদের দাদাকে অমরত্ব লাভে সাহায্য করুন না কেন?

সকলে কহিল—বুঝিয়াছি। আমাদের কিছু পুরস্কার দিন—আপনার কাজ করিয়া দিতেছি।

ইন্দ্র ভাবিলেন, কি দিলে ইহারা খুসি হইবে।

সকলে বলিল—বেশি কিছু নয়—এক প্যাকেট করিয়া সিজার্‌স্‌ সিগারেট পাইলেই হইবে।

ইন্দ্র সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

অমনি সহকারীগণ বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িয়া (সম্পাদক যেখানে মধ্যাহ্নের স্নান সারিতেছিলেন) বিনা বাক্যব্যয়ে গলা টিপিয়া সম্পাদককে মারিয়া ফেলিয়া ইন্দ্রকে বলিল—দাদা অমর হইয়াছে, হাড় লইয়া যান।

ইন্দ্র ভাবিলেন—সর্বনাশ, এ সব দৈত্য স্বর্গ আক্রমণ করিলে কেমন করিয়া রক্ষা করা যাইবে! যাহা হোক—তিনি হাড় লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

৩

সেই হাড়ে বিশ্বকর্মা নূতন বজ্র গড়িল। ইন্দ্র যুদ্ধোপলক্ষ্যে তাহা দৈত্যদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সম্পাদকীয় বজ্র সপ্তভুবন কম্পিত করিয়া দৈত্য কুলকে নিঃশেষে পুড়াইয়া মারিল। স্বর্গ নির্দৈত্য হইল। ইন্দ্র পুনরায় সিংহাসনে বসিল—দেবগণ স্বর্গ অধিকার করিল।

ইন্দ্র সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ময়দানবকে দিয়া তাঁহার একটা পাথরের মূর্তি গড়াইয়া সভাগৃহের কোণে স্থাপন করিলেন। পাথরের মূর্তি স্থাণুবৎ রহিল কেবল উর্বশী নাচিতে আরম্ভ করিলে সেই পাথরের মূর্তি নড়িয়া চড়িয়া উঠিত।

দেবতারা ভাবিত, শিল্পীর কৌশলে মূর্তি জীবন্তবৎ। কিন্তু মানুষেরা জানে আসল ব্যাপার কি!

টেনিস-কোর্টের কাণ্ড

টেনিস-কোর্টে ইতিহাসের দুটি বড় ঘটনা ঘটিয়াছে। একটির কথা ফরাসী বিপ্লব উপলক্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর একটি অজ্ঞাত। আজ তাহারই কথা বলিব। শেষেরটি রজতরঞ্জনের জীবনে বিপ্লব আনিয়াছে।

রজতরঞ্জন ধনীর পুত্র, কোন জিনিসের অভাব তাহার ছিল না, এমন কি বুদ্ধিরও নয়। স্কুল হইতে কলেজ, কলেজ হইতে চাকুরী, সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছে। কেবল বিবাহটা বাকী। যাহার এতগুলা বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ওটা তাহার কাছে তুচ্ছ। বন্ধুরা ভাবিত রজত কবে না জানি রাজকন্যার সংবাদে তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবে। রজত নিজেও তাহা অবিশ্বাস করিত না।

রজত ধনী, কিন্তু ধন সব চেয়ে বড় মূলধন নয়। বড় লোকের ছেলে শিশু বয়স হইতে পৃথিবীকে নিজের বলিয়া ভাবিতে শেখে; বয়স বাড়িলে এই আত্ম-প্রত্যয় তাহার সব চেয়ে বড় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। স্কুল হইতে যে-ছেলে অভাবে জীবন শুরু করিল, সৌভাগ্যের পূর্ণতম কোটালেও তাহার আত্ম-প্রত্যয় আর ফিরিয়া আসিবে না। রজতরঞ্জন আত্ম-প্রত্যয়ের ধনে ধনী। কোন রাজকন্যা যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহা সে কল্পনাই করিতে পারিত না। এবং খুব সম্ভব সে বিশ্বাস করিত, একদিন এস্‌প্লানেডের মোড়ে, রাজার পাটহাতী তাহাকে শুঁড়ে করিয়া পিঠে তুলিয়া লইবে।

এহেন রজতরঞ্জন জীবনে একবার ঠকিয়াছিল; ঠিক ঠকে নাই, কেবল তাল কাটিয়া গিয়াছিল, 'লনে' আসিবার পূর্বেই সানাইয়া লইয়াছিল। গল্পটি তাহারই ইতিহাস।

বালিগঞ্জ পার্কের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার বৃত্তাকারে চোখ ঘুরাইয়া লইলে যে-বাড়ীটা উচ্চতম বলিয়া মনে হয়, তাহার একমাত্র মালিক শ্রীমতী রেবা রায়,—সুন্দরী, শিক্ষিতা, প্রাপ্তবয়স্কা, ধনী এবং সম্পূর্ণ ভাবে অভি-ভাবকহীন। এক কথায়, উক্ত অঞ্চলের যুবকদের পক্ষে এই তম্বী রমণী অদৃশ্য মৎস্য-লক্ষ্যের মত একান্ত দুর্লভরূপে বিরাজিত। কত হতভাগ্য যে শ্রীমতী রেবার পাষাণ সোপানে ভগ্নহৃদয় হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে বলিয়াই, বোধ হয়, কেহ লিখিয়া রাখে নাই। শেষে সকলের বিশ্বাস জন্মিল, এ লক্ষ্য কেবল রজতরঞ্জনের আয়ত্তাধীন।

রজতরঞ্জন বিকালবেলা ক্লাবে টেনিস খেলিতেছিল। বন্ধুরা আসিয়া বলিল,—"রজত, এতদিনে তোমার যোগ্য মেয়ে পাওয়া গেছে, বিয়ে কর।" বন্ধুদের কাছে আদ্যন্ত ইতিহাস শুনিয়া সে বিস্মিত হইল; তাইত, তাহার বাড়ীর এত নিকটে রাজকন্যা, আর সে তাহা লক্ষ্য করে নাই, কেবল অফিস ও টেনিস লইয়া মত্ত! অন্য যুবকদের ভগ্ন হৃদয়ের ইতিহাস তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, বরঞ্চ ভাবিল, তাহার মত এমন সুদক্ষ ভাস্করের নিপুণতা প্রকাশের পক্ষে এমন কঠিন পাষাণেরই আবশ্যক। রজত হাসিয়া বলিল, আচ্ছা রাজি,—ভিনি, ভিডি, ভিসি! বন্ধুরা খুসী হইয়া ফিরিয়া গেল।

যুদ্ধে বিপক্ষের দৃঢ় ঢালখানার উপরে যত আক্রোশ, মানুষটার উপরে তত নহে। দুই পক্ষের মধ্যে ঐ ঢালখানার অন্তরাল না থাকিলে বর্বরের মত হানাহানি হয়তো সম্ভব হইত না। ঢাল ভাঙা লক্ষ্য, মানুষ মারা উপলক্ষ্য। তেমনি রমনীর কৌমার্যের আবরণ পুরুষের পৌরুষকে যেন ধিক্কার দিতে থাকে। কৌমার্যকে সে হিংসা করে, নারীকে হয়তো ভালবাসে। সেইজন্য অত্যন্ত পৃথক হইলেও একত্রে বাস করে। ডন জুয়ান, ক্যাসানোভা কৌমার্য-ভেদের চ্যাম্পিয়ান বলিয়াই এত দোষ সত্ত্বেও আজও তাহারা বাঁচিয়া আছে। রজত আজ সেই ব্রত গ্রহণ করিল দেখিয়া নিজেদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বন্ধুরা খুসি হইয়া ফিরিল। এ খুসি যতটা রজতের আসন্ন বিজয়ে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি রেবার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ে।

পরদিন রজত রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রসাধন করিতে লাগিল। ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, কাশ্মীরী শাল। বন্ধুরা দেখিল হ্যাঁ, রজতকে মানাইয়াছে বটে। তাহারা চট্ করিয়া একখানা ছবি তুলিয়া লইল। রজত সুবৃহৎ মোটর হাঁকাইয়া রেবার বাড়ীতে গিয়া নামিল। চাকরকে দিয়া নিজের কার্ড পাঠাইয়া দিল, এবং কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য তাহাকে পথ দেখাইয়া শ্রীমতী রেবার বৈকালিক চায়ের টেবিলে লইয়া উপস্থিত করিল। পর দিন বন্ধুরা উদগ্রীব হইয়া রজতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। খবর পাইল, রজত বাড়ী নাই, কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে। সকলে তাকাইয়া দেখিল শ্রীমতী রেবার বাড়ীর জানালাগুলি খোলা।— অর্থাৎ রজত একাই গিয়াছে। সকলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল, রজতেরও পরাজয় ঘটিয়াছে, যে রজত ইতিপূর্বে কখনো কোন কাজে পরাজিত হয় নাই!

পশ্চিমে ঘুরিয়া মাসছয় পরে রজত ফিরিল। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত পরাজয়ের স্মৃতি অনেকটা সে ভুলিয়াছে; বোধ করি, পাণিপথ প্রভৃতি বড় বড় ঐতিহাসিক পরাজয়ের স্থানগুলি দর্শনই তাহার কারণ। অনেক-দিন পরে সে টেনিস ক্লাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে ক্লাবে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। টেনিস কোর্টের দুই পাশে খানকয়েক বেঞ্চি পড়িয়াছে, বিকালবেলা মেয়েরা বসিয়া খেলা দেখে, বোধ হয়, ও-প্লেইং হইবার ইহা সূত্রপাত।

রজত দুটো 'গেম' খেলিয়া তৃতীয় 'গেম' এ একটা সমুন্নত বলকে যেমনি 'স্ম্যাশ' করিতে যাইবে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল বামদিকের বেঞ্চিতে একটি তন্বীর প্রতি, বল ফসকাইয়া গেল, রজতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তারপর হইতে রজতের হাতে ক্রমাগত বল ফস্‌কাইতে লাগিল। খেলা আর জমিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রজত ডানদিকের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। খেলোয়াড় ও দর্শকের দল কমিয়া গেলে বামদিকের বেঞ্চি ডানদিকে সরিয়া আসিল, অর্থাৎ বামদিকের তন্বী রজতের নিকটে আসিয়া নমস্কার করিল। রজত মর্মান্তিকভাবে দেখিল বালিগঞ্জের উচ্চতম বাড়ীর মালিক—শ্রীমতী রেবা রায়। রেবা যাচিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল, কিন্তু ছয়মাস আগেকার সেদিনের কোন কথার উল্লেখ করিল না। আলাপ কি হইল জানি না, অন্তত জানিবার দরকার নাই। রজত ও রেবা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। শান-বাঁধানো টেনিস মিশ্রিত জ্যোৎস্না ও বিদ্যুতালোকে চক্‌চক করিতে লাগিল। অদূরে বাড়ীর বারান্দায় খাঁচায় কোকিল বনের কোকিলের উদ্দেশ্যে ডাকিতে লাগিল, এবং মাঘের শেষে হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়ায় ফুলের বদলে দেওয়ালের রঙিন কাগজের শুষ্ক প্রান্ত ক্রমাগত ফরফর করিতে লাগিল। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে কলিকাতায় অকাল বসন্ত আনয়ন করিতে হইলে স্বয়ং ঋতুরাজও ইহার বেশি আয়োজন করিতে পারিবেন না। পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন এবার দুজনের বিবাহ ঘটিবে, কিন্তু তাহা নয়; কারণ, এত সহজে বিবাহ স্বয়ং বালিগঞ্জেও ঘটে না। উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা ওঠে নাই, বটে, কিন্তু পূর্বরাগের সূত্রপাত হইল। রজত ছয় মাসের গ্লানির চিহ্ন সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া এবং রেবা রায়কে নিজের মোটরে করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

সে রাত্রে রজতের ঘুম হইল না; পাঠক ভাবিতেছেন পূর্বরাগের উত্তেজনায়; তাহা নয়, অকাল বসন্তের দরুন গরমে। সে ভাবিতে লাগিল এই ছয় মাসের মধ্যে তাহার কি এমন পরিবর্তন হইয়াছে, যাহাতে রেবার এমন ভাব উপস্থিত হইল। সেদিন রজত যাচিয়া দেখা করিতে গিয়াছিল, পাইয়াছিল এক পেয়ালা চা ও গোটা কয়েক অর্ধোচ্চারিত

শব্দ। আর আজ রেবা সাধিয়া আসিয়া আলাপ করিল। সে আলাপ আবার—। রজত নিজের কক্ষে একাকী পায়চারী করিতে লাগিল। দেয়ালে টাঙানো ছিল কাশ্মীরী শালপরা তাহার সেই ছবি, বন্ধুরা তুলিয়াছিল ছয় মাস পূর্বে। মূল্যবান শালের ভাঁজে ভাঁজে স্কন্ধ হইতে পা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে, জাগিয়া আছে কেবল তাহার সৌম্য সুন্দর মুখখানি! রজত এখনো ভাবিতে পারিল না—কোন তরুণী এতখানি সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করিতে পারে, বিশেষ যখন প্রচুর অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিয়া সে সৌন্দর্যকে এমন সুন্দর-ভাবে ব্যালান্স করিয়া রাখিয়াছে। রজত পায়চারী করিতে-করিতে চমকিয়া উঠিল—ইস্; এত রাত পর্যন্ত সে টেনিস খেলিবার পোষাক পরিয়া আছে! বৃহৎ দর্পণে তাহারই ছায়া ফ্লানেলের শাদা পায়জামা, শাদা কেড্‌স, শাদা শার্ট, আর সুনিপুন কারিগরের হাতের তৈরী কালো সার্জের একটি কোট। না! ইহাতেও তো রজতকে মন্দ মানায় না! কিন্তু তাই বলিয়া কাশ্মীরী শালের সহিত টেনিস কোর্টের তুলনা! রজতের বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না। সে একবার ছবিখানার দিকে তাকাইল, একবার ছায়াখানার দিকে। ছবিতে বেশ একটা আভিজাত্যের আবরণ আছে, আর টেনিসের কোট বড়ই যেন চাঁচা-ছোলা, বড়ই যেন বে-আব্রু! রজতের মনে হইল টেনিসের কোট বে-আব্রু হোক, তবু যেন তাতে রজতের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, আর কাশ্মীরী শালের অহেতুক ঔদার্যে তাহার অর্থের প্রাচুর্য প্রকাশ হইতেছে। অনেকক্ষণ ছায়া ও ছবির তুলনা করিয়া শেষে যেন ছায়াটিই তাহার বেশি ভাল লাগিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে মানুষটার কি এমন বদল হইয়াছে যে, 'সর্বজন-কাম্য রেবা রায় তাহাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল? রজত উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া টেনিসের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিল। গরম পোষাক ছাড়িতেই তাহার ঘুম আসিল। তখন আর পূর্বরাগের উত্তেজনাও তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিল না। রজত ঘুমাইয়া পড়িল।

রজত, আমি তখন যদি থাকিতাম, তবে তোমার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতাম, হ্যামলেটের মত বলিতাম Look at this picture and look at that! ছবি ও ছায়া দেখ! কাশ্মীরী শালে তোমার ব্যক্তিত্ব ঢাকা পড়িয়াছে, টেনিস-কোর্টের গাত্রলগ্ন আঁট-সাট ভাঁজে তোমার ব্যক্তিত্ব

স্পষ্ট চোখে পড়ে। মেয়েরা পৌরুষকে কামনা করে। ছয় মাস আগে রেবা তোমার অর্থের ঔদ্ধত্যমাত্র দেখিয়াছিল, আজ দেখিয়াছে রজতরঞ্জন রায়কে, টেনিস খেলোয়াড়কে; যদিচ রেবাকে লক্ষ্য করিবার পরে, আর তুমি ভাল খেলিতে পার নাই। যে পোষাকে মানুষের দেহকে ঢাকে অথচ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে, তাহাই আদর্শ পরিচ্ছদ। রজতরঞ্জন, তোমার ব্যক্তিত্বের যোগ্য পোষাক ওই টেনিসের কোট।

সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না।—এবং এত কথাও বলিতে পারি নাই। কিন্তু তাহাতে রজতের ঘুমের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, ইহা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছি।

কল্কি

তখন বিশ্বের সৃষ্টি হয় নাই! সে সময়ে আকাশ-সমুদ্র, ঊর্ধ্ব-অধঃ, দশ-দিক এবং নবগ্রহ কিছুই ছিল না। তখন মরুৎগণ ছিল না, সরিৎগণ ছিল না, উদ্ভিদ ছিল না, প্রাণী ছিল না। ঊষা সন্ধ্যা তখন ছিল না, চন্দ্র সূর্য ছিল না। যাহা কিছু এখন আমরা দেখি এবং যাহা কিছু এখন আমাদের চিন্তার বিষয়—সে সব কিছুই ছিল না। ছিল কেবল নিষ্কলঙ্ক শূন্যতা। একমাত্র শূন্যতা থাকার জন্য তাহাও ছিল না। সেই অসৎবৎ শূন্যতায় বিধাতা পুরুষ একাকী ছিলেন।

একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার বিরক্তিবোধ হইল। তিনি বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে শুধাইল—প্রভু কি করিতে হইবে? বিধাতা বলিলেন—তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বসৃষ্টিতে নিযুক্ত হইল। তখন দেখিতে দেখিতে নীল আকাশের চন্দ্রাতপে গ্রহ-সূর্যের দল সঞ্চরণ করিতে লাগিল, মরুৎগণ প্রবাহিত হইল, সরিৎগণ ধাবিত হইল, পাহাড় পর্ব্বত সগুনিদ্রোত্থিতের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সমুদ্র দেখা দিল, উদ্ভিদ দেখা দিল, বিচিত্রধরণের প্রাণী দেখা দিল। ঊষার সঙ্গে আলো আসিল, সন্ধ্যার সঙ্গে আসিল অন্ধকার। বর্ষচক্রের আবর্ত্তনের প্রহরে প্রহরে ঋতুগণ আসিল।

বিশ্বকর্মা বলিল—প্রভু একবার সৃষ্টি দেখুন।

বিধাতা বলিলেন—সুন্দর! কিন্তু কে এই সৌন্দর্য ভোগ করিবে? ইহা ভোগ করিবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্মা নরনারী দু-দলের সৃষ্টি করিল। আর তাহাদের বসবাসের জন্য স্বর্গের প্রান্তে নন্দনবন নামে সর্ব্বসুষমাভূষিত এক কানন সৃষ্টি হইল।

বিধাতার অনুজ্ঞা বহন করিয়া বিশ্বকর্মা তাহাদের বলিল—এই নন্দনবন তোমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট। তোমরা এখানে চিরকালের জন্য বাস করিবে। যাহা প্রয়োজন সমস্তই মিলিবে। কেবল বনের উত্তর দিক্‌টাতে যাইবে না। এবং আমার ছাড়া আর কাহারও কথায় কান দিও না। যাও, এখন তোমাদের নূতন আবাস একবার ঘুরিয়া দেখ। এই বলিয়া বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

নর নারী নন্দনবন ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইল। চারিদিকে সবুজ গাছ; গাছের শাখায় শাখায় ফুল আর ফল। মাঝখান দিয়া ছোট একটি নদী প্রবাহিত। নদীর ধারে ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহা।

আরও কিছুদূর গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একটি সরোবর। তরল পান্নার মতো তাহার জল। জলে অসংখ্য পদ্ম। বাতাস বহিলে পদ্মে, পদ্মপাতায়, আর জলে মাতামাতি লাগিয়া যায়। তাহারা উপরে চাহিয়া দেখিল নীল আকাশ। আকাশের গায়ে হাঁসের পালকের মতো লঘু মেঘের খণ্ড। এত সৌন্দর্য তাহারা, কল্পনাও করিতে পারে নাই। প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়া ফেরে—কেবল উত্তর দিক্‌টাতে যায় না।

একদিন দুপুরবেলা পুরুষটি যখন নিদ্রিত, নারী একাকী নন্দন ভ্রমণে চলিল। হঠাৎ মনে হইলে কে যেন তাহার কানে কানে বলিতেছে—একবার উত্তর দিকে চলো না। সে চমকিয়া উঠিল! কে এমন কথা বলে? তাহারা ছাড়া এ বনে তো আর কেউ নাই। সে ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিল। পুরুষটি শুধাইল উত্তর দিকে যাওনি তো; নারী বলিল—না। অপরিচিত কণ্ঠস্বরের কথা সে চাপিয়া গেল।

কৌতূহল নারী চরিত্রের ধর্ম। সে আবার পরদিন মধ্যাহ্নে একাকী বাহির হইল। আবার সেই কণ্ঠস্বর। "উত্তর দিকটা দেখিলে দোষ কি? সেদিকটা এদিকের চেয়েও সুন্দর।" নারী ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু প্রত্যেকদিন একই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে তাহার ভয় অনেকটা ভাঙিয়া গেল—সে সাহসে বুক বাঁধিয়া একাকী একদিন উত্তর দিকে চলিল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল—সাহস দিতে দিতে, বাহবা দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রমণী দেখিল—সত্যই উত্তর দিকটা অন্য সব দিকের চেয়ে সুন্দরতর। এত রঙ, এত গান, এত গন্ধ অন্যদিকে সে কি দেখিয়াছে! কিন্তু সব চেয়ে তাহার কাছে যাহা বিস্ময়জনক লাগিল তাহা একটি অদ্ভুতদর্শন কালো বস্তু। বৃহদাকার নল ও চক্র সমন্বিত একটি কালোপদার্থ অনেকটা জায়গা জুড়িয়া দণ্ডায়মান।

অদৃশ্য-ব্যক্তির কণ্ঠস্বর তাহাকে যেন উৎসাহ দিবার জন্যই বলিল—বাঃ কি সুন্দর। আরও একটু কাছে যাওনা।

কিন্তু অপরিচিত বস্তুর কাছে যাইবার সাহস তাহার হইল না। সে ভয় পাইয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিল। দ্রুত ফিরিয়া আসিল কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া স্বভাবজ কৌতূহল তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল। একবার দেখিলে এমন কি দোষ হইত!

পরদিন আবার সে সেই বস্তুটির কাছে গেল। কণ্ঠস্বর বলিল—একবার স্পর্শ করিয়া দেখো না। কিন্তু নারী আর অগ্রসর হইল না। এইরকম করিয়া দিনের পর দিন তাহার কৌতূহল ও ধৈর্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। পুরুষটি ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। সে দুপুরবেলা পড়িয়া ঘুমায়—এসব জানিবার তাহার সময় কোথায়?

অবশেষে রমণীচরিত্রের কৌতূহলেরই জয় হইল। সে স্থির করিল—একবার বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে। স্পর্শ করিতে এমন কি দোষ!

সেদিন দুপুরবেলা সেই কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করিয়া সে বস্তুটির কাছে গেল এবং তাহার উৎসাহবাক্যে সাহস সঞ্চয় করিয়া বস্তুটিকে আলগোছে

একবার স্পর্শ করিল। অমনি সেই কালো বস্তু যেন সজীব হইয়া উঠিল। চাকা ঘুরিয়া উঠিল, নল হইতে ধোঁয়া ও আগুন স্ফুরিত হইতে লাগিল —আর সে কি বিষম গর্জন? সে ভীত হইয়া এক দৌড়ে পালাইয়া চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে শুনিল—যেন অদৃশ্য কোন ব্যক্তির হাসি তুষারকণার মতো চারিদিকে বিকীরিত হইতেছে। পুরুষটিকে কিছুই জানাইল না।

এদিকে বৈকুণ্ঠে বিধাতার আসন টলিয়া উঠিল। তিনি বিশ্বকর্মাকে বলিলেন—একবার নন্দনে যাও তো। নরনারী যদি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তবে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ভুলিও না।

বিশ্বকর্মা আসিয়া নরনারীকে বলিল—তোমরা বিধাতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ। উত্তরদিকের সেই কালোবস্তুটিকে তোমরা স্পর্শ করিয়াছ।

পুরুষ বলিল—না। নারী নীরব হইয়া রহিল।

সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুরুষ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে রাক্ষসী—তুই কি সর্বনাশ করিয়াছিস। তারপরে সে বিশ্বকর্মার পায়ের উপর গিয়া পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন।

বিশ্বকর্মা বলিল—বিধাতার ক্ষমার নাম প্রায়শ্চিত্ত। তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমাদের নন্দন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

—কোথায়?

—পৃথিবীতে।

পুরুষটি বলিল—পৃথিবী! সে আবার কি? সে কোথায়?

বিশ্বকর্মা নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন—ওই যে ক্ষুদ্র মৃৎকণা—ওটাই পৃথিবী।

পুরুষ ব্যাকুলভাবে বলিল—ওখানে গিয়া কি করিব?

—প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

—কেমনভাবে তাহা করিতে হইবে?

বিশ্বকর্মা বলিল—জরা মৃত্যুর অধীন হইয়া রোগ শোক আধিব্যাধির অধীন হইয়া দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের ক্রীতদাসরূপে পরিশ্রম করিয়া এই পাপ স্খালন করিতে হইবে

—কতদিন লাগিবে ?

—কোটি কোটি বৎসর, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্মজন্মান্তর গ্রহণ।

পুরুষটি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। নারী চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।

—আর—এখানে ফিরিতে পাইব না ?

বিশ্বকর্মা বলিল—না।

পুরুষটি যেন আপনমনেই বলিয়া উঠিল—কি সর্বনাশ।

বিশ্বকর্মা সান্ত্বনার স্বরে বলিল—এখানে ফিরিতে পাইবে না বটে, তবে পৃথিবীই নন্দনে পরিণত হইবে।

পুরুষ সাগ্রহে শুধাইল—কবে ?

—যে অপরাধ করিয়াছ তাহার মাত্রা ক্ষয় হইলেই।

—কেমন করিয়া জানিতে পারিব যে অপরাধের ক্ষয় হইল ?

বিশ্বকর্মা বলিল—অপবাধের মাত্রা যখন পূর্ণ হইবে, তখনি বুঝিবে যে এবারে মহাপুরুষের আবির্ভূত হইবার লগ্ন সমুপস্থিত। নিশান্তের অন্ধকারতম ক্ষণেই তো সূর্যোদয় হইয়া থাকে।

—সেই মহাপুরুষের কি নাম ?

—নামের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিবার আশা করিও না। কিন্তু যদি নিতান্তই নাম চাও, তবে শোন তাঁহার নাম—কল্কি।

এই বলিয়া বিশ্বকর্মা বলিল—এখন তোমরা বিদায় হইবার জন্য প্রস্তুত হও।

নরনারী প্রস্তুত হইতে লাগিল—বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

যখন দুইজনে নন্দনের বাহিরে আসিয়াছে তখন এক ব্যক্তি তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পিছনে চক্রচালিত সেই কালোবস্তুটি।

নারী চমকিয়া উঠিল।

পুরুষ শুধাইল—ব্যাপার কি ?

সেই লোকটি বলিল—এই বস্তুটি স্পর্শ করিবার দোষেই তোমাদেব নির্বাসন। এটাকে ছাড়িয়া কেন যাও; এটাকে পৃথিবীতে লইয়া যাও। ওই যে শুনিলে পৃথিবী নন্দনে পরিণত হইবে—তাহা এই বস্তুটির কৃপাতেই।

পুরুষ বলিল—ইহার কৃপায় কি পাইব ?

সেই ব্যক্তি বলিল—অনন্ত ঐশ্বর্য, কল্পনাতীত সুখ।

—শান্তি পাইব কি ?

—না।

তবে চাই না।

সেই ব্যক্তি বলিল—তোমাদের জন্য না চাও, তোমাদের পুত্র-পৌত্রের জন্যও কি চাও না ?

পুরুষ নীরব। রমণী বলিল—চাই।

সেই ব্যক্তি উৎসাহ দিয়ে বলিল—এইতো নারীর মতো কথা। এই বস্তুটির গুণের অন্ত নাই। ইহার গুণে তোমরা এমনি ক্ষমতাবান হইবে যে বিধাতাকে আর প্রয়োজন হইবে না। নিজেরাই নিজের বিধাতা হইতে পারিবে।

পুরুষ শুধাইল—বস্তুটির কি নাম ?

সেইব্যক্তি বলিল—যন্ত্র।

-তোমার কি নাম ?

সে ব্যক্তি বলিল—শয়তান।

এই বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। নর-নারী, সেই আদি-দম্পতি সেই যন্ত্রটিকে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করিল।

প্র-না-বি-র সঙ্গে ইণ্টারভিউ

প্র-না-বি থাকেন সাঁওতাল পরগণার ছোট একটি শহরে। সেখানে তাঁর ছোট একটি বাড়ি আছে। বিচিত্র গঠনের এই বাড়িটি। বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রকাণ্ড, চারদিকে আম, শাল, মহুয়ার গাছ; শিউলি, স্থলপদ্ম, রক্তকরবী, জবার গাছও অনেক। মাঝখানে অনেকটা পরিষ্কার জায়গা। সেখানে বাড়িটি আগাগোড়াই কাঠের তৈয়ারী। এই কাঠের বাড়িখানা এমনভাবে তৈরি, যাতে যখন যেদিকে সূর্য থাকে সেদিকে ঘোরানো যায়।

এইজন্যই বাড়িটির নাম সূর্যমুখী। দুদিকে ছোট ছোট দুটি ঘর; একটাতে প্র-না-বি'র পড়বার জায়গা, আর একটাতে বসবার এবং বিশ্রামের স্থান। মাঝখানের বড় হলটার কাঠের দেয়ালে কতকগুলি বন্দুক টাঙানো। দেয়াল এবং মেঝের প্রায় সবটাই পশুচর্মে আবৃত। প্র-না-বি'কে সবাই লেখক এবং বিদূষক বলিয়াই জানে। কেহই জানে না যে, তিনি একজন বড় শিকারী। আমিও জানিতাম না।

সেদিন আমি একজন আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বি'কে দেখিবার জন্য গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আমেরিকান বন্ধুটি যুদ্ধের আগে ছিলেন আমেরিকার কোন এক কলেজের অধ্যাপক। যুদ্ধ বাধিলে কয়েক বছর তাঁর দেশে-বিদেশে বনেপাহাড়ে ঘুরিয়া কাটে। শেষের দিকে কিছুকাল হইতে কলিকাতাতেই আছেন। এখন তাঁর দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদেশ হইতে বিদায় লইবার আগে তিনি এখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ করিয়া যাইতে চান। দেশে গিয়া তিনি "My India" নামে একখানি বই লিখিবেন, তারই উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। আমার সঙ্গে প্র-না-বি'র পরিচয় আছে জানিয়া তিনি আমাকে ধরিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আমি আজ প্র-না-বি'র কাছে উপস্থিত হইলাম।

প্র-না-বি'র সঙ্গে আমার এক সময়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বটে; কিন্তু তারপরে বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই। তখন তিনি থাকিতেন কলিকাতায়। সেদিনকার প্র-না-বি'কে লেখক বলিয়াই জানিতাম—এখন তাঁহার শিকারের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু প্র-না-বি'র সম্বন্ধে বিস্ময়টা বাহুল্য। তিনি কি এবং কি নহেন, কি করিয়াছেন এবং কি করিতে পারেন—তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাঝখানের হলঘরটাতে বসিলেন। একটা স্প্রিং জাতীয় কোন যন্ত্র টিপিতেই সমস্ত বাড়িটা ঘুরিয়া সূর্যমুখী হইল। শীতের আরামপ্রদ সূর্যের আলোতে ঘরটা ভরিয়া গেল।

আমি আমেরিকান বন্ধুটির পরিচয় দিয়া বলিলাম—আপনি যে শিকারী, একথা জানিতাম না।

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—শিকারী তো আমি বরাবরই, কলম দিয়া

মানুষ শিকার করি, আর বন্দুক দিয়া চলে ভালুক শিকার। তবে তারা আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানে না—এইমাত্র। মানুষে ভাবে আমি মানুষ-শিকারী। পশু তো ভাবে কেবল পশুকেই মারি।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—প্রত্যেক লেখকের পক্ষে শিকারের অভ্যাস রাখা দরকার। তাতে অভ্যাসের ব্যালান্সটা থাকে। অবশ্য প্রত্যেক শিকারী যে লেখক হয়ে উঠবে—এমন আশা করা উচিত নয়।

তারপরে আমেরিকান বন্ধুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—পশ্চিমের লোকেরা শিকারটা খুব বোঝে। পৃথিবীতে জন্তুজানোয়ার যতই কমে আসছে—মানুষ-শিকার ক'রে তারা সেই অভাব পুষিয়ে নিচ্ছে।

আমেরিকান বন্ধুটি বলিলেন যে, আমাদের দেশের কোন বড় লেখককে শিকারী বলে জানি না। এবারে দেশে ফিরে যাতে তারা শিকার অভ্যাস করে, তার চেষ্টা করবো।

প্র-না-বি বলিলেন—শিকার করাটা কঠিন নয়। ওর 'ফিলজফিটা' ধরাই কঠিন। ফিলজফির সঙ্গে সংযুক্ত না হ'লে শিকারটা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্রমে সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। আমেরিকান অধ্যাপকটি প্রশ্ন তুলিলেন—বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত না হওয়ার কারণ কি? দান্তে-সেক্সপীয়র-গ্যোটের ভাব-বংশ কি একেবারেই লুপ্ত হইল? এমন কেন হয়?

প্র-না-বি বলিলেন—কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ওঁদেরই সমকক্ষ। তবে একথাও সত্য যে, তিনিই বোধ করি পৃথিবীর শেষ মহাকবি।

ইহা শুনিয়া বন্ধুটি বলিলেন—তবে তো আপনি আমার কথাই সমর্থন করছেন।

—করছি বইকি।

—এর কারণ কি?

প্র-না-বি শুরু করিলেন—মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তর আছে প্রাণ-স্তর, বুদ্ধিস্তর আর আত্মাস্তর প্রাণস্তরে মানুষ প্রায় পশুর সামিল এই প্রাণস্তরের সৃষ্টি তার সংসার। এটা কেবল প্রয়োজন সাধনেরই উপায়।

তার দেহ ধারণের কৌশল। বুদ্ধিস্তরের সৃষ্টি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখা। মানুষ যাকে দর্শন বলে, বিজ্ঞান বলে, আইন বলে, ন্যায়-শাস্ত্র বলে —এসব বুদ্ধিস্তর থেকে উদ্ভূত। আর আত্মাস্তর থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার ধর্ম এবং শিল্প। এই জন্যই ধর্ম এবং শিল্প মূলত এক। হোমার থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার মূল রয়েছে আত্মার গভীরতায় নিহিত।

বন্ধুটি বলিলেন—আপনি যাকে আত্মা বল্‌ছেন, তা যদি ইংরেজি "soul" হয় তবে বল্‌বো যে, তার কোন প্রমাণ নেই। পশ্চিম এক সময়ে অপ্রতি-পান্ন "soul"কে স্বীকার করতো—এখন আর করে না।

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—তা আমি জানি। পূর্বদেশীয় আমরাও "soul" -এ বিশ্বাস ক্রমে হারিয়ে ফেলছি—আর কিছুকালের মধ্যে আমরাও "soul" সম্বন্ধে পশ্চিমের উপযুক্ত শিষ্য হ'য়ে উঠ্‌বো। কিন্তু প্রমাণের কথাই যখন উঠ্‌ল—তখন বলি যে, ভগবানের অস্তিত্বেরও তো কোন প্রমাণ নেই।

বন্ধুটি বলিলেন—প্রমাণ নেই, কিন্তু বিশ্বাস আছে।

প্র-না-বি বলিলেন—এই বিশ্বাস বা "faith" মানুষের আর একটা অস্ত্র—ঠিক প্রমাণের মতোই বা তার চেয়েও বড। বড এই জন্য যে, বুদ্ধি স্তরের অস্ত্র হচ্ছে প্রমাণ—আর আত্মাস্তরের অস্ত্র বিশ্বাস।

আমি শুধাইলাম—আর প্রাণস্তরের?

প্রাণস্তরের অস্ত্র—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রমাণ এবং বিশ্বাস নিয়ে ত্রিস্তরী মানুষ বিশ্ব বিজয়ে বের হ'য়েছিল। অবস্থাগতিকে দেখা যাচ্ছে, সে আত্মাস্তর আর তার অস্ত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাতে ক'রে সে কি দীনতর হ'য়ে পড়েনি! এই দীনতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তার শিল্প এবং ধর্মজীবনের ন্যূনতায়। মহাকবিদের কাব্য-সৃষ্টি হয় আত্মাস্তর থেকে একথা আগেই বলেছি। এখনকার অধিকাংশ কবি কাব্য রচনা করেন বুদ্ধিস্তরে দাঁড়িয়ে। বিশেষ ক'রে তাঁদের দোষ দেওয়া অন্যায়। কারণ সমস্ত পৃথিবী-টাই আত্মাস্তর থেকে স্খলিত হ'য়ে নেমে পড়েছে। এখন কবি ও পাঠকের একই সঙ্গে অধোগতি হ'য়েছে—তারা একই স্তরে দাঁড়িয়ে। সেইজন্য যদিচ এখনকার কবিদের কাব্য কাব্যই নয়—তবু তার পাঠক জোটে—তবু তা ভালো লাগবার লোকের অভাব হয় না।

বন্ধুটি বলিলেন—যদিচ আত্মার প্রমাণ নেই, তবু আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলা কি সম্ভব নয়?

—কেন সম্ভব নয়। আত্মাকে একটা অদৃশ্য বিন্দু বলে' কল্পনা করে নিন—যে বিন্দুর অভিমুখী মানুষের দৈহিক বৃত্তি, বুদ্ধি, আবেগ, কল্পনা সমস্ত কিছুই। অর্থাৎ এই সব থেকে একটি ক'রে রেখা টানা হ'লে সব গিয়ে মেশে যে অদৃশ্য বিন্দুটিতে—তাকেই কল্পনা ক'রে নিন আত্মা ব'লে। এখন মহাকাব্য এই সর্ববৃত্তির কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত বলেই তা নাড়া দেয় আমাদের অস্তিত্বের সমস্তটাকে। বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত কাব্য কেবল বুদ্ধিকেই নাড়া দিতে পারে। বুদ্ধির ব্যাপারে যে লোক নিম্নতর স্তরে আছে বুদ্ধির কাব্যে তার কোন প্রকার সমর্থন থাকা সম্ভব নয়। হোমারের কাব্যের আবৃত্তি শুনলে নিতান্ত নিরক্ষর লোকেও বিচলিত হবে; কারণ, ও কাব্য নিরক্ষরের জন্যও, কিম্বা নিরক্ষরের জন্যই সৃষ্টি। অক্ষর আবিষ্কারের পূর্বে রচিত হ'য়েছিল হোমারের কাব্য।

এমন সময়ে চাকরে চা লইয়া আসিল। বন্ধুটি বলিলেন—কাব্য সৃষ্টিতে এমন পরিবর্তন ঘটবার কারণ কি?

প্র-ন-বি বলিলেন—যা অনিবার্য তা'তো ঘটেইছে, সে জন্য বিলাপ ক'রে চা ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই।

এই বলিয়া তিনি আমাদের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিলেন—আর নিজে অন্য কি একটা পদার্থ ঢালিয়া লইলেন?

আমি শুধাইলাম—ওটা কি?

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—গরম জলে তুলসীপাতা সিদ্ধ।

—এ আবার কি রকম খেয়াল?

তিনি বলিলেন—আর দশজনে যা করে তা করা আমার স্বভাব নয়।

আমি বলিলাম—যেমন আপনার এই কল্‌কাতা ছেড়ে জনহীন মাঠের মধ্যে প'ড়ে থাকা?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—নিতান্ত মিথ্যা বলেন নি।

চা পান শেষ হইলে তিনজনে তাঁহার বাগানের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্র-না-বি বলিতে লাগলেন—এখানে কেন থাকি জানেন? এখানে থাকলে মনে হয় পৃথিবীর একেবারে বুকের কাছে এসে পড়েছি। কলকাতায় থাকতে মনে হ'ত প্রকৃতির বুকের উপরেই আছি বটে, তবে দু'জনের মিলনের নিবিড়তার রসভঙ্গ ক'রে মাঝখানে রয়েছে তার বুকের স্বর্ণ অলঙ্কারটি। এখানে প্রকৃতির অলঙ্কার-খসা নিরাবরণ বক্ষ আমাকে ঘনিষ্ঠ ক'রে টেনে নেয়। এখানকার ঝিঁ ঝিঁ ডাকা দুপুরের ঘুঘুর করুণ কাকলী ভীরু প্রকৃতির শঙ্কিত মিনতির মতো; এখানকার তরুণতাকে স্পর্শ করলে বিশ্বের রক্ত প্রবাহের বেগ যেন অনুভব করতে পারি; আর মাঠের মাঝে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে শুনতে পাই পৃথিবীর হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে আমার হৃৎস্পন্দনের ঐক্যতানে দোহার চলছে; ব্রজলীলার যাত্রায় একদিন দেখেছিলাম, যুবতী রাইমাধুরীর খঞ্জনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছে কিশোর একটি বালকের ছোট্ট এক জোড়া খঞ্জনী, সেই কথা মনে প'ড়ে যায়। এমন একটি মোহ-ময় আবেশ ঘন হ'য়ে আসে যে মনে হয়, জানকীর মতো প্রকৃতির দ্বিধা বিভক্ত বক্ষের মধ্যে আমি তলিয়ে চলে গেছি, অযোধ্যার ঐশ্বর্য, পতির প্রেম, সতীর সুনাম যার তুলনায় সর্বৈব মিথ্যা! আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির খেলা ঘরে।

তারপরে তিনি আমেরিকান বন্ধুটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আপনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের এই বাণী নিয়ে যান। পশ্চিমের ট্রাজেডি এই যে, সে প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত দূরে গিয়ে পড়েছে; তাই তার শান্তি নেই। ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃতির কোলের কাছ ঘেঁসে রয়েছে—দয়া ক'রে তাকে আর দূরে যেতে লুব্ধ করবেন না। পশ্চিমের দেশ যদি আবার প্রকৃতির কোলের কাছে আসতে পারে—তবেই সে আত্মার স্তরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনি তার শিল্পে এবং ধর্মে পুনরুজ্জীবন ঘটবে—তার পূর্বে নয়।

প্র-না-বি-র নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্টেশনের দিকে আমরা রওনা হইলাম। বন্ধুটিকে শুধাইলাম প্র-না-বি'কে দেখিয়া কি মনে হইল?

তিনি বলিলেন—লোকটা কবি, পাগল না বিদূষক—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আমি মনে মনে বলিলাম—বোধ করি এক সঙ্গে তিনটাই।

ইংলণ্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা

এবারে আমার সঙ্গী একজন ইংরেজ। আমরা প্র-না-বি'র বাড়িতে গিয়া দেখি তিনি একমনে কি লিখিতে ব্যস্ত। আমাদের দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইস্, লোকটা কি লম্বা—আর সেই অনুপাতে চওড়া। যেন এ-যুগের বাঙালী নয়—রামায়ণ মহাভারতের আমলের কোন বীর। মুখে পাতিয়ালার মহারাজার মতো ঘন চাপ দাড়ি।

আমি বলিলাম—কিছু জরুরী লিখ্‌ছিলেন বুঝি ?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, জরুরী বৈ কি। ইংরেজ তো সাহস ক'রে আমাদের স্বাধীন শাসন দিতে পারলো না, তাই আমি ওদের জন্য একটা নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করছিলাম। আমরা ওদের স্বাধীনতা দেবো।

এ আবার কি কথা ? ইংলণ্ড কি স্বাধীন নয় ?

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—না, ইংলণ্ড এখনো স্বাধীন হয় নি।

আমি বলিলাম, ইংলণ্ড কার অধীন ?

প্র-না-বি বলিলেন, কোন জাত বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নয়, ইংলণ্ড যন্ত্রের অধীন। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপ আর আমেরিকা দুই-ই এখনো যন্ত্রের অধীনতা ভোগ করছে।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—কিছুদিন আগে নিউইয়র্কে 'লিফ্‌টম্যানেরা ধর্মঘট করছিল মনে আছে ? এ দুর্ভোগ কেন ? যেখানে দশ হাজার লোক ইচ্ছে করলে দশ লক্ষ লোককে অচল করে দিতে পারে, তার মূলে রয়েছে যন্ত্রের শাসন।

ইংরেজটি বলিলেন—কিন্তু বিশ পঁচিশ তালা বাড়িতে 'লিফ্‌টে' না থাকলে চলে কি ক'রে ?

প্র না-বি বলিলেন—বাড়িগুলোকে অত উঁচু ক'রে পাহাড় গড়বার প্রয়োজনটা কি ?

ইংরেজ বন্ধুটি—তা না হইলে শহরের আয়তন যে আরো বেড়ে যাবে।

প্র না-বি বলিলেন—বড় বড় শহর গড়ে তোলবার আমি পক্ষপাতী

নই। যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সেই যান্ত্রিকতার ফলেই অতি-কায়িত শহরের উৎপত্তি। একেবারে যন্ত্রের মূলে আঘাত করতে পারলে শহরগুলো আপনা থেকেই ক্ষুদ্রায়ত হয়ে আসবে—তখন 'লিফ্‌ট-এর' সঙ্গে 'লিফ্‌ট-ম্যান' অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। বহুকাল আগে তথাগত একবার হিন্দুসমাজের* ধর্মগত অতি জটিল কর্মকাণ্ডের মূলে আঘাত করেছিলেন—বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর আঘাত তেমনি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মূলে। আমি মহাত্মা গান্ধীর চেলা।

সাহেবটি এতক্ষণ আক্রমণের সুযোগের আশায় ছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি মিঃ গান্ধীর চেলা, কিন্তু শিকার করেন কেন? ওটা কি হিংসা নয়?

প্র-না-বি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমি হিংস্র পশুকে গুলী মারি—কিন্তু সে গুলী বারুদের নয়, আফিমের গুলী। ভালুক যখন হাঁ ক'রে ছুটে আসে, আমি অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুক থেকে আফিমের গুলী তার পেটে ঢুকিয়ে দিই। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা নেশাগ্রস্ত হয়ে ঢুলে পড়ে যায়। তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে একটা খাঁচায় পুরে রাখি।

দুইজনে যুগপৎ বলিলাম—কেন?

—তাকে অহিংস করে তুলবার জন্যে। একটু থামিয়া পুনরায় শুরু করিলেন—পশু হিংস্র কেন? তারা নিয়মিত খাদ্য পায় না বলেই তাদের স্বভাব হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমার 'থিওরি' হচ্ছে কোন পশুকে যদি নিয়মিত খাদ্য দেওয়া যায়, তবে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবেই। এক পুরুষে হবে না, কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের স্বভাব বদলিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, পশুকে এভাবে শিক্ষা দিতে থাকলে মানুষের আগেই তারা অহিংস হ'য়ে উঠবে। দেখেন নি যে বাড়ির বিড়াল নিয়মিত যথেষ্ট খাদ্য পায়, তারা আর হিংস্র থাকে না—অথচ পশুতত্ত্বের বিচারে বিড়াল আর বাঘ এক জাতের প্রাণী।

আমি শুধাইলাম, কিন্তু মানুষ কি আপনার পন্থা গ্রহণ করবে?

তিনি বলিলেন—মহাত্মাজীর পন্থাই কি মানুষে গ্রহণ করেছে? কিন্তু নিশ্চয় জানবেন তাঁর পথে একদিন সকলকে এসে দাঁড়াতে হবেই। তখন

সবাই আমার পন্থাটাকেও গ্রহণ করবে। আমি তো মহাত্মাজীর সামান্য শিষ্য ছাড়া আর কিছুই নই।

ইংরেজটি বলিলেন—তখন কি সবাই আফিমের গুলী দিয়ে পশু শিকার করবে?

প্র-না-বি বলিলেন—না, তখন আর আফিম দিয়ে পশুকে নেশাগ্রস্ত করবার প্রয়োজন থাকবে না। কারণ মানুষে ব্যাপকভাবে অহিংস হয়ে উঠবার অনেক আগেই পশু জগৎ অহিংস হয়ে উঠবে। একথা আগেই বলেছি। পশুর হিংসা অভাবে, মানুষের হিংসা স্বভাবে। অভাব যায়, কিন্তু স্বভাব মরলেও যেতে চায় না।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা হ'লে তখন আপনার মতো শিকারীদেব কি অবস্থা হবে?

তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে—বলিলেনকেন, তখন তারা ঘুড়ি শিকার করবে! আকাশে উড়িয়ে দেবে হাজার হাজার ঘুড়ি, আর শিকারীরা বন্দুকের গুলী দিয়ে তা মাটিতে পেড়ে ফেলে যে আনন্দ পাবে, তা শিকারের আনন্দের চেয়ে কম নয়। আর এই ঘুড়ি উড়াবার ব্যবস্থা করে দেবে তখন আদর্শ অহিংস রাষ্ট্র। আপনাদের দেশে—

এই বলিয়া তিনি সাবেহটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

আরো একটি নূতন অহিংস আমোদ দেখা দেবে। ঝড়ের দিনে মাঠের মাঝে মাথার টুপি উড়ে গেলে, লোকে তার পিছু পিছু ছুটবে—এখন যেমন ইংলণ্ডের বীর পুরুষেরা ছোটে আর্ত খেঁকশিয়ালটার পিছনে।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—স্থূলকায় 'জনবুল' অপরের ধাবমান টুপির পিছনে ছুটে চলছে ভাবতেও শরীর পুলকিত হয়। আর যাই হোক, পরের স্ত্রীর পিছনে ছোটার চেয়ে পরের টুপির পিছনে দৌড়ানো সামাজিক স্বাস্থ্যের বিচারে অনেক বেশি কাম্য। নয় কি?

সাহেবটি শুধাইলেন—আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, গান্ধীবাদ কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে?

—নিশ্চয়ই।

—কতদিন পরে?

প্র-না-বি—সময়টা নিয়ে যা কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু আণবিক বোমা আবিষ্কারের পরেই সে সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে।

বিস্মিত ইংরাজ বন্ধুটি বলিলেন—কেমন ক'রে?

প্র-না-বি—গান্ধীবাদ হচ্ছে অহিংসার চরম, আর আণবিক বোমা হিংসার চরম। এবারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমান হওয়াতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, চাকা ঘোরবার সময় উপস্থিত। বুদ্ধদেব করেছিলেন ধর্মচক্র প্রবর্তন, গান্ধীর হচ্ছে কর্মচক্রের প্রবর্তন। যাকে আমরা যান্ত্রিকতা বা Industrialism বলি, এ হচ্ছে গিয়ে একটা অতি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার একটা অবস্থা বিশেষ। তা যদি হয়, তবে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, এর পরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা কি? Industrialism-এর পরের অবস্থা Post-Industrialism বা যন্ত্রোত্তরবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে? গান্ধীবাদ বলতে বোঝায় সমগ্র জীবনের একটা পরিপূর্ণ তত্ত্ব। তাকে বিশ্লেষণ করলে পাই—সত্য, সেইটেই মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র উপায় অহিংসা। আর অহিংসার অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে গিয়ে যন্ত্রোত্তরবাদ। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই রকম—যন্ত্রোত্তর-বাদ, অহিংসা, সত্য।

ইংরাজ বন্ধুটি ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—আমার তো মনে হয় না যে, অহিংসা কোনকালে ব্যাপক সফলতা লাভ করবে?

প্র-না-বি—হিংসাই কি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে? যুদ্ধ কেন না শান্তির জন্য। কিন্তু শান্তি কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তা যদি না হ'য়ে থাকে, তবে বলতে হবে যে হিংসার সার্থকতার বিরুদ্ধে মানুষের ইতিহাসের সাক্ষ্য। তা ছাড়া, অহিংসার পরীক্ষার জন্যে কত বছর সময় মানুষে দিয়েছে?—কুড়ি বছর। কিন্তু হিংসার পরীক্ষা আর মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘতা সমান। কাজেই অহিংসার ব্যাপক সফলতা যে অসম্ভব একথা বলবার সময় এখনো নিশ্চয় আসেনি।

ইংরাজ বন্ধুটি এই অনতিসমাপ্য প্রসঙ্গকে চাপা দিবার জন্য বলিলেন—সেদিন আপনি আমেরিকার উদ্দেশে একটি বাণী দিয়েছেন—আজ আমি ইংলণ্ডের জন্য বাণী প্রার্থনা করছি আপনার কাছে।

প্র-না-বি বলিলেন—সেই বাণীই তো আমি রচনা করছিলাম—আপনাদের আসবার আগে। ইংলণ্ডকে স্বাধীনতা দেবার উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্র। শীঘ্রই এই শাসনতন্ত্র জগতের সমক্ষে প্রকাশ ক'রে ঘোষণা করবো ·যে—ইংলণ্ড আত্মশাসনে এমন অপটু যে অন্য দেশ শাসন করবার রাজনৈতিক অধিকার বিন্দুমাত্র তার নেই।

ইহা শুনিয়া ইংরাজ বন্ধুটির মুখ রসুনের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি কুণ্ঠিতভাবে শুধাইলেন—এই বিপদ থেকে বাঁচাবার উপায় কি নেই?

প্র-না-বি—আছে বই কি! যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষের সঙ্গে বন্ধন ছেদন। তখন আর আপনাদের ঘরোয়া বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশের আমাদের কোন অধিকার থাকবে না।

বন্ধুবরের মুখের রসুনের পাণ্ডুতা আশ্বস্ত হইয়া পলাণ্ডুর রক্তিমায় পরিণত হইল। তিনি বলিলেন—আপনি আর কিছুদিন আপনার শাসনতন্ত্রের খসড়া চেপে রেখে দিন। আমি দেশে ফিরে গিয়ে এই আসন্ন বিপদের কথা যাতে সকলকে জানাতে সুযোগ পাই, সেই সুযোগটুকু আমাকে দান করুন।

প্র-না-বি হাসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এমন সময়ে ভৃত্য চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। তার পরে চা পানের পালা। সে সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই, এমন কি প্র-না-বি'র চা পান সম্বন্ধেও নাই।

মাত্রাজ্ঞান

আবার আসিয়াছি প্র-না-বি'র সাক্ষাতে। এবারে আমার সঙ্গী একজন চীনদেশীয় ভদ্রলোক। প্র-না-বি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার ভৃত্য আমাকে চিনিত, সে আমাদের লইয়া গিয়া বসাইল। শুনিলাম বাবু শিকারে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করার চেয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রাচীরের পাশে সারি সারি ফুলের গাছ—জবা, করবী, ঝুমকোলতা—আর আছে কতকগুলি বিদেশী গোত্রের ফুল, এদেশের মাটিতে যাদ

পাইয়াছে, কিন্তু এদেশের ভাষায় এখনো নামটি পায় নাই; এ যেন বাড়ির নবজাত শিশুটি বিশিষ্ট নামের অভাবে যাহাকে 'খোকা' বলিয়া সবাই ডাকে। আর আছে সারিবদ্ধ গাঁদাফুলের গাছ—সুডোল স্বর্ণ গাঁদার কুঞ্জ অচঞ্চল মহিমায় স্থির হইয়া আছে।

আমি চীন দেশীয় বন্ধুটিকে বলিলাম যে—বাগানে ফুল প্রচুর, কিন্তু বসন্তের ফুলের শোভার কাছে এ কিছুই নয়।

চীনা-বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আমাদের দেশের কবিদের কিন্তু ভিন্ন মত। তাঁহারা বলেন, বসন্তকালে ফুল সংখ্যায় বেশি, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য শীতকালে যেমন প্রকট হয়—এমন আর কোন সময়ে নহে। জনতার মানুষে আর একটি বিশিষ্ট মানুষে যে প্রভেদ, অনেকটা তেমনি। ভীড়ের মধ্যে মানুষ নির্বিশেষে—সে কেবল মানুষ মাত্র—ব্যক্তি নয়। বসন্তের ফুলের হাটে বড় বেশি ঠেলাঠেলি গাদাগাদি—আর আপনি তো জানেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাচুর্যের চিরবিরোধ। ফুলের সৌন্দর্য কবির চোখে দেখিবার আসল সময় শীতকাল। অনন্ত আকাশ, অবাধ পৃথিবী, অগাধ রৌদ্র—তার মধ্যে একটি মাত্র গাঁদা ফুল—এর কি তুলনা আছে?

আমি শুধাইলাম—সৌন্দর্যে আর প্রাচুর্যে বিরোধ কি সত্যি?

—সত্যি নয়? অলঙ্কারের দোকানে আছে অজস্র মুক্তা, সেখানে প্রাচুর্য। কিন্তু সুন্দরীর কানে আছে একটিমাত্র মুক্তার দুল—সৌন্দর্য সেখানে। সোনার খনিতে প্রাচুর্য—সৌন্দর্য একটি মাত্র সোনার বলয়ে। রাণীর সহস্র সখী, তাদের সৌন্দর্য নাই—কিংবা থাকিলেও সহস্রের অন্তরালে তা প্রচ্ছন্ন, আর রাজ্ঞী একাকিনী সিংহাসনে আসীন বলিয়াই তিনি সুন্দর।

আমি শুধাইলাম—এমন কেন হয়?

চৈনিক বন্ধু বলিলেন—সৌন্দর্যের রহস্য মাত্রাজ্ঞান। মাত্রাচ্যুত হইলেই সৌন্দর্য প্রাচুর্যে পরিণত হয়। ভোজন-বিলাসীর কাছে আহার্য সুন্দর, পেটুকের দৃষ্টি শুধু তার প্রাচুর্যের দিকে। সৌন্দর্যে যা মাত্রাজ্ঞান, ভাষায় তাকেই বলি ছন্দ, আবার জীবনে তারই নাম সংযম। তালের কঠিন বন্ধনে বদ্ধ না হইলে নৃত্য বলুন—কিছুই সার্থক হইত না। বিধাতাপুরুষ জীবন-মৃত্যুর অমোঘ গ্রন্থিতে সংসারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই সংসার চলিতেছে।

এমন সময়ে আমাদের পিছন হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—ঠিক এইজন্যই. পুরুরবার গৃহত্যাগ করিয়া উর্বশী পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে গৃহিনীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে মাত্রাচ্যুতি ঘটা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আমরা চাহিয়া দেখিলাম—প্র-না-বি। তিনি বলিলেন—আমি বড়ই দুঃখিত যে, আপনাদের অপেক্ষা করিতে হইল। এত দেরি হইবে ভাবি নাই। কিন্তু শিকারের গতি সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া পূর্বাহ্নে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিকারীর ভাগ্য চির-অনিশ্চিত। ওর একটা মোহ আছে,—আর মোহ যাতে আছে তার সম্বন্ধে নিয়ম করা চলে না।

আমি চীনা বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বি'র পরিচয় করাইয়া দিলাম। তারপরে তিনজনে তাঁহার সূর্যমুখী বাড়িতে গিয়া বসিলাম।

চীনা বন্ধুটির উপস্থিতিকে সূত্র করিয়া আমাদের কথাবার্তা চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে আরম্ভ হইল। প্র-না-বি বলিলেন—ওই যে মাত্রাজ্ঞানের কথা বলিতেছিলেন—ওটাই হইতেছে সবচেয়ে বড় কথা। ইউ-রোপের সভ্যতায় আর সবই আছে, কেবল মাত্রাজ্ঞানের অভাব। সেই জন্যই ইউরোপ বারংবার আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। ওদের সভ্যতার আদর্শ (যদি তাহাকে আদর্শ বলা যায়) প্রাচুর্য ছাড়া কিছু নয়। এই প্রাচুর্যের সাধনায় ওরা এমনই উন্মত্ত যে, ধর্মবোধ ওদের কাছে তুচ্ছ। প্রাচুর্যের সন্ধানে ওরা দেশ-বিদেশে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। প্রাচুর্যের স্বর্ণ চূড়াকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবার দিকে বেচারাদের এমনই ঝোঁক যে, অপর দেশের ধনপ্রাণ ওদের কাছে নিতান্ত খেলার বিষয়। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ছিল, এখনো আছে চীনে ও ভারতবর্ষে।

চীনা বন্ধুটি হাসিলেন। তিনি বলিলেন—ওরা কি তা স্বীকার করিবে?

—মাতাল কি স্বীকার করে যে, সে প্রকৃতিস্থ নয়?—কিংবা অমৃতপায়ী প্রকৃতিস্থ? তাতে তো সত্য অপ্রমাণ হয় না। আসল কথা কি জানেন, ইউরোপের দম্ভর সভ্যতার মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। তা যদি আমরা পারি—তবে এই নেশা-ধরানো অনুকরণ-প্রবণতার দুঃসময়টা কাটিয়া গেলে ওরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে—চীন ও ভারতবর্ষের

সত্যতার তুলনা নাই। এশিয়ার বিশাল জনহীন প্রান্তরের মধ্যে যে বিরাট অপ্রমত্ত পুরুষ চিরধ্যানের শান্তিতে বিরাজমান—তাঁর পায়ের কাছে একদিন ওদের আসিয়া বসিতে হইবে। কেবল ইতিমধ্যে আমরা যেন সেই স্থানচ্যুত না হই।

আমি বলিলাম—কিন্তু ইউরোপ তো বলে যে সে তার সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে।

প্র-না-বি বলিলেন—কোন্ সমস্যা? অন্নবস্ত্রের সমস্যার কথা যদি বলেন, তবে সে সমস্যার মীমাংসা তারা কি ভাবে করিয়াছে দেখা দরকার। পৃথিবীর আর দশটা দেশকে অস্ত্র ও যন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া তবে তারা সেই সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিন থাকিবে না। যখন সে-সব দেশ স্বাধীন হইয়া আত্মনির্ভর হইবে—তখন ইউরোপের বর্তমান সমাধান কি বাতিল হইয়া যাইবে না? যে সমাধানের মূলে আছে আর দশজনের দুঃসহ দুরবস্থা, তাকে কি সমাধান বলা উচিত? এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরেকার কথা চিন্তা করুন—যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন, আর চীন আত্মনির্ভরশীল—তখন ইউরোপের মাল কোন্ বাজারে বিক্রীত হইবে? আমরা কি তখনো অন্নবস্ত্রের জন্য ইউরোপের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব?—নিশ্চয়ই নয়!—তবে?

আর যদি আত্মিক সমস্যার সমাধানের কথা তোলেন—তবে বলিব, এ দুই সমস্যাই একসূত্রে গ্রথিত। আত্মিক সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই তাহার অন্নবস্ত্রের সমাধানও ঘটিল না। আবার পরস্ব অন্নবস্ত্র প্রতি মুহূর্তে ইউরোপের আত্মাকে অধঃপাতের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এখন ভারতবর্ষ ও চীন যদি বিচলিত না হয়—তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করা ছাড়া ওদের গত্যন্তর নাই।

প্র-না-বি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, চীনা বন্ধুটি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনার দেশের লোককে ধৈর্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা শাশ্বত আদর্শের বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানে বসিয়াছি—ইউরোপের 'মার' নানা প্রলোভনের মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—তাহার ছলনায় যেন আমরা

প্রতারিত না হই। শেষ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে স্বাভাবিক মাত্রাবোধ আছে—প্রাচুর্য্যের লোভে তাহার যেন আমরা অমর্যাদা না করি। এই সতর্কবাণী ইষ্টমন্ত্রকে জপ করিয়া দুঃসময়ের এই রাত্রি আমাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে!

ভাঁড়ু দত্ত

সেদিন পথে ভাঁড়ু দত্তর সঙ্গে দেখা। চেহারা ঠিক তেমনি আছে। পাটপচা জলের মতো গায়ের রংটি কালো; মাথার চুল কাশের ফুলের মতো শাদা; তরমুজের বীচির মতো দাঁতগুলি; আস্ত একটি কাঁঠালের মতো ঝুলিয়া-পড়া উদর আর চোখে শৃগালের ধূর্ত্ততা। বাঙলা দেশের মানুষ কিনা—বাঙলার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাঙ্গে প্রকট করিয়া মূর্তিমান! মাথায় একটি ঝুড়িতে গোটাকয়েক লাউ, কুমড়োর আভাস। হাতে একটি ভাঁড়।

বলিলাম—কি মণ্ডল কোথায় গিয়েছিলে, বাজারে নাকি? সে এক মাত্রা মকরধ্বজী হাসি হাসিল। মকরধ্বজী হাসি কি? সর্ববিধ দাবীর সার্বজনীন উত্তর আছে সেই হাসিতে। এই হাসি দেখিয়া পাওনাদার ভাবে—এবারে পাট উঠিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। দেনদার ভাবে শীঘ্র আর সুদের তাড়া আসিবে না। জমিদার ভাবে খাজনা মিলিল। প্রজা ভাবে খাজনা মাপ। কিন্তু কাহারো আশা সফল হয় না—অথচ সকলেই খুসি হয়। এ হাসি এমনি জিনিস। তেমন করিয়া হাসিতে জানিলে জীবনের অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়।

আবার শুধাইলাম—কোথায় চললে?

ভাড়ু বলিল—নায়েবের বাড়ি।

—তাই বলো, সেখানে বুঝি কাজ নিয়েছ?

সে একটু ভাবিয়া বলিল—হাঁ, এক রকম কাজ বই কি।

আমি বলিলাম—ভাঁড়ু ঠিক তেমনি আছ দেখছি' একটুও বদলাওনি;

ভাড়ু ভাঁড়টি হস্তান্তর করিয়া বলিল—সেই তো ছিল ভয়। আমি

বদলাইনি অথচ দেশ গিয়েছে বদলে। কিন্তু এসে দেখলাম কোন ভয় নেই। আমি বদলাইনি, দেশও বদলায়নি—বেশ খাপে খাপে মিলে গিয়েছে।

কিন্তু ঝুড়ির রহস্যটা এখনো পরিষ্কার হইল না—তাই পুনরায় বলিলাম, বলি ঝুড়ির ব্যাপারটা কি?

সে একটু কাশিয়া একটু হাসিয়া একটু নীচু স্বরে বলিল—আজ্ঞে কর্তা, নায়েবের বাড়ি ভেট নিয়ে যাচ্ছি।

ডাঁড়ু বলে কি! নায়েবকে চেনে না, শোনে না, ভেট লইয়া চলিয়াছে।

সে আমার মনোভাব অনুমান করিতে পারিয়া বলিল—ওই তো বললাম, দেশ একটুও বদলায়নি, কাজেই নায়েবও তেমনি আছে। এতে আর চিন্তার কি আছে?

বলিলাম, তোমার ঝুড়িটা একবার নামাও তো দেখি ভিতরে কি আছে?

ডাঁড়ু ঝুড়ি নামাইল। ভিতরে গোটা দুই লাউ, গোটা দুই কুমড়ো, কিছু বেগুন, উচ্ছে ইত্যাদি।

—ভাঁড়ে?

ডাঁড়ু বলিল—তেল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—এতে কি নায়েব খুসি হবে?

সে বলিল—বলেন কি? খাওয়ার জিনিস পেলে খুসি হয় না এমন মানুষ কি সম্ভব? মানুষকে সবচেয়ে খুসি করা যায় খাওয়ার জিনিস দিয়ে আর খাইয়ে। টাকা পয়সা যতই দিন, মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। আশার অন্ত নেই--কিন্তু পেটের একটা সীমা আছে।

বলিলাম—সবই তো হ'ল, কিন্তু হঠাৎ নায়েবকে ডালা দেবার প্রয়োজন কি?

সে দার্শনিকের মতো বলিল—কিছুই না—শুধু অভ্যাস ঠিক রাখা।

তাহার উৎকোচতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে আমার বিস্ময় ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হইতেছিল। বলিলাম, এ-সব উচ্চাঙ্গের কথা শিখলে কোথায়?

—আজ্ঞে আমি তো বাঙলা দেশেরই লোক।

উত্তরটি সংক্ষেপ—কিন্তু উহাতে সব বলা হইয়া গেল।

তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিলাম, ভাঁড়ু, দেশের পরিবর্তন হয়নি একথা কি সত্য?

সে বলিল—দেশ বলতে যদি শহর আর বাড়িঘর আর রেল মোটর বলেন, তবে পরিবর্তন হয়েছে বইকি! কিন্তু মানুষের মতিগতি ঠিক তেমনি আছে।

—আরো একটু খুলে বলো শুনি।

সে বলিল—মুকুন্দ ঠাকুরের চণ্ডীর পাঁচালি তো পড়া আছে। কাজেই দামুন্যা গ্রামের কথা আপনার অজানা নাই। বারা খাঁর অত্যাচারের কথাও জানেন।

—বারা খাঁর দাপটে ঠাকুরকে ভিটে মাটি ফেলে দামুন্যা ছেড়ে পালিয়ে বাঁকুড়া যেতে হ'য়েছিল। কিন্তু সকলের তো আর পালানো সম্ভব হয়নি—তাদের দুঃখের আর সীমা ছিল না।

—মুকুন্দ ঠাকুর লিখেছে যে পদ্মের নাল তুলে ক্ষুধিত শিশুকে খেতে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ভাগ্যবান তাই তাঁর পদ্মের নাল মিলেছেল। অধিকাংশ-কে নদীর জল পান করেই দিন কাটাতে হয়েছে—নদীর ঘোলা জল। নায়েবের সিপাই এসে বাড়ীঘর জালিয়ে দিয়ে গেল, লোকে পালিয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলো। তখন দেশে যথেষ্ট বন ছিল—এখন সবাই কোথায় পালায় কে জানে? এদেশে প্রচুর বন থাকা দরকার।

—বনের পশুদের বর্ণনাটা মনে আছে? সেই ভালুকের কথা? আমিই সেই ভালুক। ঠাকুর আমার কথা মনে করেই ভালুকের বর্ণনা করেছেন। মাঝে মাঝে আমি বাঁকুড়া গিয়ে তাকে সব কথা শুনিয়ে আসতাম। ঠাকুর যখন বললেন যে, দামুন্যার কাহিনী নিয়ে পাঁচালী লিখবেন—আমি পায়ে ধরে পড়লাম ঠাকুর আমার কথা একটু যেন থাকে। যেদিন ভালুকের বর্ণনা পড়ে শোনালেন, হেসে মরি! ঠাকুরও বলেন—ভাঁড়ু, তোমাকে ভালুক বলাতে রাগ করনি তো? আমি বললাম, রাগ? আমার চেহারা দেখে ভালুক ছাড়া আর কোনও জানোয়ারের কথা মনে হওয়া কি সম্ভব?

তারপরে একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল—সমস্ত বাঙলা দেশ

আজ দামুন্যায় পরিণত হয়েছে। কালকেতুর তাড়নায় এই প্রকাণ্ড অরণ্যের জীবজন্তুর বিব্রত। তখন বাঙলা দেশে একটি মাত্র দামুন্যা ছিল—আজ প্রত্যেক গ্রামই এক একটি দামুন্যা। সেই নড়বড়ে পাতার ছাউনি, সেই বর্ষার রাত্রে জল-পড়া ঘরে রাত্রি জাগরণ, তৈজসহীন আহারের সময়ে আমানি খাবার গর্ত থেকে আমানি পান, আর সেই শীতের দিনে গাত্রা-বরণহীন দরিদ্রের "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।"

অনেকক্ষণ বলিয়া সে হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া বলিল—ঠাকুর, সেদিনে আর এদিনে এত মিল, তাই ভাবলাম নায়েবের স্বভাবও ঠিক তেমনি আছে। তাই চলেছি।

এই বলিয়া একটা বৃহৎ সিংহদ্বারের অভিমুখে সে চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল—ভাঁড়ুর কথাই ঠিক। বাঙলা দেশ তেমনি আছে। আমরা যাহা পরিবর্তন বলিয়া দেখিতেছি তাহা মায়া। তখনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বাঙলা দেশের যথার্থ ঐতিহাসিক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কেবল তাঁহার ইতিহাস ঘটনার অনেক আগে লিখিত হইয়াছে। সেইজন্যই তাহা ইতিহাসের চেয়ে বড়—তাহা কাব্য।

ডাকিনী

চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ না থাকায় হলুদেকলসির চৌধুরীগণ কখনো তাহার চর্চা করে নাই এমন কি চতুর্বর্গের সারাংশ মাত্র রাখিয়া বাকিটুকু তাহারা বরাবর বর্জন করিয়া আসিতেছিল। এহেন কালে এবং এহেন ক্ষেত্রে কিভাবে চতুর্বর্গাতীত সরস্বতীর উদয় হইল তাহা বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। সংসারে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সর্বদাই রহিয়াছে।

হলুদেকলসির বর্তমান জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী পিতৃহীন। বয়স হওয়া সত্বেও এখন পর্যন্ত মাতাই তাহার অভিভাবক। এখনো সে বিবাহ করে নাই; তবে ভাবে গতিকে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এই অসহায় যুবকটি বিবাহ করিবামাত্র মায়ের অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অঞ্চল অবলম্বন

করিবে। কোন কোন পুরুষ চিরকাল স্ত্রীলোকের অঞ্চল ছায়ায় করদরাজ্যরূপে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। শশাঙ্ক চৌধুরী সেই দলের।

পূজার ছুটিতে শশাঙ্ক ও তাহার মাতা অম্বাময়ী দেওঘরে আসিয়াছেন। দেওঘরে শশাঙ্কের পিতা একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই একতলা বাড়ীর উপরে আরও তিনটে তলা চড়াইয়া দিয়া অম্বাময়ী বাড়ীটাকে পাড়ার মধ্যে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাড়ীটি তাঁহার পরম গৌরবের বস্তু। তাঁহাদের বহু পুরুষের পাণ্ডাঠাকুর হঠাৎ একদিন কোন কারণে বাড়ীটির একটি খুঁত প্রদর্শন করাতে অম্বাময়ীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তারপরে অনেক দিন তিনি দেবদর্শন করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। অম্বাময়ী জানিতেন, দেবদর্শন পাণ্ডার যেমন লাভ, দেবতার নহে। এত বড় দেওঘর সহরে একটি মাত্র পথ তাঁহার পরিচিত—মন্দির হইতে তাঁহার বাড়ীর পথ। এই দুটি স্থান ছাড়া কদাচিৎ অন্যত্র তিনি যাইতেন। একদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে বাড়ীর কাছে আসিয়া শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল—মা, তোমার বাড়ীটা যেন মন্দিরের চেয়েও উঁচু। দেবমন্দিরের উচ্চতা কল্পনাতে লঙ্ঘন করাও পাপ—কাজেই মাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন বটে—কিন্তু মনে মনে তেমন দুঃখিত হইলেন না। সেদিন চাহিবামাত্র শশাঙ্ক মাতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করিল। বলা বাহুল্য শশাঙ্কর পড়াশুনা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, সে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহার মা সগর্বে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ান—আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশান ফেল—যেন ধনীর ছেলে পক্ষে পাশ হওয়ার চেয়ে ফেল হওয়ার গৌরব বেশি।

যদুনাথবাবু সদাগরী অফিসের পেন্সনপ্রাপ্ত কেরানী। তিনি পূজার ছুটিতে দেওঘরে হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার মেয়ে মল্লিকা। মল্লিকাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। যদুনাথবাবু বিপত্নীক। মেয়েকে দিবার মতো অন্য কিছু তাঁহার নাই বলিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মল্লিকা এম-এ পাশ করিয়াছে। সেদিন পিতা-পুত্রী বাহির হইয়া অনেকটা ঘুরিবার পরে ক্লান্ত হইয়া হলদেকলসি কুটীরের গেটের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময়ে অম্বাময়ী মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিলেন। একটি অপরিচিত মেয়েকে বাড়ীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া

থাকিতে দেখিয়া তিনি শুধাইলেন—কি দেখছ মা? মল্লিকা ঠিক যে কি দেখিতেছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। এরকম ক্ষেত্রে সহজতম উত্তরটাই সে দিল—বাড়ীটা বেশ বাড়ী। আপনার বুঝি?

অম্বামযীর মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। হাঁ, মেয়েটি সমজদার বটে। কই এমন করিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে তো তাঁহার 'হৃদেকলসি কুটীরে'র প্রশংসা করে নাই।

তিনি বলিলেন—হাঁ মা, আমাদেরই বাড়ী। তা এখানে বসে কেন? এসো না ভিতরে। তারপরে গলা একটু খাটো করিয়া বলিলেন—উনি বুঝি তোমার বাবা?

মল্লিকা বলিল—হাঁ, বাবা।

যদুনাথবাবু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অম্বামযী মল্লিকাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু পথের লোক টানিয়া আনিয়া বিশ্রামের সুযোগ দান তো অম্বাময়ীর অভিপ্রায় নয়—তিনি ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মল্লিকাকে বাড়ীর অন্ধি সন্ধি সব দেখাইলেন। মল্লিকা কতকটা বা ভদ্রতার খাতিরে কতকটা বা সত্যের খাতিরে বাডীটার অনর্গল প্রশংসা করিয়া গেল। অম্বাময়ীর মন গলিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময়ে তিনি মল্লিকার নাম, ধাম পুছিয়া লইলেন এবং পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিবার জন্য পিতা-পুত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মল্লিকা অম্বাময়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রত্যহ বিকালে পিতাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে আসে। কয়েকদিন পরে একদিন অম্বাময়ী মল্লিকাকে বাগান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া নিজে চিকের আড়ালে থাকিয়া যদুবাবুর কাছে কর্মচারীর মারফৎ মল্লিকার সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

যদুবাবু ঠিক এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তাই কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—আমরা গরীব।

অম্বাময়ীর ইঙ্গিতে কর্মচারী বলিলেন—আমরা তো টাকাকড়ি চাই না—ভাল মেয়ে চাই। ঘর বর যদি আপনার অপছন্দ না হয়।

যদুবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ!

তারপরে শশাঙ্কের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এম-এ পাশরূপ

কেবল যে একটি খুঁত মেয়ের ছিল তাহা প্রকাশ পাইল না – প্রকাশ পাইলে কি হইত নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে।

অগ্রাণ মাসেই শশাঙ্কের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ দেওঘরে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আরও দূরবর্তী স্থানের হাওয়া বদল করিয়া দেখিবার জন্য যদুনাথবাবু পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মল্লিকা কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করিল। কিন্তু যে কাল দুঃখের কালো স্রোত ডাকিয়া আনে সেই কালই হাসির শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনারও বাহন। কালক্রমে তাহার চোখের জল শুকাইল এবং মুখে হাসি দেখা দিল। দেওঘরে কয়েকমাস কাটাইয়া ফাল্গুনের প্রথমে অম্বাময়ী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া হলুদেকলসি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২

গুড়নদীর তীরে আম কাঁটাল জাম নারিকেলের গাছের মধ্যে হলুদেকলসি গ্রাম। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামখানির প্রভেদ নাই। এপারে মানুষের বাস, ওপারে বিস্তীর্ণ চাষের ক্ষেত। তারমধ্যে আখের ক্ষেতটাই বেশি নজরে পড়ে। শরৎকালে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রৌঢ় আখের সারি সঙীন-তোলা ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শরৎকালের মধ্যেই এই উদ্ভিজ্জ বাহিনী আততায়ীর কাটারির আঘাতে ভূমিশায়ী হইয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া দূরবর্তী চিনির কলের দিকে প্রস্থান করে। শীতের শেষে এখন আখের ক্ষেত শূন্য। রবিশস্য পক্ক প্রায়। ধান-কাটা মাঠে আগুন ধরাইয়া দিয়া ধানের গোড়া পোড়ানো চলিতেছে। ওপারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নানা রকম শস্যের পরিণতি লাভের প্রয়াস ; এপারে শত রকমের শব্দে তরুরাজি আচ্ছাদিত মানুষের বসতির লক্ষণ। মাঝখানে গুড়নদী দুই দিকের শৈবালের পাড় দেওয়া গঙ্গাজলী শাড়িখানি পরিয়া শীর্ণ স্রোতে চলমানা। সে না মানুষের, না প্রকৃতির।

মল্লিকা সহরের মেয়ে, গ্রামে আসিয়া নিজেকে বড়ই অসহায় অনুভব করিল। এখানকার নিস্তব্ধতা কেমন যেন বুক চাপিয়া ধরে—এখানকার

নির্জনতা কেমন যেন অস্বস্তিকর। সহরের মেয়ে গ্রামের মধ্যে কোথাও অবলম্বন পায় না। নূতন আত্মীয়স্বজন এখনও তাহাকে প্রসারিত মনে গ্রহণ করে নাই—নূতন বধূর প্রতি সব শ্বশুরকুলেই প্রথমে একটা প্রতিকূলতার ভাব থাকে। মল্লিকার প্রতি প্রতিকূলতা কিছু বেশি ছিল। অম্বাময়ী কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, কাহাকেও ভাল করিয়া না জানাইয়া তাহাকে ঘরে আনিয়াছেন। সে দোষ যেন মল্লিকারই—মল্লিকার উপরে সকলের রাগটা কিছু বেশি। কারণ, অম্বাময়ীর উপরে রাগ করা চলে; কিন্তু রাগ প্রকাশ করা চলে না। মল্লিকা একা বসিয়া থাকিলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের অহঙ্কার। আবার সকলের সঙ্গে মিশিতে গেলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের নির্লজ্জতা। মল্লিকার সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ ক্রমেই যখন সঙ্কটের মুখে—তখন তাহার এক জ্ঞাতি ননদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—মল্লিকা ইংরাজি পড়িতেছে। সে তখনি দৌড়াইয়া গিয়া প্রচার করিয়া দিল--বৌদি ইংরাজি পড়ে। দেখিতে দেখিতে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—চৌধুরীদের নূতন বউ ইংরাজি পড়ে! সংবাদটা নানা মুখ ঘুরিয়া অবশেষে শশাঙ্কর কানে আসিয়া পৌছিল। সে রাত্রিবেলা মল্লিকাকে পুছিল—মল্লি, তুমি নাকি ইংরাজি পড়ো?

মল্লিকা বলিল, হাঁ।

কিন্তু মল্লিকা যেমন আশঙ্কা করিয়াছিল শশাঙ্ক রাগ করিল না—বরঞ্চ যেন খুশী হইল।

শশাঙ্ক বলিল—কি বই? ফার্ষ্ট বুক? আমিও ওই বই দিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম। তুমি কি বই পড়ছিলে?

মল্লিকার বইয়ের নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু স্বামীর পীড়াপীড়িতে বইখানা বাহির করিতে হইল। শশাঙ্ক দেখিল—ফার্ষ্টবুক নয়, ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা পাতা—বেশ মোটা বই ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড। শশাঙ্ক গিন্নীর ইংরাজি জ্ঞানে চমৎকৃত হইয়া গেল—এবং পরদিনই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়া নিজে পত্নীর লেখাপড়া প্রচার করিবার ভার লইল। ইহার ফলে মল্লিকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। একে তো চৌধুরী বাড়ীর বউয়ের পক্ষে ইংরাজী পড়া প্রথাবিরুদ্ধ—তার উপরে তাহার স্বামী এই

কাজের সহায়। শশাঙ্ক যদি মল্লিকাকে তিরস্কার করিত—তবে সকলে খুশী হইত কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল।

শশাঙ্ক সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মল্লিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে। শশাঙ্ক তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল—কান্নার কারণ মল্লিকা বলিল না। কি বলিবে, কেন এই কান্না নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কোন উত্তর না পাইয়া শশাঙ্ক বলিল—মল্লি তোমার কি এখানে মন টি্ঁকছে না?

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শশাঙ্ক বলিল—চলো আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। মল্লিকা খুশী হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিল—এখন বেশ গরম পড়েছে, চলো দার্জিলিং যাওয়া যাক। এবারে মল্লিকার মুখে হাসি ফুটিল।

পরদিন শশাঙ্ক মাতার কাছে প্রস্তাব করিল যে, সে দার্জিলিং যাইতে চায়। অম্বাময়ী পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন ধনীর ছেলেরা দার্জিলিং-এ যায়; কাজেই তিনি বলিলেন, বেশ তো স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে যাও না বাবা।

শশাঙ্ক বলিল—পাল্কীও লাগবে যে।

বিস্মিত অম্বাময়ী বলিল—পাল্কী লাগবে কেন?

শশাঙ্ক বলিল—মল্লিকাও যাবে।

অম্বাময়ীর মাথায় বিস্ময়ের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মল্লিকার ইংরাজি পড়ার কথায় তিনি রাগ করেন নাই—কারণ যে বধূকে তিনি একার দায়িত্বে নির্বাচন করিয়াছেন, সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাঁহারি গৌরব। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর বধূ স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং যাইবে! অম্বাময়ী নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন হাসিমুখে অনুমতি না দিলে শুকমুখে পুত্র ও পুত্রবধূর দার্জিলিং যাত্রার অসম্মত সাক্ষ্য বহন করিয়া তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইবে। কাজেই তিনি বলিলেন—বেশ তো বউমাও ঘুরে আসুক না কেন। অম্বাময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুঝিতে পারিলেন—এতদিনে মাতার অঞ্চল হইতে বধূর অঞ্চলে শশাঙ্কর সংক্রান্তি ঘটিয়াছে। তিনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মুখ বুজিয়া রহিলেন। পুত্রস্নেহগোর বধূর প্রতি তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন।

দার্জিলিং-এর স্নিগ্ধ শুশ্রূষার মধ্যে আসিয়া মল্লিকার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল! সংসারের সবগ্লানির উপরে সুধার প্রলেপ দিবার জন্যেই তো দিকে দিকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের সুধার তুলি উদ্যত করিয়া গিরিরাজ এত আড়ম্বর করিয়াছেন। কুয়াশায় সিক্ত অঞ্চলখানা সেই জন্যেই মানুষের মনের উপর দিয়া তিনি এতবার করিয়া বুলাইয়া দেন—মুছিয়া যাক সব তাপ, ঘুচিয়া যাক সব দাহ। এখানেও যে সান্ত্বনা না পায়—সে সত্যই দুর্ভাগা। মল্লিকা আর শশাঙ্ক সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। ধাপে ধাপে পাহাড় নামিয়া গিয়াছে, যাহার নিম্নতম প্রান্তে প্রবল স্রোতস্বিনী—গর্জনের দ্বারা মাত্র অনুমানগম্য। থাকে থাকে বলিষ্ঠ বৃক্ষরাজি উঠিতে উঠিতে আকাশকে প্রায় ছুঁইয়া দিয়াছে আর কি—যেখানে পরীদের খেলার ঘড়ির মতো পাণ্ডু চাঁদখানা ঝুলিয়া আছে! সর্পিল পথ. গভীর উপত্যকা, উচ্চ শৃঙ্গ—এসব কি কল্পনায় পাইবার? এমন ঘন শ্যামলতা আর এমন ফুলের বৈচিত্র্য! আর এই স্বর্গীয় রঙ্গমঞ্চে আলো-ছায়ার অর্ধ-নারীশ্বরের যে অন্তহীন অভিনয় চলিতেছে, কুয়াশার মলমল তাহার উপরে অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দেয়! মল্লিকা ভাবে এই রহস্য, এই সৌন্দর্য, এ কি এই জগতেরই অন্তর্গত, না তাহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—যেথান হইতে আভাসে অন্য এক জগতের এই সব ছবি দৃশ্যমান? মল্লিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। শশাঙ্ক খুশী হইল। দুইমাস কাটাইয়া তাহারা আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

৩

শশাঙ্ক ও মল্লিকা ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই সকলের চোখে যে পরিবর্তনটা ধরা পড়িল—শশাঙ্কর শরীর খারাপ। সে কৃশ ও কেমন যেন রক্তশূন্য! তবে নাকি দার্জিলিঙে গেলে শরীর ভাল হয়! যাহারা কখনো দার্জিলিঙে যায় নাই—আর যাইবারও যাহাদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই—তাহারা শশাঙ্কর দৃষ্টান্তে দার্জিলিং না যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। অথচ ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ মল্লিকা গালে ও দেহে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

অন্নময়ী কাতর হইয়া বলিলেন—এ কি বাবা তোর শরীর এত খারাপ হল কেন?

শশাঙ্ক বলিল—ওখানে পাহাড়ে ওঠানামা করতে গেলে শরীর একটু খারাপ হয়। ও কিছু নয়।

অম্বাময়ী বলিলেন—সে আবার কি কথা! দেওঘরের বাড়িতে চারতলা থেকে একতলায় দিনের মধ্যে কতবার ওঠানামা করেছিস, কই তোর শরীর তো খারাপ হয়নি!

যাই হোক অম্বাময়ী চিন্তিত হইয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহার শরীরের বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। ওই সঙ্গে মল্লিকার শরীরটাও যদি সমান খারাপ হইত তবে হয়তো এ পরিবর্তন তেমন করিয়া কাহারো চোখে পড়িত না—কিংবা পড়িলেও কেহ কিছু মনে করিত না। এখন শশাঙ্কর পরিজন বিশেষ করিয়া তাহার মাতা বধূর উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলাদেশেই বোধ করি শরীর ভালো থাওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ।

পূজার পরে অম্বাময়ী স্থির করিলেন এবারে দেওঘরে না গিয়া কাশী যাইবেন। তিনি শশাঙ্ককে বলিলেন—বাবা আমাকে কাশী নিয়ে চল।

শশাঙ্ক কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অম্বাময়ী বলিলেন—না, না, বিদেশে বৌটাকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাইনে। সে থাকুক। আর আমরা তো বেশি দিন ওখানে থাকবো না।

আসলে বৌমার কষ্টটা নিতান্তই অবান্তর। বধূ যে পুত্রকে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিল—ইহা তাহারই উত্তর। অম্বাময়ী দেখাইয়া দিতে চান—পুত্রের উপরে এখনো তাঁহার পূর্ববৎ অধিকার আছে। বধূ যদি তাহাকে মার কাছ হইতে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং যাইতে পারে—তবে মাতাও তাহাকে বধূর কাছে হইতে টানিয়া কাশী লইয়া যাইতে সক্ষম। শশাঙ্ক তাঁহার সঙ্গে যাইবে, মল্লিকা যাইবে না, এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল বোধ করিলেন—এমন কি পুত্রবধূর সঙ্গে অনেক দিন পরে এক আধটা কথাও বলিয়া ফেলিলেন।

অম্বাময়ী ও শশাঙ্ক কাশী পৌঁছিলে পরিচিত আত্মীয়স্বজন দেখা করিতে আসিল। তাহারা আসিয়া সকলেই একবাক্যে জানাইল অম্বাময়ীর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ কথাটা সত্য নয়, দ্বিতীয়তঃ, ওটা একটা অভ্যর্থনার অর্থহীন প্রথামাত্র। উভয় পক্ষেই জানে কথা অমূলক তবু

বলিতে হয়—ওটা ভদ্রতা। কিন্তু সত্যটাও তাহাদের চোখ এড়াইল না। শশাঙ্কর শরীর যে অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই উদ্বেগ অনুভব করিল।

এই সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একজন নিস্তারিণী দেবী। ইনি শশাঙ্কর দূরসম্পর্কিত পিসি। এক সময়ে নিস্তারিণী দেবী শশাঙ্কদের সংসারেই থাকিতেন—এখন তাহাদেরই প্রদত্ত মাসহারায় কাশী বাস করেন। তিনি শশাঙ্কর কৃশতা দেখিয়া একপ্রকার ডুকরিয়া উঠিলেন—ও বৌদি এ কি সর্বনাশ তুমি করেছ! সোনার চাঁদ যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিস্তারিণীর প্রতিকূল সমালোচকগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহার স্বরের উচ্চতার উপরে মাসহারার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—কিন্তু তাহা ছাড়া কিছু আন্তরিকতা থাকাও অসম্ভব নয়!

নিস্তারিণী পুছিলেন কবে থেকে এমন হল? অম্বাময়ী বলিলেন, বিয়েব পর থেকেই তো চোখ পড়ছে।

বলা বাহুল্য কথাটা মিথ্যা। কিন্তু যে পুত্রবধূর উপরে তিনি রুষ্ট তাহার উপরে স্বভাবতঃই দোষটা চাপাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীরও কথাটা মনে লাগিল। কারণ শশাঙ্কর বিবাহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও যাইবার রাহা খরচ পান নাই—সেজন্য গোড়া হইতেই তিনি বধূকে দোষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই এখন অম্বাময়ীর কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল শশাঙ্কর যে শরীর খারাপ তাহার জন্য মল্লিকাই দায়ী।

অম্বাময়ী বলিলেন, সেই জন্যেই তো শশাঙ্ককে নিয়ে পশ্চিমে এসেছি, দেখি যদি তাহার শরীরটা সারে। নিস্তারিণী সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না—সেদিনের মতো উঠিয়া পড়িলেন।

দু'চার দিন পরে আবার নিস্তারিণী আসিলেন। বিশ্বনাথের মহিমা, ব্যাসকাশীর ইতিহাস, বাজার দর প্রভৃতি যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক আলোচ্য বিষয় আছে তাহার সমালোচনা অন্তে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, হাঁ বৌদি, এ কয়দিন আমি শশাঙ্কর কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। সোনার চাঁদের শরীর যে এমন কহিল হয়ে গেল এর তো একটা বিহিত করতে হবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—সেই জন্যেই তো, বোন পশ্চিমে আসা!

নিস্তারিণী বলিলেন—পশ্চিমে এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু এত জায়গা থাকতে বাবা বিশ্বনাথ নিজ ক্ষেত্রে টেনে আনলেন কেন? এ বাবার দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বাবার দয়াতে অম্বাময়ীর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু ঠিক কি আকারে সে দয়া প্রকাশিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন নিস্তারিণী গলা খাটো করিয়া সুরু করিলেন, চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন—একেবারে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালদর্শী।. কত লোক যে তাঁহার প্রসাদে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছে তার সীমা সংখ্যা নাই—এই বলিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। এবং অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—একবার তাঁহার কাছে গেলে হয় না—কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও পশ্চিমের জল হাওয়া স্বাস্থ্যদায়ক বটে, কিন্তু বাবার দয়া ও ব্রহ্মচারী মাতার শক্তির কাছে কিছুই কিছু নয়।

অম্বাময়ীর এরূপ আধিদৈবিক চিকিৎসায় আপত্তি হইবার কথা নয়, বিশেষ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি অবিলম্বে রাজি হইলেন। স্থির হইল পরদিন উভয়ে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাইবেন।

চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ভাঙা দোতলা বাড়িতে ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন। পরদিন অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী যখন তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও আসন ছাড়িয়া ওঠেন নাই। দুজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—অম্বাময়ী পায়ের কাছে মোটা প্রণামীর টাকা রাখিলেন। অম্বাময়ী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন—হাঁ প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী বটেন—মাথার জটা হইতে পা পর্যন্ত আধিদৈবিক ক্ষমতায় দেদীপ্যমান। মাতার যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি বিশাল মুখমণ্ডলে ভাঁটার মতো দুটি চোখ, মাথার জটা পিঠ ঢাকিয়া মাটিতে লুণ্ঠিত গলায় থাকে থাকে ছোট বড় রুদ্রাক্ষের একরাশ মালা, কপালে সিঁদুরের ছাপ, পরিধানে গেরুয়া, পাশে রক্ষিত রক্তবর্ণ ত্রিশূল—সম্মুখে রক্তজবার এবং রক্তচন্দনের পূজার উপকরণ—পাশে নরকপালে কারণবারি।

তিনি বলিলেন — শুভমস্তু !

হাঁ—দেহের অনুরূপ কণ্ঠস্বর। মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া মুহূর্তে বিনাশ করিবার মতো তাঁহার প্রবল প্রচণ্ডতা।

অম্বাময়ী চুপ করিয়া থাকিলেন আর নিস্তারিণী তাঁহাদের আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গেলেন। সব শুনিয়া ব্রহ্মচারী মাতা তাহাদিগকে আগামী শনিবারে পুনরায় আসিতে বলিলেন—ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত সমস্যার নাকি মীমাংসা করিয়া রাখিবেন।

শনিবারের পরে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পরে অমাবস্যা—এমনি করিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও বারে দুইজনে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই অম্বাময়ী মাতাকে মোটা প্রণামী দিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তপস্যার্জিত বুদ্ধিবলে বুঝিলেন—অতঃপর নীরব হইয়া থাকিলে ভক্তের সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা—কাজেই একদিন শনিবার অমাবস্যা তিথিতে তিনি অম্বাময়ীর সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী মাতা অম্বাময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন — বাছা, তোমার পুত্রবধূর ডাকিনীর অংশে জন্ম। ডাকিনীর অংশে যে-সব স্ত্রীলোকের জন্ম তাহারা স্বামীহন্ত্রী হয়। তাহাদের প্রভাবে স্বামীরা ধীরে ধীরে শুকাইয়া মারা যায়। স্বামী যতই শুকাইয়া আসিতে থাকে, ডাকিনী ততই স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী হইয়া ওঠে।

অম্বাময়ী মনে মনে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলেন—সবই তো সত্য বটে। শশাঙ্ক কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে—মল্লিকার স্বাস্থ্য ও রূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

ডাকিনীর অংশে জন্ম বলিতে কি বুঝায় ব্রহ্মচারী মাতা তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শনি মঙ্গলবারে, আমাবস্যা তিথিতে কামরূপ কামাখ্যা হইতে ডাকিনীর ঝাড় গভীর রাত্রে আকাশ পথে উড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার গতিপথের নীচে কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে ডাকিনী তাহাকে ভর করে। তাহার মধ্যে ডাকিনীর অংশ আসিয়া বর্তায়। এইরূপ কন্যার মাতা প্রায়ই জীবিত থাকে না।

অম্বামরী দেখিলেন—কথা ঠিক। মল্লিকার মাতা তাহার জন্মের কিছুদিন পরেই মারা গিয়াছিল। অম্বাময়ী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন - মাতাজী, এখন তুমি উপায় করিয়া দাও।

মাতাজী হাসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বাছা তোমার ভয় নাই। আমার কাছে ডাকিনী যোগিনী সবাই জব্দ—কারণ আমি কামরূপ কামাখ্যায় গিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ডাকিনী সিদ্ধ হইয়াছি। আমি এখন মন্ত্রপূত আধিদৈবিক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিব যাহাতে তোমার পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিনী অংশ পলায়ন করিবে, তোমার পুত্রের পুনরায় স্বাস্থ্যোদ্ধার ঘটিবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার পুত্রকে একবার এখানে লইয়া আশা দরকার—কারণ তাহাকে সজ্ঞানে স্বয়ং এই ঔষধ পুত্রবধূর হাতে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অম্বাময়ী এই প্রস্তাবে প্রমাদ গনিলেন। শশাঙ্ক নিশ্চয় এসব কথা বিশ্বাস করিবে না—আর একটা গণ্ডগোল করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—মাতাজী, আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর—তাহাদের নাস্তিক বলিলেই চলে। তাহারা কি এসব দৈব বাখ্যায় বিশ্বাস করিবে?

মাতাজী নরকপাল হইতে খানিকটা পানীয় গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—বাছা সেজন্য তুমি ভাবিও না। মহাশক্তির কৃপায় আমি এমন ক্ষমতা লাভ করিয়াছি যে মহানাস্তিকেও আমার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। তোমার পুত্রকে আনিও, আমি যাহা বলিব—তাহাই সে বিশ্বাস করিবে।

বাস্তবিক ঘটিলও তাই। মাতার সঙ্গে কয়েকদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাতায়াতের পরে শশাঙ্কও বিশ্বাস করিয়া ফেলিল যে, তাহার পত্নীর ডাকিনীর অংশে জন্ম—সেইজন্যই তাহার শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে! ব্রহ্মচারী মাতার প্রদত্ত ঔষধ পত্নীর হাতে বাঁধিয়া দিলে তাহাদের উভয়ের মঙ্গল! শশাঙ্ক এই কাজে সম্মত হইল—কতকটা বা পত্নীর মঙ্গল কামনায়, কতকটা বা নিজের ইষ্ট চিন্তায় কতকটা মায়ের কান্নাকাটিতে, কতকটা ব্রহ্মচারিণীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

মানুষ একান্তই ঘটনাচক্রের দাস। কে কি বিশ্বাস করিবে, কে কি কাজ করিবে তাহার খুব সামান্য অংশই নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে।

ঘটনার ব্যক্তিত্বের কাছে তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব অতিশয় দুর্বল। তার উপরে আবার শশাঙ্ক চিরদিন দুর্বল প্রকৃতির জীব—মাতার আশ্রয়ে থাকায় তাহার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাবালকত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মচারিণী মন্ত্রপূত সিন্দুর লিপ্ত মটরদানার মতো একটি বস্তু দিলেন। ইহা বধূর বামহস্তে বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাতাপুত্রে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, মল্লিকার জন্য এক জোড়া অনন্ত গড়াইয়া লইয়া যাইবে, যাহার বাম হাতেরটির মধ্যে মটরদানাটি ভরিয়া দেওয়া থাকিবে। কাজেই মল্লিকার জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না—অথচ কাজ উদ্ধার হইয়া যাইবে।

মাতা পুত্র ও নিস্তারিণী দেবী তিনজনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন। নির্দেশমতো অনন্ত গড়া হইল—এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইল। এইবার তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে দেশে রওনা হইলেন—সঙ্গে নিস্তারিণী দেবীও চলিলেন।

৪

মাঝ রাত্রে শশাঙ্ক ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল শুভ্র কোমল শয্যার একান্তে মল্লিকা পড়িয়া ঘুমাইতেছে—জানালা দিয়া অবারিত জ্যোৎস্নার ধারা আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে—শুভ্র শয্যায় শুভ্রতরা রমণী—রজনীগন্ধার বনে মূর্ছিত জ্যোৎস্না। এই মল্লিকাই কি ডাকিনী? তাহার বিশ্বাস হইল না। সেদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা হয় নাই—আজ তাহা মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা মনে হইল। না এ হইতেই পারে না। কিন্তু তবু তো সে এই বিশ্বাসের বশেই কাজ করিয়াছে—এই বিশ্বাসের বশেই ঔষধভরা অনন্ত জোড়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া অনন্ত জোড়া মল্লিকার হাতে দিয়া শশাঙ্ক বলিয়াছিল—পরো, নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার।

মল্লিকা পুছিয়াছিল—আচ্ছা এর নাম অনন্ত কেন?

শশাঙ্ক বলিয়াছিল—দেখছ সাপের আকারে গড়া, সাপের নাম যে অনন্ত। তারপরে বলেছিল—এ যে আমার অনন্ত ভালবাসার প্রতীক।

মল্লিকা বলিল—অনন্ত, তবু অন্ত আছে। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—কোন ভালবাসার বা অন্ত নাই!

সে কি তখন স্বপ্নেও জানিত ওই অনন্ত কি বিষম বিষ বহন করিয়া তাহার বাহুযুগলকে জড়িত করিল?

শশাঙ্কর চোখে সেই অনন্ত জোড়া পড়িল। ইচ্ছা করিল টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলে—ইচ্ছা করিল সকল কথা তাহাকে বলিয়া মার্জনা চায়। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইল না—বধুর পাশে শুইয়া পড়িল। তাহাকে নিকটে টানিতে গেলে ঘুমের মধ্যে মল্লিকার বাহু তাহাকে আঘাত করিল—বাম হাতের অনন্ত অতর্কিতে তাহাকে জোরে লাগিল। শশাঙ্ক তাকাইয়া দেখিল অনন্তের লাল পাথর বসানো চোখ জ্যোৎস্নায় সাপের চোখের মতো জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক দূরে সরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শশাঙ্কদের সংসারে তাহাদের দূরসম্পর্কিত এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকা প্রতিপালিত হইত। কালো মোটাসোটা মেয়েটি, মুখ কৌতুক-কৌতূহলে ভরা।

তাহার সঙ্গে মল্লিকার সবচেয়ে বেশি স্নেহের সম্পর্ক ছিল। সে যে নিজে ওর মতই পিতৃমাতৃহীন। মেয়েটির নাম ফড়িং। মল্লিকা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিত—কুমড়ো। সন্ধ্যা হইলেই কুমড়ো তাহার শয্যার আসিয়া আশ্রয় লইত—মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো।

সেদিন কুমড়ো আসিয়া বলিল—মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো—তোমাদের দেশের গল্প। মল্লিকা কলিকাতার গল্প বলিতে উদ্যত হইলে, কুমড়ো বলিল—ও গল্প নয়, তোমাদের দেশের গল্প।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—কেন কলকাতাই তো আমার দেশ।

কুমড়ো মাথা নাড়িয়া বলিল—না, আমি শুনেছি তোমাদের দেশ অন্যখানে।

বিস্মিত মল্লিকা বলিল, অন্যখানে—কোথায় আবার?

কুমড়ো বলিল—হুঁ ফাঁকি দিলে চলবে না—তোমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে!

এবারে মল্লিকা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—ও-কথা আবার কে বললে?

কুমড়ো বলিল—কেন সবাই তো জানে—সবাই তো বলে। তোমার

বাড়ি কামরূপ কামিখ্যে—তুমি ডাকিনী! তারপরে থামিয়া বলিল—আচ্ছা মাসি ডাকিনীরা নাকি আকাশ দিয়ে চলে? তুমি আকাশ দিয়ে যদি উড়ে যেতে পারো তবে দার্জিলিং যাবার সময়ে পাল্কী করে গেলে কেন?

মল্লিকা বলিল—দূর পাগলি আমি ডাকিনী হতে যাবো কেন?

কুমড়ো বুঝিল, মাসির এখানে তাহাকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা। ডাকিনী জীবনের পরম লোভনীয় গল্পগুলি না শুনিতে পারিলে আর মাসির প্রিয়পাত্র হইয়া লাভ কি?

সে বলিল—কাশী থেকে ওই যে বুড়ি এসেছে সে সব কথা বলেছে। তুমি ডাকিনী—মানুষের রূপ ধরে আছো. রাতের বেলায় সকলে ঘুমোলে ছাদ ফুটো করে একখানা হাড় হয়ে আকাশ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে যাও—আবার ভোরবেলা ফিরে এসে মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকো।

ইহা শুনিয়া মল্লিকা হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল—ছি কুমড়ো—ও কথা বলতে নেই। তোমার মেসো মশাই শুনলে রাগ করবেন।

কুমড়ো বলিল—রাগ করবেন না ছাই। তুমি ভাবছো মেসো মশাই জানেন না। তিনিও জানেন। তিনিই তো তোমাকে ওষুধ পরিয়ে দিয়েছেন!

মল্লিকা বলিল—ওষুধ আবার কই?

—কেন ওই অনন্ত জোড়া—ওরই বাঁ হাতেরটিতে বাবা বিশ্বনাথের ওষুধ ভরা আছে। পাছে তুমি জানতে পারো বলে অনন্তের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে।

মল্লিকা বিস্ময়ে, ক্রোধে, হতাশায় চুপ করিয়া রহিল! গল্প জমিবার আশা নাই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কুমড়ো প্রস্থান করিল।

মল্লিকা ডাকিনী—শশাঙ্ক একথা বিশ্বাস করে—অনন্তের মধ্যে ওষুধ ভরা—সব কেমন বিপর্যয়কর ঘটনা। একমুহূর্তে চিরদিনের চেনা পৃথিবী যেন ওলট-পালট হইয়া গেল!

কাশী হইতে শশাঙ্কদের প্রত্যাবর্তনের পরে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে এতক্ষণে সে-সব নূতন অর্থে তাহার চোখে নূতন আকার ধারণ করিল।

তাহার মনে পড়িল নিস্তারিণী বুড়ি গোড়া হইতে তাহাকে ভাল চোখে

দেখে নাই। সে পারতপক্ষে মল্লিকার সঙ্গে কথা বলিত না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে মল্লিকার কথা যে বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ মল্লিকা আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যাইত—সকলের সঙ্গে একটা অর্থভরা ইসারার বিনিময় হইত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের তাহার কাছে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেটিকে একবার সে কোলে লইয়াছিল অমনি তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল—অথচ কাশী হইতে ইহারা ফিরিবার আগে ছেলেটা সারাদিন মল্লিকার কাছেই থাকিত। ঠাকুর ঘরে মল্লিকার প্রবেশ একপ্রকার নিষেধ হইয়া গিয়াছিল—ঢুকিতে গেলেই অম্বাময়ীর সতত-সতর্ক চোখ তাহা ধরিয়া ফেলিত—অমনি হুকুম হইত—বৌমা ওদিকে আবার কেন? কিংবা ওখানে তোমার কি দরকার বৌমা!

সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি রকম বিপদ? কিসে ইহার সমাধান, কোথায় ইহার সান্তনা? শশাঙ্কও নাকি তাহার ডাকিনীত্বে বিশ্বাসী!

বাড়ির মধ্যে প্রাচীর ঘেরা একটি ফুল বাগান ছিল, কেহ যত্ন লইত না বলিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছিল—কোন গাছে কখনো বা ফুল ধরিত, কখনো ধরিত না। শশাঙ্ক কাশী বেড়াইতে গেলে সময় কাটাইবার জন্য মল্লিকা সেই বাগানের যত্ন লইত। বাগানের একান্তে একটা জবা গাছ ছিল। গাছটায় ফুল ধরিত না। মল্লিকার যত্ন ও জল পাইয়া গাছটা অজস্র ফুলে ভরিয়া গেল। মল্লিকা বলিল—ভালই হল, মা কাশী থেকে ফিরলে জবাফুলের অভাব হবে না। কিন্তু অম্বাময়ী ফিরিবার পরও সে ফুল পূজার জন্য সংগৃহীত হইত না। মল্লিকা একদিন শাশুড়ীকে ওই ফুল লইবার জন্য বলিয়াছিল—শাশুড়ী কোন উত্তর দেন নাই—তার পরিবর্তে নিস্তারিণী বুড়ি উত্তর দিয়াছিল—ও ফুল অশুচি—পূজায় দিতে নেই। তখন মল্লিকা ভাবিয়াছিল কাশীবাসিনী হয়তো পূজার পুষ্প নির্বাচনের এমন কোন গূঢ় রহস্য জানে—যাহা তাহার জানা নাই। কিন্তু আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ডাকিনীর যত্নে ফোটা ফুল দেবপূজায় নিষিদ্ধ!

কিন্তু শশাঙ্কও যে এই নিদারুণ মিথ্যায় বিশ্বাসী, এই কথাটা তাহার মর্মে নিরন্তর খোঁচা দিতে লাগিল।...কিন্তু সত্যই কি সে তাহাকে ডাকিনী বলিয়া

বিশ্বাস করে?…দূর ছাই, এত চিন্তায় কাজ কি? হাতেই তো প্রমাণ আছে। কুমড়ো বলিল, বাম হাতের অনন্তের মধ্যে ডাকিনী তাড়াইবার ঔষধ বর্তমান! কুমড়ো এসব কথা কানাঘুষায় না শুনিলে বলিবে কেমন করিয়া?

মল্লিকা একটা নোড়া সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপরে অনন্ত জোড়া খুলিয়া বাম হাতেরটিতে সবলে আঘাত করিল—এক আঘাতেই অনন্ত ভাঙিয়া গিয়া ভিতর হইতে সিন্দুর লিপ্ত একটা মটরদানার মতো বস্তু বাহির হইয়া আসিল। সে বস্তুটিকে হাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে দেখিল—চিনিতে পারিল না, কি। তবু সে ভাবিল—ইহা স্যাকরার অনবধানতা প্রযুক্ত কোন বাজে জিনিষ হইলেও হইতে পারে—দেখা যাক ডান হাতেরটিতে কি আছে? তখনি সে আর এক আঘাতে ডান হাতের অনন্তখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল—কিছুই বাহির হইল না—সব শূন্য। সেই রুদ্ধ নির্জন ঘরে, শূন্য মেঝের উপরে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেই ঔষধটি হাতে করিয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে ডাকিনী, সে ডাকিনী, তাহাকে তাড়াইবার জন্য এত ঔষধ, এত ষড়যন্ত্র, এত আয়োজন। সে-ও তো দুর্বল নহে, তাহারও বিষম শক্তি আছে! হঠাৎ সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—তার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল বলিয়া রাত্রে দরজা খুলিতে হইল না। ডাকিনী আহার করিল কি না করিল, সে সন্ধান করিবার প্রয়োজনও কেহ অনুভব না করাতে সারারাত্রির মধ্যে কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরদিন প্রত্যূষে মল্লিকা এক নূতন জগতে এক নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিল।

৫

মল্লিকা বাড়ির লোকের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। আগে সে মিশিতে চেষ্টা করিত—লোকে এড়াইয়া চলিত। এবারে চেষ্টাও পরিত্যাগ করিল, স্বামী থাকিলে তাহার সঙ্গে মিশিত—কিন্তু এখন তাহার মনে পড়িল ইদানীং স্বামী ও যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। কয়েকদিন আগে শশাঙ্ক কাজের নাম করিয়া কলিকাতায় গিয়াছে—অনেক কয়েকদিন হইয়া গেল, আসিবার নাম নাই। ইহাও কি তাহাকে এড়াইয়া চলিবার একটা পন্থা নয়। মল্লিকা

জানিত না বটে, কিন্তু কথাটা সত্য। নিস্তারিণী আসিয়াই অম্বাময়ীকে বুঝাইয়াছিল যে, ছেলেকে যতটা সম্ভব মল্লিকার কাছ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অবশ্য হাতে ঔষধ থাকা পর্যন্ত কোন ভয় নাই—তবু সাবধনে হইতে দোষ কি? তাহার পরামর্শেই অম্বাময়ী পুত্রকে কাজের অছিলায় কলিকাতা পাঠাইয়াছেন —এবং নিত্য নূতন কাজের ফরমাস পাঠাইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনের বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। মল্লিকা এত খবর রাখিত না কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির বলে তাহার অনুমান প্রায় ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়াছিল।

বাড়িতে স্বামী নাই—অন্যান্য কাহারো সঙ্গে সে মেশে না কাজেই মল্লিকা যেন লোক-সমাজে থাকিয়াও লোকসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িল। প্রেততাত্ত্বিকেরা বলেন, লোকের ভিড়ের মধ্যেই ছায়া শরীরীরা বিচরণ করিতেছে—মানুষে তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছে না—কিন্তু উভয়পক্ষই যে আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মল্লিকা ও বাড়ীর সকলের মধ্যে যেন সেই সম্বন্ধ। সে কাছে থাকিয়াও দূরে, ঘরের বধূ হইয়াও ঘরের নয়, মানুষ হইয়াও ডাকিনী। কেবল একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। লম্বা হাতার জামা পরিয়া অনন্তশূন্য বাহুদ্বয় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

একবার সে ভাবিল শশাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া জানাইবে। কিন্তু কি লিখিবে? তিনিও তো এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। তবে সেই কথাই সে না লেখে কেন? কিন্তু ইহার তো কোন প্রমাণ নাই, ছোট একটা মেয়ে কি বলিয়াছে তাহার উপর নিভর করিয়া লিখিলে তিনি তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি হাসিয়া উড়িয়াই যায় তবে ক্ষতি কি? সংসারের এই তো বিপদ! অনুমানের সত্যকে প্রমাণের সত্য করিয়া তোলা যায় না বলিয়াই কি অনুমানের সত্য তুচ্ছ? এইভাবে দিন যায় এবং রাত্রিও যায়। মল্লিকা ক্রমাগত মনে মনে জপিতে থাকে সে নাকি ডাকিনী। যতই সে এই কথা ভাবে ততই বাড়ির সকলের প্রতি তাহার ধিক্কারের ভাব গভীরতর হয়—একসঙ্গে ধিক্কার, ক্রোধ, বিরক্তি, নৈরাশ্য, দুঃখ আরো কত কি? তাহার ইচ্ছা করে সকলের কাছে প্রমাণ করিয়া দেয় সে তাহাদের আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রমাণ করিবে কি করিয়া? তাহাদের অনুমানের সত্যকে কি করিয়া সে অপ্রমাণ করিবে?

একদিন দুপুরবেলা নির্জন ঘরে আয়নায় নিজের ছায়া দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। একি, তাহার এ কেমন চেহারা হইয়া গিয়াছে! ওই আয়নখানা যেন একটা সুড়ঙ্গ পথের একটা মুখ তাহার মধ্য দিয়া আর এক দিকের, আর এক জগতের কোন ছায়াময়ী দৃশ্যমান? বাস্তবিক ছায়াময়ীই বটে। মল্লিকা কৃশ হইয়া গিয়াছে, মল্লিকার মতো স্নিগ্ধ রঙের উপরে একটা তীক্ষ্ণতা নামিয়াছে, বসনের শুভ্রতা আর গায়ের রঙের শুভ্রতা, সবসুদ্ধ মিশিয়া কেমন যেন একটা শাণিত অসির ভাব! চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে এমন একটা হাসির রেখা —যাহাতে তরবারির দীপ্তি ও তরবারির শীতলতা দুই-ই মিশ্রিত আছে। নিজের ছায়া দেখিয়া সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। সামান্য কয়দিন সে আয়নায় প্রসাধন করে নাই—এরই মধ্যে তাহার একি পরিবর্তন! সে হাসিয়া ভাবিল— একেই তো ডাকিনীতে পাওয়া বলে। আমি তো আর মানুষ নই।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিতান্ত নাস্তিকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামের বদি হাড়ীর ছোট ছেলেটার তটকা হইল। লোকে বলিল, ছেলেটাকে ডাইনিতে পাইয়াছে—এখন চৌধুরী বাড়ির বৌমার দয়া ছাড়া আর রক্ষা নাই। বদি ছেলেটাকে লইয়া এক দৌড়ে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় যেখানে মল্লিকা একা বসিয়াছি—সেখানে গিয়া ছেলেটাকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

বদি পা না ছাড়িয়া বলিল—বৌমা এবার তোমার দয়া ছাড়া উদ্ধার নাই। ছেলেটাকে রক্ষা করো।

মল্লিকা বলিল—ওর যে গা গরম দেখছি। ইস খুব জর। তড়কা হয়েছে।

বদি বলিল—তড়কা নয় বৌমা। ডাকিনীর কৃপা হয়েছে—তুমি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে?

মল্লিকা বুঝিল তাহার নূতন পরিচয় সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, এই ছেলেটার পরিবর্তে তাহার মৃত্যু হয় না! ইতিমধ্যে দু-চারজন করিয়া লোক জড় হইতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্তও বটে, ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কিনা দেখিবার জন্তও বটে, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল এবং জল ও ইউ ডি কোলন মিশাইয়া ছেলেটার মুখে মাথায়

দিতে লাগিল। অল্পেই ছেলেটার তড়কা ভাঙ্গিয়া সুস্থ হইল। তখন সে ছেলেটাকে আনিয়া তাহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিল। বদি আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গলার রূপার মালাটা এক টানে ছিঁড়িয়া মল্লিকার পায়ের উপর রাখিল—বলিল—বৌমা দয়া করে এটা তুমি নাও।

বদি আর কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু দর্শকের ভিড় সরিল না। অম্বাময়ী ও নিস্তারিণীও এই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। দুইজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। এমন সময়ে নিস্তারিণীর ইঙ্গিতে অম্বাময়ী বলিয়া উঠিলেন—তোমার অনন্ত কোথায়? মল্লিকা দেখিল ব্যস্ততায় জামার হাতা সরিয়া গিয়াছে। সে বলিল—খুলে রেখেছি।

অম্বাময়ী কঠোর স্বরে বলিলেন—খুললে কেন? আবার পরো।

মল্লিকা বলিল—খুলে ফেলে দিয়েছি—আর পরবো না। নিজের স্বরের কঠোরতায় সে বিস্মিত হইয়া গেল। সাধারণ বধূ হইলে এমন অবাধ্যতার জন্য দণ্ডের অন্ত থাকিত না। কিন্তু ডাকিনীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত দুর্দান্ত শাশুড়ীরও ভয় হয়। ডাকিনী হইবার কিছু সুবিধাও আছে। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অম্বাময়ী পুছিলেন—এখন কি করা যায়?

নিস্তারিণী বলিলেন—যতদিন ওষুধ ছিল ভয়ের কিছু ছিল না। ওষুধ ফেলে দেবার পরেই তো প্রকোপ শুরু হয়েছে।

চিন্তিত অম্বাময়ী বলিলেন—কিন্তু এখন উপায় কি?

নিস্তারিণী বলিলেন—উপায় আর কি? ওঁরা সব দেব-অংশী। ঘাঁটাঘাটি করা কিছু নয়। এখন উনি নিজ ইচ্ছায় গেলেই বেশি মঙ্গল।

অম্বাময়ী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন—যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভাল। বাছা আমার ফিরে আসবার আগে যায় না!

নিস্তারিণী বলিলেন—জোর করা তো যায় না দিদি। উনি ক্রুদ্ধ হলে বাছার ক্ষতি করতে পারেন।

পুত্রের ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় অন্নময়ী শিহরিয়া উঠিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন।

মল্লিকার সঙ্গে কেহ মিশিত না—ইহা আগেই বলিয়াছি, কেবল ঐ অনাথ বালিকাটি মিশিত। কুমড়ো আসিয়া মল্লিকাকে বলিল—মাসি সবাই তোমাকে ভয় করে, কেবল আমিই ভয় করি না।

তারপরে বলিল—ভয় করবো কেন? তুমি তো আমাদেরি মতো মানুষ। ওরা বলে তুমি ডাকিনী। হও না কেন ডাকিনী, আমার মাসি বটে তো! তুমি আমার ডাকিনী মাসি।

মল্লিকা কহিল—ওরা আর কি বলে রে?

কুমড়ো বলিল—একদিন কর্তা দিদি আর কাশীর দিদি বলাবলি করছিল—আমি সব শুনে ফেলেছি। শীগগীরই নাকি তুমি উড়ে চলে যাবে—ওরা কালীর থানে পুজো দিয়েছে।···আচ্ছা মাসি, তুমি আমাকেও নিয়ে যাও না কেন? আমার তো কেউ নেই—এরা আমাকে কেউ দেখতে পারে না।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—যাবি আমার সঙ্গে?

কুমড়ো সাগ্রহে বলিল—যাবো বই কি। ছাদ ফুটো করে দুজনে উড়ে চলে যাবো। প্রথমে যাবো কামরূপ কামিখ্যে—তারপরে যাবো শ্রীক্ষেত্রে! সে বেশ হবে মাসি। যাবার সময়ে এই বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে—দেখবো ওরা কি করে?···আবার একটু থামিয়া বলিল—

—হাঁ মাসি কবে যাবে?

মল্লিকা বলিল—শীগগীরই।

'সে বেশ হবে' বলিতে বলিতে কুমড়ো আনন্দে প্রস্থান করিল—বোধ হয় জিনিষপত্র বাঁধিবার জন্যেই।

মল্লিকা বুঝিল—এবার তাহার যাওয়াই ভাল। কিন্তু কোথায় যাইবে? কোনখানে তো তাহার কেহই নাই—পৃথিবীর কোথাও তাহার তিলমাত্র আশ্রয় নাই। অবশ্যই যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই···কিন্তু কোথায়? চিন্তা করিয়া করিয়া মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন কিনারা পাইল না।

ডাকিনী হইবার অসুবিধার মধ্যেও একটা সুবিধা মল্লিকা পাইয়াছিল—নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। সে যখন খুশি ঘুমাইত, যখন খুশি

আহার করিত—আর সবচেয়ে সুবিধা ছিল রাত্রিবেলায় চৌধুরী বাড়ীর ছাদে ছাদে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে। কেহ বাধা দিত না, নিষেধ করিত না। গভীর রাত্রে এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার যে-ছাদটা গুড়নদীর ঠিক উপরেই তাহার উপরে আসিয়া দাঁড়াইত। দেখিত অনেক নীচে গুড়নদীর কালো জলে তারার ছায়া,—দেখিত নদীর ধারে দূরে চিতার আলো নির্বাপিতপ্রায়, দেখিত নদীর ওপরে পুঞ্জিত অন্ধকারে জোনাকীর ঝলমলানি; কান পাতিয়া শুনিত, দিনের বেলার অশ্রুত গুড়নদীর ছল ছল ধ্বনি, আর শুনিতে পাইত প্রহর-গোনা যামঘোষের দিগন্তজোড়া উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রব। তারপরে এক সময়ে নিশান্তের শীতল বাতাসে সচকিত হইয়া ক্লান্ত শরীরটাকে টানিয়া আনিয়া শূন্য শয্যায় ফেলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত। ছাদে বেড়াইবার সময়ে সে জানিত, জানালা দরজা আলিসার আড়াল হইতে অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

৬

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিল। রাত্রি তখন অনেক। স্টেশনেই সে আহারাদি সারিয়া আসিয়াছিল—কাজেই আসিয়াই সে নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। মল্লিকা অকস্মাৎ স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শশাঙ্কও তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মল্লিকা, তোমার হাতের অনন্ত গেল কোথায়?

মল্লিকা একবার রিক্তবাহুর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল,—ভেঙে ফেলে দিয়েছি। ভীতবিস্ময়ে শশাঙ্ক বলিল, কেন?

মল্লিকা এবার হাসিল, বলিল—বুঝিতে পারো না! আমি যে ডাকিনী।

শশাঙ্কর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল—একি পরিহাস, না সত্য?

এবার সে ভাল করিয়া মল্লিকাকে লক্ষ্য করিল। জানালা দিয়া নির্গলিত জ্যোৎস্নার ধারাতে সে দাঁড়াইয়া; শাড়ির শাদা জমিনে আপাদকণ্ঠ আবৃত; চুল-এলায়িত; কালো চুলের দ্বন্দ্বে বসনের শাদা, রঙের শাদা, জ্যোৎস্নার শাদা, হাসির শাদা—সবসুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা অতীন্দ্রিয় শুভ্রতা। সেই ঋজুশুভ্র অনতিদীর্ঘ নারীমূর্তি যেন কোন দুষ্ট অদৃষ্টের একখানি শাণিত তরবারি! সে দাঁড়াইয়া থামিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিল—বসো।

কিন্তু নিজের শয্যায় আসিয়া বসিবার সাহস শশাঙ্কর হইল না। কিছু দিন আগে যে মল্লিকাকে সে ছাড়িয়া গিয়াছিল, এ যেন সে মল্লিকা নয়। সংসারের ধুমে মলিন ম্লান চিরপরিচিত নারীকে অলৌকিকের শাসনপাথরে ঘষিয়া কে যেন অন্তর্নিহিত দীপ্তিময়ী লোকন্তরাকে বাহির করিয়াছে। এত কথা হয়তো তাহার মনে হইত না, কিন্তু যতদিন সে কলিকাতায় ছিল প্রায় প্রতিদিনই মার পত্র পাইত, যাহাতে থাকিত এই ডাকিনীর নিত্য কার্যকলাপের পরিচয়—তার কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সবই কল্পনার তুলিতে জলন্ত বর্ণে অঙ্কিত। সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত করিয়া আজ যাহাকে সে দেখিল সে আর তাহার পত্নী নহে—পত্নীরূপিণী ডাকিনী।

শশাঙ্ক অস্ফুটস্বরে বলিল—তুমি কে?

মল্লিকা স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি ডাকিনী। আমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে। আমি গভীর রাত্রে ছাদ ফুটো করে কঙ্কাল হয়ে আকাশপথে উড়ে যাই—কামরূপ থেকে শ্রীক্ষেত্রে কত পাহাড় পর্বত, নদনদীর উপর দিয়ে, কত দেশ বিদেশ পার হয়ে। ওঃ সে কি আনন্দ! তারপরে ভোর হবার আগে মানুষ হয়ে তোমার পাশে আবার শুয়ে ঘুমোই।

শশাঙ্ক কাঠের মতো দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মল্লিকা বলিল—চলো না একদিন আমার সঙ্গে। যাবে?

শশাঙ্ক আর সহ্য করিতে পারিল না—সে 'মাগো' শব্দ করিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সেই সঙ্কুচিত পলায়নের দৃশ্যে মল্লিকা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি যেন কঙ্কালের শীর্ণ শুভ্র হাত বাড়াইয়া শশাঙ্ককে ধরিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। শশাঙ্ক একেবারে তাহার মায়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

অম্বামরী চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র—সারা গায়ে ঘাম—ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। তাহাকে শান্ত করিয়া শুধাইল—এসেই বুঝি ঘরে গিয়েছিলি? আমাদের একবার পুছতে হয়। হাতে ওষুধ বেঁধে দিতাম, তবে ঢুকতিস। বল বল, কি হয়েছে?

শশাঙ্ক সব খুলিয়া বলিয়া বলিয়া শেষে বলিল—মা ওযে আমাকেও সঙ্গে যেতে

বলে। শঙ্কিত অম্বাময়ী 'ষাট ষাট' বলিয়া পুত্রের মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দিলেন এবং অবশেষে ইহার একটা বিহিত করিবার জন্য মল্লিকার ঘরের দিকে চলিলেন। তিনি একেবারে গলবস্ত্র হইয়া মল্লিকার কাছে গিয়া বলিলেন—ওগো, তুমি দেবী দানবী ডাকিন যোগিনী যেই হও, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করি নাই। তুমি সে স্বেচ্ছায় এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলে আবার স্বেচ্ছায় এখান থেকে নিজের দেশে প্রস্থান করো।

এই বলিয়া তিনি গললগ্নিকৃতবাস হইয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাতার পিছনে দাঁড়াইয়া পুত্র কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। মল্লিকা মাতাপুত্রের এই স্বামুভাব দেখিয়া একবার হাসিল—বলিল—তাই যাবো। এই বলিয়া সে উভয়ের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় একবার স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিল। তাহার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না—কাঠের পুতুল কি সাড়া দিবে?

মল্লিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া অকম্পিত পায়ে তর তর করিয়া ছাদে গিয়া উঠিল। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করিল না—নিজের কর্তব্যের ছক যেন সম্মুখে বিস্তারিত।

মল্লিকা ছাদ হইতে অন্য ছাদে, নিম্নতর হইতে উচ্চতর ছাদে গিয়া উঠিল এবং শেষ চারতলার চিলে কোঠার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মল্লিকা উর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল চৈত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিগ্‌দিগন্তব্যাপিয়া শুভ্র-নৈরাশ্যের তাঁবু কানাত টাঙাইয়া দিয়াছে—তাহারি উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়ে চাঁদ শূন্যে ঝুলিতেছে; আরও না জানি কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে। নীচে যতদূরে চোখ চলে সুপারি নারিকেলের মাথাগুলি তালে তালে দোলাদুলি করিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। মল্লিকার মনে হইল বাতাস উঠিয়াছে। পাল খুলিয়াছে, কাছিতে টান পড়িয়াছে। আর দেরী নয়। তাহার মনে হইল যে বাতাসে এখানকার সুপারি নারিকেলের মাথা দুলিতেছে, সমুদ্রের ঢেউয়ে সে বাতাস কি কাণ্ডই না জানি করিতেছে। সুদূর সমুদ্রে জোয়ারের জল এতক্ষণ পূর্ণতার রেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তীরে তীরে যত গুহা কন্দর আছে লবণাম্বুতে পূর্ণ হইয়া এতক্ষণে গদ্ গদ্ ভাষায় বেদনার কি স্তবোচ্চারণই না করিতেছে! সেই ব্যথার টান কি এই শুষ্কপ্রায় গুড়নদীর নাড়ীতেও আজ রাত্রে

লাগে নাই? মল্লিকার মনে হইল আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। নিম্নে উর্ধ্বে কোথাও আজ পরিত্রাণ নাই, পরিচিত দিগন্ত আশ্রয়ের তীর ধুইয়া মুছিয়া কোথায় সব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা দেখিল এই সর্বপ্লাবী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোন আশ্রয় নাই; না পতিকুলে, না পিতৃকুলে সংসারের সব দিগন্ত কোন সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন। এই প্রলয় পয়োধির মুখে কানে বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে? কোথাও যে তাহার কোন আশ্রয় নাই। আর সর্বনাশের মুখে একটুখানি বাঁচাইয়া রাখিয়া কি লাভ? মল্লিকা তাকাইয়া দেখিল, অতি নিম্নে গুড়নদীর রূপার পাত জ্যোৎস্নাচিক্কণ শীতল একটি বটপাতার মতো বাতাসে কাঁপিতেছে।

আবার বাতাস উঠিয়াছে সুপারি নারিকলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার! দূরের গাছের মাথা, অদূরের গাছের মাথা, নিকটের গাছের মাথা, পায়ের তলাকার গাছের মাথা এবং শেষে মল্লিকার আঁচল বাতাসে উড়িতে লাগিল। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়েটা অনেকক্ষণ হইল দুলিতেছে—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়···ওর আগেই···

মল্লিকা চিলে-কোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড়নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

জানালা দরজার আড়াল হইতে একদল কৌতূহলী চক্ষু দেখিল ডাকিনী চিলে কোঠার ছাদে উঠিয়া স্বমূর্তি ধরিয়া কামরূপ কামিখ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনও তাহাদের মত-পরিবর্তন ঘটিল না। সবাই বলিল, ডাকিনী মানব দেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কামরূপ কামিখ্যেয় নরদেহে যাইবার উপায় নাই; মানুষের ঘরে মানুষের রূপে আসিয়াছিল—এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাই হোক, বাড়ির ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং উত্তরোত্তর শশাঙ্কর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।

আলোচনা

প্রমথনাথ বিশীর গল্প

১

বাংলাসাহিত্যে প্রমথনাথ বিশীর একটি বিশেষ স্থান আছে। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্যেই শুধু নয়, বৈচিত্র্যের জন্যও তিনি আকর্ষণীয়। গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ প্রভৃতিতে তিনি শুধু সমান দক্ষতাই দেখাননি, তূণ নিক্ষেপে তিনি পাঠকহৃদয়কে বিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন (বাংলা ১৩০৮ সাল, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ) মঙ্গলবার, অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জোয়াড়ি গ্রামে প্রমথনাথ বিশীর জন্ম। পিতা নলিনীনাথ এবং মাতা সরোজবাসিনীর সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র। প্রমথনাথের বাল্যকাল কেটেছে দেওঘরে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৯ বছর বয়সে প্রমথনাথ তাঁর ছোটভাইকে নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে লেখাপড়া করতে আসেন। এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের ১৭ বছর অতিবাহিত হয়। এই যুগের কথা তিনি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। প্রমথনাথের মতে—"বরেন্দ্রভূমিতে আমার জন্ম; সে লালমাটির দেশ; আবার রাঢ়ের লালমাটিতে আমার দ্বিতীয় জন্ম। আমার দুই জীবনের দুই উদার্যদিগন্ত লালমাটির আভায় চিররঞ্জিত।"

সেকালের শান্তিনিকেতন ছিল অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের প্রতীক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অল্প কয়েকটি ছাত্রের মধ্যদিয়ে শান্তিনিকেতন যথার্থ আশ্রমের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বাঁধাধরা পাঠ্যক্রমের মধ্যে না গিয়েও

জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা প্রমথনাথের চরিত্রকে পূর্ণতর করতে সাহায্য করেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি নীচের দিকের শ্রেণীতে তিনি কীটসের অটাম বা শেলীর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়া বসিত। তাঁহার ব্যাখ্যার দানপত্র অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশি পাইত; এই উদ্‌বৃত্ত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য।"

শান্তিনিকেতনে থাকাকালে প্রমথনাথ যেমন বহু বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তেমনি বিশিষ্ট মনীষীদের সাহচর্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এখান থেকেই তিনি প্রাইভেটে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর কলেজে পড়ার প্রশ্ন। কিন্তু তখন শান্তিনিকেতনে কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তাই চলমায় নামে এক দক্ষিণভারতীয় আর প্রমথনাথ—এই দু'জন ছাত্রকে নিয়েই 'বিশ্বভারতীয়'র পত্তন হল। তাঁদের ভারততত্ত্বে পারদর্শী করে তোলার জন্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপর ভার পড়ল সংস্কৃত, প্রাকৃত আর পালি শেখানোর। পাণিনি শেখানর জন্য দ্বারভাঙ্গা থেকে পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্রকে আনানো হল। কাদম্বরী, শকুন্তলা, মেঘদূত, রত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য, বিভিন্ন ইংরাজী সাহিত্য, এমনকি রসায়ন বিষয়ে প্রাথমিক পাঠেরও আয়োজন হল।

কিন্তু প্রমথনাথ শিক্ষালাভে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছেন শান্তিনিকেতন পাঠাগারের—"আমার পড়াশুনা নিয়মিতভাবে হয় নাই বলিয়া তাহার মধ্যে বড়ো ফাঁক রহিয়াছে। অবশ্যপাঠ্য অতিপ্রসিদ্ধ অনেক বই আমি পড়ি নাই, আবার অপ্রসিদ্ধ উপেক্ষিত বহু বই অল্পবয়সে পড়িয়া ফেলিয়াছি। এ পর্যন্ত যেটুকু শিখিয়াছি তাহার মূলে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরি।"

'বিশ্বভারতী'তে পড়াশোনার সময় তিনি ছাত্রদের অধ্যাপনার কাজও করতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ প্রাইভেটে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর দীর্ঘ সতের বছরের রবীন্দ্রসান্নিধ্য থেকে মুক্ত হয়ে রাজশাহী

কলেজে বি. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেখানে দু'বছর পড়ার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী শহরে সুরুচি দেবীর সঙ্গে প্রমথনাথের বিবাহ হয়। ঐ বছরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজিতে এম. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পিতা নলিনীনাথকে কারাবরণ করতে হলে তাঁকে পড়া ছেড়ে জোয়াড়িতে ফিরে যেতে হয়। সেখানে তিনি পৈতৃক বিষয়াদি দেখাশোনার ফাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনবছর তিনি রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ হল 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ।' ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ বাংলার লেকচারার হিসাবে কলকাতার রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) যোগদান করেন। সেখানে দশবছর কাজ করার পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার 'এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর'-এর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই চাকুরী ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সুরু করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর যুক্ত ছিলেন। শেষের দিকে তিনি 'রবীন্দ্র অধ্যাপক' হন এবং বাংলাবিভাগের প্রধানরূপেও তিনি কিছু-দিন কাজ চালান।

পারিবারিক জীবনে প্রমথনাথ দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক। জ্যেষ্ঠ-পুত্র কণিষ্ক ও কনিষ্ঠ মিলিন্দ ইঞ্জিনিয়ার। কন্যা চিরশ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. ও ডক্টরেট।

প্রমথনাথের সাহিত্যসাধনা শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন বাল্যবয়সেই সুরু হয়। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পূর্বসংস্কার ছিল না, কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম যে এখানেই (শান্তিনিকেতনে) ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।" সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যসভা ও হাতেলেখা পত্রিকার মাধ্যমে প্রমথনাথের সাহিত্যসাধনার বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি বিভূতি গুপ্তের সংগে 'বুধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। আশ্রম

থেকে 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি সংবাদ পত্রিকা বের হল। জগদানন্দ রায় এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকছিলেন। প্রমথনাথ তিনবছর 'শান্তিনিকেতন'-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৩২৮ সালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রমথনাথ 'সম্পাদক-সঙ্ঘে' ছিলেন।

প্রমথনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেয়ালি' একটি কাব্যসংকলন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম যাত্রা পালা 'ঘোষ-যাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু' ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি দীর্ঘকাল ধরে অজস্রধারায় বহু বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। আমরা নীচে কেবলমাত্র তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির বিস্তারিত পরিচিতি দিলাম। অনেকগুলি গল্প একাধিক গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হয়েছে।

১। **শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব**। কাত্যায়নী বুক ষ্টল। ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ (১৯৩৬?) দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫১। পৃ ১৭২। মূল্য দুই টাকা। তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ. ১৭২। মূল্য আড়াই টাকা।

উৎসর্গ—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ করকমলে।

সূচী—শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, ন-ন-লৌ-ব-লিঃ, বাইশ বৎসর, যন্ত্রের বিদ্রোহ, ঋণ-জাতক, ভৌতিক কমেডি, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, আর্ট ফর আর্ট সেক, রিউশন, কাঁচি, অটোগ্রাফ, সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, নর-শার্দুল সংবাদ, নির্বাণ, জি-বি-এস্ ও প্র. না. বি., বাঘদন্তা, নগেন হাড়ীর ঢোল, ভেজিটেবল বোম্, রোহিণীর কি হইল? (৯টি গল্প পরে 'নীরস গল্পসংকলন' গ্রন্থে যুক্ত হয়।)

২। **শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব**। কাত্যায়নী বুক ষ্টল। ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মাঘ ১৩৫১, আশ্বিন ১৩৬০। পৃ. ১৪৪। মূল্য আড়াই টাকা।

উৎসর্গ—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় করকমলে।

সূচী—শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, উত্তঙ্ক, গণক, সরল থীসিস রচনা প্রণালী, অর্থ-

পুস্তক, চাকরীস্থান, প্রফেসার রামমূর্তি, আধ্যাত্মিক ধোপা, চিত্রগুপ্তের এডভেঞ্চার, মারণ যজ্ঞ, সদা সত্যকথা কহিবে, ভূতের গল্প, কাঙালী ভোজন, মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ, পরিস্থিতি। (৮ টি গল্প পরে 'সমুচিত শিক্ষা' গ্রন্থে যুক্ত হয়।)

৩। **গল্পের মতো**। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড। মার্চ ১৯৪৫। পৃ. (৪)+১০০। মূল্য দেড় টাকা।

উৎসর্গ—শ্রীকানাইলাল সরকার জীবনরসিকেষু।

সূচী—গঙ্গার ইলিশ, পূজা সংখ্যা, কীটাণুতত্ত্ব, আরোগ্য-স্নান, দ্বিতীয় পক্ষ, উল্টা-গাড়ি, মাধবী-যামী, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ। (৫টি গল্প পরে 'নীরস গল্প সঞ্চয়ন' গ্রন্থে যুক্ত হয়।)

৪। **গালি ও গল্প**। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২। পৃ. ১১৯। ১৲৫০।

সূচী—অতি সাধারণ ঘটনা, বিপত্নীক, চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ, একটি ঠোঁটের ইতিহাস, প্র. না. বি-র সঙ্গে কথোপকথন, সত্য মিথ্যা কথা, নূতন বস্ত্র, টেনিস কোর্টের কাণ্ড, কল্কি, প্র. না. বি-র সঙ্গে ইণ্টারভিউ, ইংলণ্ডকে স্বাধীনতাদানের চেষ্টা, মাত্রাজ্ঞান, ভাঁড়ুদত্ত। (প্রথম চারটি গল্প পরে 'নিকৃষ্টগল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

৫। **ডাকিনী**। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। পৃ. ১০৪। ১৲৫০।

উৎসর্গ—শ্রীনীহার রঞ্জন রায় শিল্পরসিকেষু।

সূচী—ডাকিনী, পেন্সারবাবু, গদাধর পণ্ডিত, একগজ মার্কিণ ও এক চামচ চিনি, সিন্দুক, নীলমণির স্বর্গলাভ, ভূতপূর্ব।

(প্রথম ৫ টি গল্প পরে 'নিকৃষ্ট গল্প' গ্রন্থে, 'গদাধর পণ্ডিত' গল্পটি 'সমুচিত শিক্ষা' গ্রন্থে এবং 'সিন্দুক' গল্পটি 'অলৌকিক' গ্রন্থে ও 'ডাকিনী' গল্পটি 'নীরস গল্পসঞ্চয়ন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

৬। **ব্রহ্মার হাসি**। মডার্ণ বুক্স্ লিঃ, ১৬০/১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, ১৩৫৫। পৃ. ১৫২। ৩৲০০।

সূচী—ব্রহ্মার হাসি, গণ্ডার, শার্দুলের শিক্ষা, পূজার রচনা, প্রত্যক্ষ

সন্দর্ভ, শৃগালের মনুষ্যত্ব বর্জন, শকুন্তলা, সুতপা, রত্নাকর, মাতৃভক্তি, রাজকবি, অন্নকষ্ট, ষ্টেশনে, হাতুড়ি।

(৫ টি গল্প 'নিকৃষ্ট গল্প' গ্রন্থে এবং ২টি গল্প 'অমনোনীত গল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

৭। **অশরীরী**। পি. কে. বোস য়্যাণ্ড কোং, কলিকাতা। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১০৮। ২.০০।

উৎসর্গ—শ্রীঅলক গুপ্ত করকমলে।

সূচী—অশরীরী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কপালকুণ্ডলার দেশে, কালো পাখী, নিশীথিনী, পুরন্দরের পুঁথি, শুভদৃষ্টি, দ্বিতীয় পক্ষ। (এই গ্রন্থের সব কটি গল্প পরে 'অলৌকিক' এবং 'গল্প-পঞ্চাশৎ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়।)

৮। **ধনেপাতা**। মিত্রালয়, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১১৭। ২.৫০।

উৎসর্গ—মানবহৃদয়ের কবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে।

সূচী—মহেন-জো-দড়োর পতন, মহালগ্ন, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যা-বর্তন, ধনেপাতা, গুরুমারা চেলা।

(এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি গল্প 'অনেক আগে অনেক দূরে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

'নিবেদন'-এ লেখক লিখেছেন—"এই পুস্তকের গল্পগুলির মূল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে নিবদ্ধ। কোনটিই লেখকের কল্পনা প্রসূত নয়।

অনেকগুলি গল্পের মূলের সন্ধান গল্পের মধ্যে বা গল্পের শেষে দেওয়া হইয়াছে। 'গুরুমারা চেলা' গল্পটির মূল পাওয়া যাইবে—ভিনসেণ্ট স্মিথ-লিখিত ভারত-বর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের জালালুদ্দিন খিলজির প্রসঙ্গে। আর কালিদাস সম্বন্ধীয় গল্প দু'টিতে কালিদাস সম্পর্কে সর্বজনপরিজ্ঞাত তথ্যের বাহিরে বড় যাওয়া হয় নাই; যেখানে যাওয়া হইয়াছে, সেখানেও পরিজ্ঞাত তথ্যের সূত্র অনুসরণ করাই হইয়াছে। তবে সে-সব কাহাকেও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি না। মোট কথা, এগুলি ইতিহাসের পাত্রে পরিবেশিত কল্পনার পানীয়। এগুলির ঐতিহাসিকতার দাবি সম্বন্ধে ইহার বেশি বলিবার কিছু নাই।"

১। চাপাটি ও পদ্ম। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। ১৩৬২। পৃ. ১৭২। ৩'০০।

উৎসর্গ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত করকমলে।

সূচী—সেই শিশুটি, জেমি গ্রীনের আত্মকথা, কোকিল, ছিন্ন দলিল, গুলাব সিং এর পিস্তল, ছায়া বাহিনী, মড্, রুথ, নানাসাহেব, প্রায়শ্চিত্ত, রক্তের জের, অভিশাপ।

'পূর্বকথা' অধ্যায়ে লেখক বলেছেন—"এই গ্রন্থের গল্পগুলি সিপাহিবিদ্রোহ ঘটিত। প্রথম গল্পটি কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের গোরার জন্মবৃত্তান্ত আছে—তাহাই উপজীব্য। পরিবেশ কাল্পনিক নয়। বাকি এগারটি গল্প এই অর্থে ঐতিহাসিক যে সিপাহিবিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থে গল্পাঙ্কুরগুলি পাইয়াছি। কেবল নানাসাহেব গল্পটিতে কিছু স্বাধীনতা লইয়াছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ কাল্পনিক নয়। এক বিন্দু ইতিহাসের সহিত এক কলসী কল্পনা মিশ্রিত করিলে আর যাই হোক ঐতিহাসিক গল্প সৃষ্টি হয় না। ইতিহাস ও গল্প দুয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া কলম চালনা কঠিন, সর্বত্র পারি নাই, সর্বত্র পারা যায় না। ঐতিহাসিক গল্পে ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন গৌণ, মুখ্য ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা। এ গ্রন্থে তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছে সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকগণের উপরে।

সিপাহিবিদ্রোহ প্রসঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ বিদেশীগণ কর্তৃক লিখিত। কাজেই অনুমান অনুচিত নয় সে সমস্ত বিবরণ সিপাহিপক্ষের প্রতিকূলে ঝুঁকিয়া আছে। ভারতের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের দপ্তরখানায় ভারতীয়গণ কর্তৃক লিখিত সমসাময়িক বিবরণ থাকা অসম্ভব নয়। সামন্ত রাজ্য লোপ পাইবার পরে দপ্তরখানাগুলি ভারত রাষ্ট্রের আয়ত্ত হইয়াছে। এখন খুঁজিয়া পাতিয়া বিদ্রোহ-বিবরণ আবিষ্কার করিলে, প্রকাশ করিলে ইংরাজের অনুকূলে কাত নৌকাখানা ভারসাম্য লাভ করিলেও করিতে পারে। তখন ইতিহাস ও গল্প দুয়েরই চেহারায় বদল হওয়া অসম্ভব হইবে না।

সিপাহিবিদ্রোহের কাহিনী সামান্য যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহা প্রকাশের ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নয়। বারান্তরে সুযোগ পাইলে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অধ্যাপক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহ ও অযাচিত ঔৎসুক্য এগুলি রচনার একটি প্রধান কারণ। তিনি ভাল করিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন, আমি তো ঋণ স্বীকার করিয়া রাখি।"

গ্রন্থটির নামকরণ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—"সিপাহিগণ কর্তৃক সঙ্কেত-রূপে চাপাটি ও পদ্মফুল ব্যবহৃত হইত—তাই বইখানার নাম চাপাটি ও পদ্ম।"

১০। **নীলবর্ণ শৃগাল**। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। আশ্বিন ১৩৬৩। পৃ. ১৯২। ৩'৫০।

"। ২য় মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৬২। পৃ. ১৭৯। ৪'০০।

উৎসর্গ—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ করকমলে।

সূচী—অবচেতন, সেকেন্দর শা-র প্রত্যাবর্তন, সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল, ভৌতিক চক্ষু, খেলনা, ফাঁসি-গাছ, বিনা টিকিটের যাত্রী, আয়নাতে, চিলা রায়ের গড়, পাশের বাড়ী, সাহিত্যে তেজিমন্দি, সংস্কৃতি, জামার মাপে মানুষ, থার্মোমিটার, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, গোল্ড ইনজেকশন, রামায়ণের নূতন ভাষ্য, রাশিফল, অলঙ্কার, অদৃষ্ট-সুখী। (কয়েকটি গল্প 'অলৌকিক' গ্রন্থে প্রকাশিত।)

১১। **অলৌকিক**। নতুন প্রকাশক, ২৪ সি রামকমল সেন লেন, কলিকাতা—৭। বৈশাখ ১৩৬৪। পৃ. ১৬০। ২'৫০।

উৎসর্গ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

সূচী—শুভদৃষ্টি, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, আয়নাতে, ফাঁসি-গাছ, সিন্দুক, কপাল-কুণ্ডলার দেশে, চিলা রায়ের গড়, নিশীথিনী, কালোপাখী, তান্ত্রিক, অশরীরী, বিনা টিকিটের যাত্রী, ভৌতিক চক্ষু, পুরন্দরের পুঁথি, পাশের বাড়ী, খেলনা, দ্বিতীয় পক্ষ। (এই গ্রন্থের সবগুলি গল্প পরে 'গল্প-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

১২। **এলার্জি**। বিশ্ববাণী, ১১/এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। ভাদ্র (জন্মাষ্টমী) ১৩৬৫। পৃ. ১৪৮। ৩'০০।

উৎসর্গ—শ্রীমান্ সবিতেন্দ্রনাথ রায় কল্যাণীয়েষু।

সূচী—এলার্জি, এলসেশিয়ান ডগ, ছোটগল্প-উপন্যাস-রহস্য, টিকি, পঞ্চলীলা, ওরা, উলট পালট পুরাণ, কৃষ্ণ-নারায়ণ সংবাদ, পকেটমারের প্রতিকার, হাতি, একশ ছুয়াল্লিশ ধারা, কলপ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, শ্রীভগবানকে চাই,

মরুভূমির প্রতিহিংসা, নূতন তীর্থ, সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ, পলাশীর শতবার্ষিকী, প্রায়শ্চিত্ত।

১৩। **অনেক আগে অনেক দূরে।** মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১৮৯। ৪·০০।

উৎসর্গ—কণিষ্ক, মহুয়া, মিলিন্দ।

সূচী—রাজা কি রাখাল, পরী, কোতলে আম, দর্শনী, আগম্‌-ই-গম্না বেগম, তিন হাসি, বেগম শমরুর তোশাখানা, মহেন-জো-দড়োর পতন, মহালয়, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, ধনেপাতা।

'পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ'-এ যুক্ত হয়—নাদির শা-র পরাজয়, যৌলাবক্স, বাহাদুর শা-র বুলবুলি।

১৪। **যা হ'লে হ'তে পারতো।** শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। শ্রাবণ, ১৩৬৯। পৃ. ১৫০। ৩·৫০।

সূচী—উঠতি গুণ্ডা, পশু শিক্ষালয়, প্রত্যাবর্তন, দর্জ্জি ও প্রেম, ছাপ সন্দেশ, রাধারাণী, একটিন খাঁটি ঘি, যাব যেথা স্থান, প্রাণান্তকর গল্প, দৃষ্টিভেদে, কমলার ফুলশয্যা, কুন্দ নন্দিনীর বিষপান, রক্তাতঙ্ক, রক্তবর্ণ শৃগাল, খুল্ল বিহার, নিচ্ছধনের পরীক্ষা

১৫। **সমুচিত শিক্ষা।** এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, ৬/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১৬১। ৩·৫০।

উৎসর্গ—উদার-হৃদয় বন্ধু শ্রীরমণীমোহন মিত্র সাহিত্যরসিকেষু।

সূচী—গদাধর পণ্ডিত, শিবুর শিক্ষানবিশি, গাধার আত্মকথা, চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ, চাকরিস্থান, সদা সত্য কথা কহিবে, অধ্যাপক রমাপতি বাষ, প্রফেসার রামমূর্তি, অধ্যাত্মিক ধোপা, উতঙ্ক, গণক, অর্থপুস্তক, সরল থীসিস রচনা প্রণালী, পশু শিক্ষালয়, ধনেপাতা। (এর অনেকগুলি গল্প পূর্বে অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।)

গল্পগুলি একটি বিশেষ বিষয় অনুসারে সজ্জিত। 'ভূমিকা'য় ছদ্মনামের অন্তরালে লেখক জানিয়েছেন—

"সমুচিত শিক্ষা' গ্রন্থের লেখক একজন শিক্ষক। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ব্যাপক। হাইস্কুল, বেসরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—সমস্ত স্তরে

তিনি কখনো না কখনো শিক্ষকতা করিয়াছেন। কাজেই শিক্ষক-জীবনের কাহিনী বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। আমাদের শিক্ষা জগতের নানাদিকে গোল। সরকার, রাজনৈতিক, অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্ণিংবডি কেহই দোষমুক্ত নহেন। লেখক ব্যঙ্গ ব্যঙ্গাতিরঞ্জন দ্বারা শিক্ষা জগতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সময়ে তাঁহার গল্পগুলিকে হৃদয়-হীনতার দৃষ্টান্ত মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়, কেননা ব্যঙ্গ করুণার বিকার, করুণার অভাব নয়। গল্পগুলি পড়িবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে অধিকাংশ গল্পই ইংরাজ আমলে লিখিত। তবে একালের সঙ্গে তাহাদের রূপে মিল না থাকিলেও রসে মিল আছে। আশা করি এই সামান্য মন্তব্যই গ্রন্থখানির পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীনীলকণ্ঠ শর্মা
প্রধানশিক্ষক এন. পি. পি. হাইস্কুল
মধ্যপ্রদেশ।"

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও প্রমথনাথ বিশীর কয়েকটি গল্প সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও এখানে উল্লেখ করা হল।

১৬। **প্র-না-বি-র নিকৃষ্ট গল্প**। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১২৭। ৩৫০।

উৎসর্গ—উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নিকৃষ্ট গল্পগুলি উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচী—চেতাবনী, ভিক্ষুক-কুকুর সংবাদ, মোটর গাড়ী, থোগ, অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ভগবান কি বাঙালী, চোখে-আঙুল-দাদা, নবঙ্গীয় উন্মাদাগার, সাবানের টুকরো, দুঃশাসনের শাস্ত্রী, মানুষের গল্প, শিখ, গাধার আত্মকথা, রত্নাকর, অধ্যাপক রমাপতি বাঘ, শিবুর শিক্ষানবিশি, অদৃষ্ট সুখী, গুহামুখ।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মিত্র ও ঘোষ। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ২৪১। ৫'০০।

এতে 'দুঃশাসনের শাস্ত্রী' ও 'মানুষের গল্প' বাদ যায় এবং এই কয়টি গল্প নূতন সংযোজিত হয়—ডাকিনী, পেন্সারবাবু, গদাধর পণ্ডিত, এক গজ মার্কিণ ও এক চামচ চিনি, সিন্দুক, অতি সাধারণ ঘটনা, বিপত্নীক, চারজন

মানুষ ও একখানা তক্তপোষ, একটি ঠোঁটের ইতিহাস, শকুন্তলা, সুতপা, রত্নাকর, মাতৃভক্তি, অন্নকষ্ট।

তৃতীয় সংস্করণ। মিত্র ও ঘোষ। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ২৩৫। ৫'০০। সূচীপত্র দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ।

১৭। **প্র-না-বি-র নিকৃষ্টতর গল্প**। মিত্র ও ঘোষ। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১৪৮। ৩'০০।

উৎসর্গ—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র করকমলে।

সূচী—পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, চাচাতুয়া, জেহুইন লুনাটিক, বঙ্গের বিদ্রোহ, খড়ম, শার্দ্দূল, ছবি, ব্ল্যাকমেল, বাল্মীকির পুনর্জন্ম, পুতুল, যমরাজের ছুটি, ছেঁড়াকাঁথা ও লাখ টাকা, দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য, ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র, শাপমুক্তি, রাঘব বোয়াল, ইয়াসিন শর্মা এণ্ড কোং, সিদ্ধান্ত, পুকুর চুরি, নর-পশু সংবাদ।

১৮। **প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প**। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। ৭ই মাঘ ১৩৬২। পৃ. ২১১। ৪'০০।

সূচী—অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, মহেন-জো-দড়োর পতন, ছিন্ন দলিল, নানা সাহেব, সুতপা, শকুন্তলা, অতি সাধারণ ঘটনা, গঙ্গার ইলিশ, পেস্কারবাবু, গদাধর পণ্ডিত, সিন্দুক, তিমিঙ্গিল, রাঘব বোয়াল, নিশীথিনী, চোখে আঙ্গুল দাদা, ব্ল্যাকমেল, জেহুইন লুনাটিক, ভগবান কি বাঙালী।

'পূর্ব্বকথা' অংশে লেখক লিখেছেন—

সঙ্কলন গ্রন্থ কেন?

আমার বিশ্বাস পৃথিবীময় সঙ্কলন গ্রন্থের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর ভবিষ্যৎ যুগের গ্রন্থাগারে খুব সম্ভব সঙ্কলন গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। এমন মনে করার কারণ গ্রন্থের 'ওভার প্রোডাকশান'। আর পাঁচশ কিম্বা হাজার বছর পরে স্থান লইয়া মানুষে গ্রন্থে রেষারেষি দেখা দিবে। দুয়ের স্থান পৃথিবীতে হইবে না। এমন অবস্থায় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় গ্রন্থসঙ্কলন। তাহাতেও যে সকল গ্রন্থ বাঁচিবে

এমন মনে করিবার কারণ নাই, তবে ঐটাই একমাত্র ভরসা। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সঙ্কলন গ্রন্থের এই আয়োজন।

স্বনির্ব্বাচিত কেন ?

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বহন করে কিন্তু তেমন ভাগ্যবান বিরল বলিয়া নিজেকেই নিজের বোঝা বহন করিতে হয়। লেখকের কাছে সব রচনার ইতিহাস স্পষ্ট বলিয়া সঙ্কলনের যোগ্যতম ব্যক্তি লেখক স্বয়ং? অন্ততঃ আর কিছু না হোক সঙ্কলনে লেখকের স্নেহের তারতম্য প্রকাশ পায়, সেটাও পাঠকের জানা দরকার।

গল্প কেন ?

বাঙালী লেখক ঐ কাজটি সবচেয়ে ভালো পারে। ক্ষুদ্র আয়তন রচনা বাঙালার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্তমান বাংলা ছোটগল্প সেকালের পদাবলীর সহোদর। অতএব স্বনির্বাচিত গল্প সঙ্কলন।....."

১৯। **অমনোনীত গল্প**। মহেন্দ্র পুস্তক ভবন, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। পৃ. ১৫২। ৩·০০।

উৎসর্গ—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ করকমলেষু।

সূচী—জগবন্ধুর মোহমুক্তি, নহুষের অতৃপ্তি, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পক্ষীরাজ গাধা, বাজীকরণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলকারণ, শাশুড়ী, ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা, রজ্জুতে সর্প, তান্ত্রিক, স্বপ্নাদ্য কাহিনী, সতীন, সিন্দুক, গণ্ডার, ব্রহ্মার হাসি, শাপে বর।

২০। **নীরস গল্পসঞ্চয়ন**। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ১৯৫৭। পৃ. ১৮০। ৩·০০।

উৎসর্গ—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক ও শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক আশীর্বাদ-ভাজনেষু।

সূচী—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ, যন্ত্রের বিদ্রোহ, ঋণজাতক, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, নরশার্দ্দূল সংবাদ, নির্ব্বাণ, বাঘদত্তা, নগেন হাড়ীর ঢোল, অশরীরী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, কপালকুণ্ডলার দেশে, গঙ্গার ইলিশ, কীটাণুতত্ত্ব, দ্বিতীয়পক্ষ, উল্টাগাড়ী, মাধবীমাসী, বস্ত্রের বিদ্রোহ, গোষ্পদ, ডাকিনী, কল্কি, বাঁশ ও কঞ্চি, কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড।

২১। **গল্প-পঞ্চাশৎ**। মিত্র ও ঘোষ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৭। পৃ. ৪২৫। ৮·০০ টাকা।

উৎসর্গ—শ্রীমান্ প্রদোষ কুমার পাল স্নেহভাজনেষু।

সূচী—বেগম শমরুর তোষাখানা, তুক, পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, চাচাতুয়া, জেমুইন লুনাটিক, বস্ত্রের বিদ্রোহ, খড়ম, সার্দ্দূল, ছবি, ব্ল্যাকমেল, তিমিঙ্গিল, বাল্মীকির পুনর্জন্ম, পুতুল, যমরাজের ছুটি, ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা, দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য, ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র, রাঘব বোয়াল, ইয়াসিন শর্মা অ্যাণ্ড কোং, সিদ্ধান্ত, পুকুরচুরি, নরপশু সংবাদ, শাপমুক্তি, শুভদৃষ্টি, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, আয়নাতে, ফাঁসিগাছ, মহামতি রাম, ফাঁসুড়ে, সিন্দুক, কপালকুণ্ডলার দেশে, চিলারায়ের গড়, নিশীথিনী, কালোপাখী, তান্ত্রিক, নহুষের অতৃপ্তি, অশরীরী, বিনা টিকিটের যাত্রী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলকারণ, শাশুড়ী, স্বপ্নাদ্য কাহিনী, সতীন, রজ্জুতে সর্প, ভৌতিক চক্ষু, পুরন্দরের পুঁথি, পাশের বাড়ি, বাজীকরণ, খেলনা, দ্বিতীয় পক্ষ, গণ্ডার, ব্রহ্মার হাসি।

এ ছাড়াও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত গল্পও আছে অনেকগুলি।

প্রমথনাথ বিশীর সমস্ত গল্পগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। প্রথমে তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, তারপর সংকলন গ্রন্থগুলি থেকে এবং সবশেষে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা থেকে গল্প প্রকাশিত হবে। ১ম খণ্ডে 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব,' 'শ্রীকান্ত ষষ্ঠ পর্ব', 'গল্পের মতো', গালি ও গল্প', গ্রন্থের গল্পগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে নিম্নলিখিত রচনাগুলি ঠিক গল্প শ্রেণীভুক্ত নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে—শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব (শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব গ্রন্থ), মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ (ঐ), ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ (গল্পের মতো), সত্য মিথ্যা কথা (গালি ও গল্প)। 'ডাকিনী' গ্রন্থের 'ডাকিনী' গল্পটি এই খণ্ডে দেওয়া হল, বাকি গল্পগুলি পরবর্তী খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।